শরৎচন্দ্র

মণি বাগচি

মোহন লাইব্রেরী
৩৫ এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০০৯

SARATCHANDRA : A Bengali biography of Saratchandra Chattopadhyaya—By : Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ :

সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক :

শ্রীজীবনকুমার বসু
মোহন লাইব্রেরী
৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদপট :

শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর :

শ্রীঅমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩/১, মণীন্দ্র মিত্র রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

বাঁধিয়েছেন :

বুক বাইণ্ডিং সেণ্টার
৪০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি॥

১২মাঘ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম খণ্ড

জীবন

'এ-জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ ঝলসাতে গেলে সে ফাঁকি একসময় নিজেকে এসেই বাঁধে।··· চোখে দেখে যাকে পরখ করবে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়।'

—শরৎচন্দ্র

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭ই ফাল্গুন ১৩৩৮
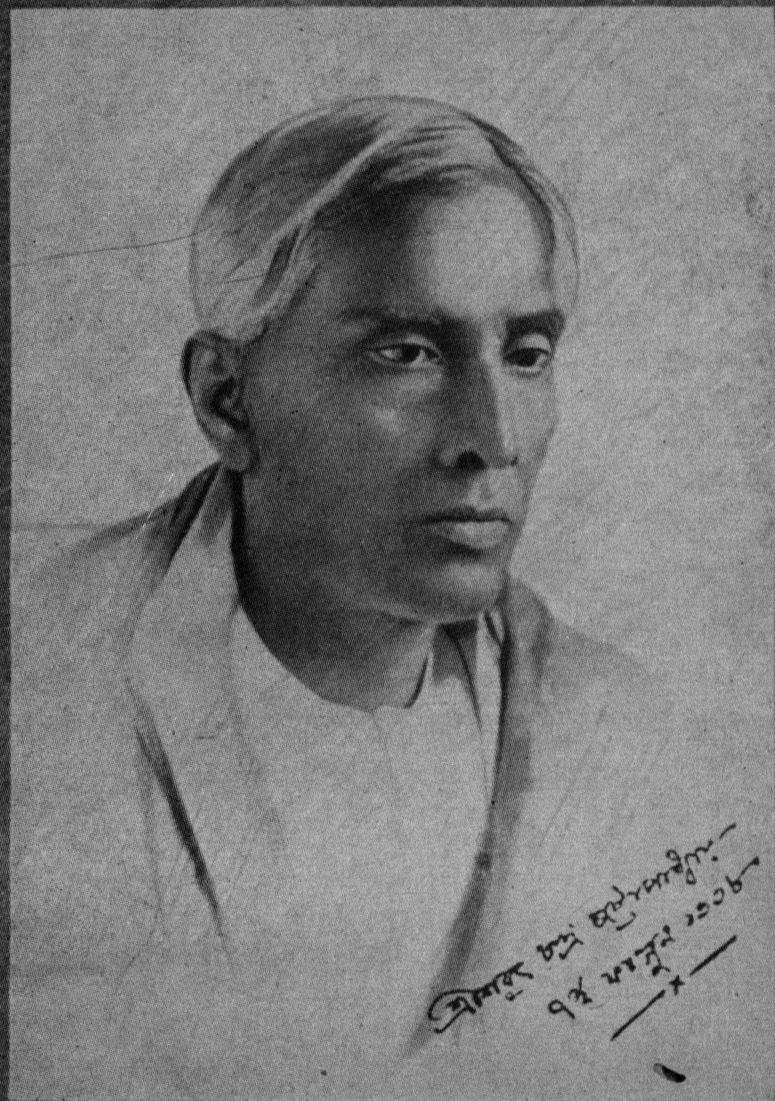
॥ এক ॥

'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।'

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অতর্কিত আবির্ভাবটা ঠিক এই রকমই ছিল। রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যে, বাংলার এই জনপ্রিয় গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ছিল যেন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' আর সেই আলোতেই পাঠকের চিত্ত ঝলমল করে উঠেছিল।

কে এই নামহীন আগন্তুক যিনি বাণীপূজার মহৎ অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে, পল্লী-বাংলার হৃদয় থেকে বেরিয়ে এলেন? কে এই পরিচয়হীন লেখক যিনি আবিষ্কার করলেন বাঙালী-জীবনের অনুদ্ঘাটিত হৃদয়-রহস্য? কে এই নীলকণ্ঠ সাহিত্যিক যিনি সামান্য মানুষের প্রতিদিনের জীবনের পাথেয়রূপে মানুষকে ভালবাসার অসামান্য আদর্শ পুনরাবিষ্কার করলেন? কে এই উদীয়মান জ্যোতিষ্ক যিনি তাঁর উপন্যাসে সাধারণ মানুষের ব্যথিত ও বঞ্চিত জীবনের কথা ফুটিয়ে তুললেন অমন সরল ও সহজ ভাবে? পরিবর্তনশীল যুগের কে এই শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী পথিক যিনি জীবনকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন নানা ভাবে?

অনেক সুখদুঃখভরা, অনেক হাসি-কান্না-সমৃদ্ধ বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারের ভগ্নদশার নিপুণ আলেখ্য অঙ্কন করলেন যিনি, ক্ষয়িষ্ণু পল্লীসমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেন তাঁর লেখনীমুখে যিনি—সেই আগন্তুক সাহিত্যিক সম্পর্কে সেদিন পাঠকচিত্তে জেগেছিল এইরকম সহস্র প্রশ্ন আর কৌতূহল। সকলের বিস্মিত দৃষ্টি সেদিন নিবদ্ধ হয়েছিল তাঁরই রচনার প্রতি—যে রচনার মধ্যে নিঃশব্দে ব্যক্ত হয়েছে দেশ ও সমাজ-ব্যবস্থার নানা মর্মান্তিক বিফলতা ও বিকার, মানুষের চরম যন্ত্রণার দাবদাহী অভিজ্ঞতা। তাঁরই রচনার স্বচ্ছ স্ফটিক আধারে বিধৃত হলো বিদ্যা-বিত্ত-নারী-পুরুষ-ধর্ম-সংস্কার নিরপেক্ষভাবে সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা।

বাঙালী-জীবনের ব্যথা ও বঞ্চনার কাব্যকার শরৎচন্দ্র।

আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূত শরৎচন্দ্র।

জীবনরসিক এই মানুষটি একান্তভাবেই ছিলেন জীবনের সাধক।

সৃষ্টিছাড়া, দেশছাড়া, সমাজবহির্ভূত এই মানুষটির লেখার মধ্যেই মানুষের সর্বাত্মক মানবিক অধিকার স্বীকৃত হলো—এলো সত্যিকার মানুষ তাঁর গল্পে-উপন্যাসে, তাঁরই সাহিত্যে স্বীকৃতি পেলো তার জীবনের যতকিছু পাপ-তাপ, স্খলন-পতন। যেসব জিনিস একসময়ে ঘৃণ্য বলে দূষণীয় বলে, আর্টের রাজ্যে অপাঙক্তেয় বলে নিন্দিত ছিল, তার ভেতর দিয়েই তো তিনি ফুটিয়ে তুললেন মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের সুষমা। শরৎ-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ঠিক সেই সম্মানের দাবী নিয়ে দেখা দিয়েছে কত নর-নারী।

এটা সম্ভব হয়েছিল কেমন করে ?

কেমন করে সমাজের, দেশের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াল শরৎচন্দ্রের রচনায় ? তার কারণ এদের স্রষ্টা ছিলেন শুধুই মানুষ—সত্যিকার মানুষ। মানুষকে ভালবেসেই তো তিনি একদিন আচম্‌কা এসে পড়েছিলেন শিল্পের আঙ্গিনায়। মানুষের সব দুর্বলতা, সব বিচ্যুতি, তার ক্ষমতার অভাব এবং ক্ষমতার অপব্যবহার—সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, এই দোষেগুণে মেশানো, স্বর্গনরকে দোদুল্যমান মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের ছিল সীমাহীন মমতা। তাইতো 'দরদী' বিশেষণটি তাঁর ললাটে এঁকে দিয়েছে রাজতিলক আর 'অপরাজেয়' অভিধা দিয়েছে তাঁকে এক দুর্লভ গৌরবের আসন।

উৎপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের প্রতি প্রাণভরা দরদ ছিল তাঁর।

তিনি নিজেই বলেছেন : 'সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনো হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি আমার ঋণ কম ; এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে

মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।'

এদেরই তিনি তাঁর দরদভরা বুকে টেনে নিয়েছেন। স্থান দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত মানুষের প্রতি, বিশেষ করে বঞ্চিতা নারীদের প্রতি এই যে তাঁর সুগভীর সহানুভূতি, এই যে সহৃদয়তা, এর পরিচয় আছে শরৎচন্দ্রের জীবনে ও লেখায়। মানুষকে —শুধু মানুষকে বলি কেন, রাস্তার কুকুরটাকে পর্যন্ত ভালবেসেই তো তিনি অমন অপরিমিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন সকলের কাছ থেকে। তিনি যে একদিনেই বাঙালী পাঠকের চিত্তজয় করতে পেরেছিলেন তার আসল রহস্যটা তো এইখানে। কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্র নিয়ে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করতে হয় নি। আপন প্রতিভার ছাড়পত্র নিয়েই ঘটেছিল তাঁর সেই অতর্কিত প্রবেশ। অতর্কিত কিন্তু অসংশয়িত।

সেই প্রতিভার উৎস ছিল মানুষ।

মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা।

উপদেষ্টার আসনে বসেন নি তিনি কোনদিন—বসেছিলেন তারো চেয়ে অনেক উঁচু স্রষ্টার আসনে। তাইতো তাঁর সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।' অন্যদিকে শরৎচন্দ্র নিজেও বলেছেন : 'কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, আমার সাহিত্যে সেটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধহয় এত সহজে ছোট-বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।'

কিন্তু শুধুই কি আবেদন, না তদতিরিক্ত কিছু?

আমরা পেলাম তাঁর কাছ থেকে নতুন এক জীবনবোধ। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলির হাজার ছিদ্রভরা ভাঙা পাত্র দিয়ে তাঁর অঞ্জলিতে চুঁইয়ে এসেছিল যে প্রকৃত জীবনবোধ তাই দিয়েই তো তিনি রচনা করলেন নবযুগের কথাসাহিত্যের বেদী আর তারই ওপর স্থাপন করলেন নীচের তলার সব মানুষদের। আজ আর একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, শরৎচন্দ্রের জীবনের মূলকেন্দ্র ছিল মানুষ, মূল লক্ষ্য ছিল মানুষ, মূল আকর্ষণ ছিল মানুষ—যেমন ছিল চার্লস্ ডিকেন্সের। শরৎ-সাহিত্য শুধু সাহিত্য নয়—এ এক নতুন জীবনবেদ। এক নতুন জীবন-সংহিতা যার প্রতিটি ছত্রে ঝঙ্কৃত হয়েছে এই সুন্দর কথাগুলি :

('আমি সত্যকে সোজা করে বলবার চেষ্টা করেছি—এ জিনিসটা দরকার। তাই এতে আমি কুণ্ঠা করি না।) মানুষের আত্মার আমি অপমান করতে কখনো পারি না। কোন মানুষকেই নিছক কালো মনে করতে আমার ব্যথা লাগে। আমি ভাবতেই পারি নে যে একটা মানুষ একেবারে মন্দ, তার কোন redeeming feature নেই! ভাল-মন্দ দুই-ই সবার মধ্যে আছে, তবে হয়তো মন্দটা কারো মধ্যে বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ঘৃণা তাকে কেন করব?'

সমাজকে, সংসারকে সুস্থ জীবন চেতনার ওপর দাঁড় করাবার জন্য এই নতুন জীবনবেদের সেদিন প্রয়োজন ছিল—প্রয়োজন ছিল কথাসাহিত্যে এই বিচিত্র জীবনবোধের। জীবনের অখণ্ডিত মহিমা ও সার্থকতা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই না শরৎচন্দ্রের জীবন তথা তাঁর অনুপম সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে উপচে পড়েছিল অমন বুকভরা দরদ আর হৃদয়ভরা শ্রদ্ধা। শরৎ-চন্দ্রিমার আলো তাই আজো অম্লান।

মানুষকে না হারিয়ে আমরা তার মূল্য বুঝতে পারি না। হারাবার পরেও যদি মূল্য না বুঝি তবে সেই দুঃখের আর স্থান কোথায়? কাছের মানুষকে আমরা যথার্থভাবে দেখতে পাই না। তাই মনের

মধ্যে প্রশ্ন জাগে : শরৎচন্দ্রের জীবন-মহিমা, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মূল্য আমরা কি আজো পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি? পেরেছি কি তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে অসংশয়িতভাবে গ্রহণ করতে? তাঁর জন্মের পর শতবর্ষের পলিমাটির আস্তরণ জমে উঠেছে তাঁর জীবনেতিহাসের ওপর। সেই পলিমাটি সরিয়ে আজ আমরা সেই বরেণ্য দরদী সাহিত্যিককে, সেই অপরাজেয় কথাশিল্পীকে, সেই সৃষ্টিছাড়া মানুষটিকে নতুন করে দেখবার, জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করব।

গ্যেটের 'ফাউস্ট' নাটকের মধ্যে আছে : 'The spirit of the ages, be it known,/Is, in the main, the spirit we all own,/Wherein the ages are reflected.' ঠিক তেমনিভাবে শরৎচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে যুগমানস। তিনি নিজে ছিলেন এক সংঘাতমুখর যুগের শিল্পী—এই সংঘাতজনিত দুঃখময় ছিল তাঁর জীবন, দুঃখের হলাহল তাঁকে আকণ্ঠ পান করতে হয়েছিল। এই সংঘাতই তো রূপায়িত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে, সৃষ্টিতে। মানুষকে তিনি গ্রহণ করেছেন সহৃদয়তার সঙ্গে, তাকে বিচার করেছেন তাঁর হৃদয়ের মাপকাঠিতে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব আমাদের যেন অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারে হৃদয়ধর্মী হয়ে উঠতে আর তাঁর জীবনের পাত্র থেকে সেই অমৃত আহরণ করতে যা পান করে আমরা আবার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাভূমিতে সোজা মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়াতে পারব। তবেই না সার্থক হবে আজকের এই শরৎ-বন্দনা।

আজ আমরা বিংশ শতকের অন্তিমলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র তথা শরৎ-সাহিত্যের সঠিক বিচার বা মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। আজকের সাহিত্য সম্পূর্ণভাবেই মস্তিষ্কধর্মী আর অচেতন মনবিশ্লেষণ তার একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষ আজ নিজের প্রতিই বিশ্বাস হারিয়েছে। জীবন প্রত্যয়, আদর্শবোধ এসবই আজ কেমন যেন দিশেহারা। এক কথায় মানুষের জীবনচিন্তা বা জীবনদৃষ্টি যেমন অস্বচ্ছ আর সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে আজকের মানুষ তার অন্তর ও আত্মার একটা

সঙ্কটময় যুগে এসে পৌঁছেছে। তাই বর্তমান যুগের ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে হৃদয়ধর্মী লেখক শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন কিছুটা দুরূহ হলেও প্রয়োজন। কারণ প্রতিটি যুগে যুগের বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাহিত্য বিভিন্নধর্মী হয়ে থাকে, বিভিন্ন পথে রূপায়িত হয়ে থাকে। শিল্পীর সৃষ্টি কিন্তু কোন যুগেই এই সংজ্ঞা বা ব্যাকরণসূত্রকে মেনে চলে নি, যদি চলত তবে সে সৃষ্টি ব্যর্থ হতো। মূলতঃ, মানবাত্মার এই সংঘাতজনিত বেদনার সুন্দর প্রকাশই সাহিত্য। সত্যিকার শিল্পসৃষ্টির আসল রহস্য তো এইখানেই। আর এইখানেই শরৎপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের কথা পরে যথাস্থানে আরো বলা হবে, আপাতত এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু করে রাখা হলো।

বিচিত্র জীবন শরৎচন্দ্রের।

বর্ণাঢ্য তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি।

বাস্তব আর কল্পনা, অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি—এই নিয়ে তাঁর সাহিত্য।

সেই সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ, ব্যক্তিসংঘাত, মানবহৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার করুণ বেদনাময় মুক্তি-সংগ্রামের রঙে ও রসে প্রত্যক্ষ ও সুন্দর। এই প্রত্যক্ষ সুন্দর মানবচিত্তলোক মানব-চিত্তকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে বলেই না শরৎ-জীবনকথা যেমন অনুশীলনযোগ্য, তেমনি তাঁর সৃষ্টি চিরন্তনী সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী—টলস্টয়ের সাহিত্যের মতোই তা কল্যাণকামী। হৃদয় ও মস্তিষ্ক—এই দুটির মধ্যে কোনটি বড়, কোন্ সৃষ্টির মূল্য কতটুকু তার উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ যুগ। আমাদের মনোজগতের ও জীবন-প্রত্যয়ের পরিবর্তনকে স্মরণ রেখেই শরৎপ্রতিভার মূল্যায়ন করতে হবে আজ। তবে মস্তিষ্ক দ্বারা হৃদয়ধর্মকে বোঝা যায় না, অন্যকে বোঝানও যায় না—এই কথাটি আমরা যেন বিস্মৃত না হই। মানবপ্রেমী শরৎচন্দ্রের সংবেদনশীল সেই মানসলোকের প্রতি আমরা আজ যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করব, ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা আর প্রীতির সঙ্গে চেয়ে দেখব তাঁর জীবনের প্রতি—যে জীবন ছিল আলোর

পূজারী, যে জীবনের উচ্চারিত শেষ কথা ছিল--'দাও, আরো দাও'। তবেই না আমরা সেই জীবনশিল্পীকে, বাঙালীর সেই প্রাণের মানুষটিকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পাব। শতবর্ষের এতশতটি অর্ঘ্যপ্রদীপ জ্বেলে তাঁকেই আজ আমরা স্মরণ করব যিনি একদিন বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে প্রবেশ করে বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূচনা করেছিলেন।

॥ দুই ॥

শরৎচন্দ্রের কোন আত্মচরিত নেই, তবে তাঁর গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য রচনার মধ্যে আত্মচরিতমূলক লেখা অনেক আছে। তাঁর নিজের কথা দিয়েই আমরা এই চরিতকথা শুরু করছি।

'দরিদ্রের গৃহে আমার জন্ম। এই তো সেদিনও দূর প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জনে ব্যাপৃত ছিলাম; সেদিন পরিচয় দিবার কোন সঞ্চয়ই ছিল না।'[১]

'ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাকরেদী করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন গামছা-কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বের হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে, নির্জীব দেহে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে, অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন। সেখানে আর এক দফা সংবর্ধনা লাভের পর, আবার বোধোদয়-পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি, আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টা সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাকরেদী শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ

১. ১৯২৮ : ৫০তম জন্মদিনে প্রদত্ত ভাষণ।

যাত্রা—আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি আদর আপ্যায়ন সংবর্ধনার ঘটা। এমনি করে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাংলা জীবনের এক অধ্যায় শেষ হলো। এলাম শহরে। একমাত্র বোধোদয়ের নজীরে গুরুজনেরা ভর্তি করেছিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিক সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসংকোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপর বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

'যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য-উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য। সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকিল হতে। এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে, তিনি এলেন বাড়ি। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি। বাড়ির মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির পরিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানি নে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার সত্য পরিচয়। এর পরে এ বাড়ির উকিল হবার কঠোর নিয়ম সংযম আর ধাতে সইলো না, আবার ফিরতে হলো আমাদের পুরানো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারি নে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমার বাড়ির গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি

পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়ি নে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানি নে। এক ইস্কুলে বেশিদিন পড়লে বিদ্যে হয় না, মাস্টার মশাই স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো শহরে। বলা ভাল, এর পরে আর ইস্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয় নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে যেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

'তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে চায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?'

'এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনও দিন লিখেছি: দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে যে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোনও খবরই জানি নে। কবির সঙ্গে কোনও দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটে নি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগও পাই

নি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ কখানা বই-ই বার বার করে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কিনা—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করি নি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে আমার ছিল পুঁজি।'

'একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্যসেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত ; কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই হলো না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।'[১]

'এমন অনেকদিন গেছে যখন দু'তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক। কত হাড়ী-বাগদীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামে সকলের সঙ্গে মিলেছি, তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ।'[২]

'জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই পড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না পাওয়া

১. ১৯৩১ সালে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।

২. শরৎস্মৃতি : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫

পর্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। জীবনে যে ভালবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল-খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব-কিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে।'[১]

'ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার একটা ঝোঁক ছিল। মনের ভিতর থেকে একটা বাসনা হতো—যা বাইরে পাঁচরকম দেখছি শুনছি তার একটি রূপ দেওয়া যায় না? হঠাৎ একদিন লিখতে শুরু করে দিলাম। প্রথমটায় অবশ্য এর ও'র চুরি করেই অধিকাংশ লিখতাম। অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। অতি ভদ্র শান্তশিষ্ট জীবন হবে, আর সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হবে—তা হয় না। বিশ-বছর এইটাতে কেটে গেল। ঐ সময়ে খানকতক বই লিখে ফেললুম। 'দেবদাস' প্রভৃতি ঐ আঠার-কুড়ির মধ্যে লেখা। তারপর গান-বাজনা শিখতে লাগলুম। পাঁচ বছর ঐতে গেল। এমন অনেক কিছু করতে হতো যাকে ঠিক বলা যায় না। তবে সুকৃতি ছিল, ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়ি নি। দেখতে থাকতাম, সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হতো।···অতি কুৎসিত নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি যা কল্পনা করা যায় না। সেসব অভিজ্ঞতা আমার মনের ভেতর থাকতে লাগল। আমার memory-টা বড্ড ভাল। ছেলেবেলা থেকে in tact আছে, নষ্ট হয় নি।'

'কঠোর সমালোচনা আমি খুবই পেয়েছি। গালাগালির বন্যা বয়ে গেছে। দেশ বুঝে না, গ্রন্থকার, কবি, চিত্রকর—এঁদের জীবন সাধারণ থেকে ভিন্ন। এখানকার লোকে তা জানে না। জানে না যে, এঁদের স্নেহের প্রশ্রয় দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হয়।'

১. দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্রাংশ

'একদিন আমি থাকবো না, তারাও থাকবে না, লোকে হয়তো আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়ই জানতে চাইবে না! তখনও যদি আমার কোন লেখা বেঁচে থাকে, তা নিয়েই আমার বিচার করবে তারা, আমার চরিত্র নিয়ে নয়।…নারীজাতি সম্পর্কে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি। অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনো লালসা হয় নি। তার কারণ এ নয় যে, আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে।…প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা নিষ্ফল হলো, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সে চিরদিন দাঁড়িয়েছে আমার সামনে—সশরীরে নয়।'

'ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের বংশের একটা খ্যাতি আছে। আমাদের বংশে আটপুরুষ ধরে একজন করে সন্ন্যাসী হয়ে আসছে। আমার মেজভাই সন্ন্যাসী। আমার মাতুল-বংশ ধর্মভীরু বংশ। মাতামহ খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। আমিও খুব ধর্মভীরু ছিলাম…এমন কি চার-পাঁচবার সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করে থাকেন—অর্থাৎ গঞ্জিকা-সেবনাদি তা অনেক করেছি। এখন একেবারে উল্টা। ধর্ম নিয়ে চলার যে পথ, ওপথ আমার মোটেই নয়।'

শরৎচন্দ্রের আত্মচরিতমূলক আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা উদ্ধৃত করেই আমরা এই অধ্যায় শেষ করব। এটি তিনি ১৯২২ সালে লিখেছিলেন।

'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্পবয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। পরে পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল

স্বপ্নই দেখে গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে-কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখন স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প-রচনা অকেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি, সে-কথা ভুলে গেলাম।'

'আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মতো। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক-পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁহারা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোনরকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোনরকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম।'[১]

১. বাতায়ন, শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৪

শরৎচন্দ্রের এই অকপট ভাষণগুলিকে অবলম্বন করেই এইবার আমরা বাংলার সেই সর্বকালের অপরাজেয় কথা-শিল্পীর জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করব।

॥ তিন ॥

'দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম'।

এই গ্রামেই উঠছে আমাদের এই কাহিনীর যবনিকা।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের স্মৃতিপূত এই গ্রাম। তাঁর কৈশোরের পাঁচটি বছর এইখানেই অতিবাহিত হয়েছিল। ফারসি ভাষা শিক্ষা করবার জন্য ঐ সময়ে তিনি এইখানে কায়স্থকুলতিলক রামচন্দ্র দত্তরায় মুনসীর গৃহে অবস্থান করেছিলেন। আমাদের এই কাহিনীর নায়ক, বিংশ শতকের বাংলার লোকপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবানন্দপুর তাঁর পিতার মাতুলালয়।

হুগলী জেলার সদর মহকুমার দেবানন্দপুর গ্রাম।

প্রকৃতির পরম রমণীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত এই গ্রাম।

ছোট্ট গ্রাম, কিন্তু ঐতিহ্য এর কম নয়। যে সাতখানি মৌজা নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রাচীন সপ্তগ্রাম, এই গ্রাম তারই মধ্যে একটি মৌজা। রেলপথে ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতী নদীতীরে গ্রামটি অবস্থিত। অনেক কাল আগেই এই নদী মজে গেছে। গ্রামটি ছোট, কিন্তু বৈশিষ্ট্য বর্জিত নয়। নবাবী আমলে এই গ্রামের হিন্দু কায়স্থ জমিদার বংশের অনেকেই আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তখন এই দুটি ভাষাই ছিল অর্থকরী। সেইজন্যই তো ভারতচন্দ্র তাঁর কৈশোর বয়সে সংস্কৃত না শিখে ফারসি ভাষা শিখতে এখানে এসেছিলেন। তখন দেবানন্দপুর ছিল ফারসি

ভাষা শিখবার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। শরৎচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় বাল্য-জীবন এইখানেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ও সাহিত্য-রচনার হাতেখড়িও এইখানে।

চাটুয্যেদের পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত মামুদপুরে। মামুদপুর কাঁচরাপাড়ার কাছে অবস্থিত। সেকালের কুলীন বামুনের মেয়ে ছিলেন শরৎচন্দ্রের পিতামহী। বিয়ের পরেও বেশির ভাগ সময় তিনি দেবানন্দপুরে পিত্রালয়ে অবস্থান করতেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আর মামুদপুরে শ্বশুরালয়ে ফিরে যান নি। মতিলাল তাঁর একমাত্র পুত্র। তাঁর মাতুলরাই তাঁকে এন্ট্রান্স পর্যন্ত লেখাপড়া শেখান ও পরে তিনি এফ. এ. পর্যন্ত পাস করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জন্মকালে পিতার নিজস্ব বাসভবন বলতে কিছুই ছিল না। পরে মতিলাল চাকরি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করলে তাঁর মামারা তাঁকে তাঁদেরই বাড়ির কাছাকাছি চারকাঠা মৌরসী মোকররী জমি বসবাসের জন্য দেন ও সেইখানে তিনি দক্ষিণদ্বারী একতলা একহারা দুই কুঠরি পাকা ঘর ও প্রাচীর নির্মাণ করেন। নানারকম অভাবের ভেতর দিয়ে তাঁকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হতো। ক্রমে মতিলাল ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আদালতের ডিগ্রীর জোরে তাঁর ভদ্রাসন ক্রোক হয়ে যায়। ঐ ডিগ্রীর টাকা মেটাবার জন্য মতিলাল নামমাত্র মূল্যে বসতবাটীখানি তাঁর কনিষ্ঠ মাতুলকে সাফ কোবলায় বিক্রী করতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্যান্য জীবনীকাররা মতিলাল ও তাঁর মায়ের সম্পর্কে যেসব বিবরণ উল্লেখ করেছেন সেগুলি ভিন্ন রকমের। উক্ত বিবরণে বলা হয়েছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের পিতামহীকে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো। ছেলেকে মানুষ করে তোলার মতো সঙ্গতি ছিল না বিধবার। এমন অবস্থায় তখনকার প্রথানুসারে তিনি খুব অল্প বয়সেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। হালিসহর নিবাসী

রামধন গাঙ্গুলীর বড় ছেলে, কেদারনাথের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হয়। ভুবনমোহিনীর বয়স তখন মাত্র সাত বছর। মতিলালকে তাঁর মা রামধন গাঙ্গুলীর হাতে একরকম সঁপে দিয়েছিলেন। বিয়ের পর লেখাপড়া শিখবার জন্য তিনি ছেলেকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেন। শ্বশুরবাড়ি মানে হালিসহর নয়, ভাগলপুর। এই গাঙ্গুলী পরিবার তখন এইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

১৮৬৫ সালে মতিলাল ভাগলপুরে আসেন একরকম 'ঘরজামাই' হয়ে। বছর পাঁচেক পরে ভাগলপুর থেকে এনট্রান্স পাস করে পাটনা কলেজে পড়তে যান। রামধনের কনিষ্ঠ পুত্র অঘোরনাথ ছিলেন মতিলালের সতীর্থ। এঁরা দুজনে একসঙ্গে পাটনায় মেসে থেকে কলেজে পড়তেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিয়ের অব্যবহিত কাল পরেই মতিলালের সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে অধিষ্ঠান হয়। স্ত্রী যতদিন জীবিত ছিলেন, মতিলাল ততদিন ঘরজামাইরূপে শ্বশুরালয়েই বাস করেছিলেন। মাতুলরা ভাগিনেয়কে মানুষ করলেন কি শ্বশুরবাড়ীর দৌলতে তিনি মানুষ হলেন, মতিলাল সম্পর্কে এই পরস্পর-বিরোধী বিবরণের সত্য-মিথ্যার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই। শরৎচন্দ্রের সাক্ষ্যেই আমরা জানতে পারি যে, তাঁর জীবনের প্রথম ষোল বছর জন্মভূমি দেবানন্দপুরে অতিবাহিত হয়েছিল, যদিও সেটা একটানা ছিল না।

শরৎচন্দ্রের জীবনকে আমরা পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করতে পারি। যথা,—১. দেবানন্দপুর ; ২. ভাগলপুর : ৩. রেঙ্গুন ; ৪. শিবপুর ও ৫. সামতাবেড়। জীবনের মাত্র শেষ ছয়-সাত বছর তিনি দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাসভবনে বাস করতেন এবং এই মহানগরীতেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। শরৎচন্দ্রের জীবনীকারদের কেউই দেবানন্দপুরকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি, তাঁরা তাঁর জীবনের ভাগলপুর পর্বের কথাই বেশি করে বলেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যুগপ্রবর্তক যে ঔপন্যাসিকের জীবনের প্রথম

ষোল বছর তাঁর জন্মভূমিতে অতিবাহিত হয়েছিল, এমন কি যেখানে তাঁর প্রতিভার উন্মেষও দেখা গিয়েছিল, সেই দেবানন্দপুরকে তাঁর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।[১]

ভাগলপুরে মতিলালের প্রথমে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইনিই শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী। শরৎচন্দ্রের লেখা 'নারীর মূল্য' গ্রন্থটির সঙ্গে 'অনিলা দেবী' এই নামটি বাংলা সাহিত্যে একসময়ে সুপরিচিত ছিল; তাঁর এই রচনাটি তাঁর দিদির নামেই প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল। অনিলা দেবী তাঁর সহোদর অপেক্ষা বছর চারেকের বড় ছিলেন। হাওড়া জেলায় পানিত্রাসের কাছে সামতাবেড়ের মুখুজ্যে পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। মুখুজ্যেরা একসময়ে জমিদার ও সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। ব্রহ্মদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শরৎচন্দ্রের প্রথম বসতবাড়ি রূপনারায়ণের তীরে এইখানেই তৈরী হয়। ভুবনমোহিনীর পরের সন্তানটিও ছিল কন্যা; ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়। কয়েকমাস পরে ভুবনমোহিনী আবার যখন সন্তানসম্ভবা হলেন তখন ঠিক হলো এবার তাঁকে দেবানন্দপুরে পাঠানো হবে। মতিলাল সঙ্গে এলেন। তাঁর মনের মধ্যে একান্ত অভিলাষ ছিল এবার যেন তাঁদের একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়।

শুভদিনে চাটুজ্যেদের জীর্ণগৃহ সহসা শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে সচকিত হয়ে উঠলো। মতিলালকে তখন প্রসূতি আগারের বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে দেখা যাচ্ছিল। মঙ্গলধ্বনি শুনে ইতিমধ্যে বর্ষীয়সী

১. শরৎচন্দ্রের জীবনের হিসেব নিয়ে নানাজনের নানা মত আছে। তাঁর সম্পর্কীয় মাতুল ও বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত হিসাবটি এই রকম: দেবানন্দপুর পাঁচ-ছয় বছর; ভাগলপুর আঠার-উনিশ বছর; মজঃফরপুর-কলকাতা দু'বছর; রেঙ্গুন দশ বছর; শিবপুর দশ বছর; সামতাবেড় আট বছর এবং কলকাতা সাত বছর—এই মোট বাষট্টি বছরের হিসেব। কিন্তু জন্মস্থান দেবানন্দপুরে তাঁর শৈশব ও বাল্যের অনেকগুলি বছর যে কেটেছে তার স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। ভাগলপুরকে গুরুত্ব দেবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রদত্ত 'দেবানন্দপুরে পাঁচ-ছয় বছর' এই হিসেব কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রতিবেশিনীদের কয়েকজন এসে গেছেন সেখানে। পুরনারীদের সঙ্গে হয় তাঁদের উৎসুক বাক্য বিনিময়। এমন সময়ে মতিলালের মা এসে সংবাদ দিলেন—ছেলে হয়েছে। চাটুজ্যে বাড়িটা যেন আনন্দে সরগরম হয়ে উঠলো। সকলের মুখে এক কথা—ছেলে হয়েছে। মতিলাল তখনি ঘরের মধ্যে গিয়ে একটুকরো কাগজে লিখলেন: 'বাংলা ১২৮৩ সাল, ৩১ ভাদ্র, শুক্রবার (ইংরেজী ১৮৭৬, ১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাতটা সতেরো মিনিটের সময় আমাদের প্রথম পুত্র ও তৃতীয় সন্তানের জন্ম।' এর ঠিক আটত্রিশ বছর আগে কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। কাঁঠালপাড়া ও দেবানন্দপুর—হুগলী জেলার তুই প্রান্তে অবস্থিত তুটি গ্রাম। এই তুটি গ্রামেরই সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলা কথাসাহিত্য গগনে তুটি অবিস্মরণীয় চন্দ্রোদয় প্রত্যক্ষ করবার—এমন যুগল চাঁদের আবির্ভাব বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে আর কখনো ঘটতে দেখা যায় নি।

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের কথা বলবার আগে তাঁর মা ও বাবার কথা কিছু বলা দরকার, কারণ শরৎমানস গঠনে এই তুজনেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; মায়ের চেয়ে অবশ্য পিতার প্রভাবটাই যেন বেশিমাত্রায় তাঁর ওপর দেখা গিয়েছিল। পিতার সেই সদা অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র অনেকখানি লাভ করেছিলেন, এ-কথা শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন। বিয়ের পর মতিলাল লেখাপড়া করতে চলে এলেন ভাগলপুরে। শ্বশুরবাড়ির নিয়মকানুন সবই ছিল আলাদা, অন্যদিকে জামাইবাবাজীর প্রকৃতিটা ছিল অন্য রকমের। আপনভোলা, সংসার সম্পর্কে উদাসীন এই মানুষটি সত্যিই ছিলেন সৃষ্টিছাড়া। সংসারের শত অভাব-অনটনের মধ্যেও কেমন করে যে তিনি বৃহতের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন তা এক বিস্ময়ের বিষয়। দৈনন্দিন জীবনের সবরকম তুচ্ছতা ও

ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে, ভূমার সন্ধানে নিরত থাকাই ছিল তাঁর প্রকৃতি।

'শ্বশুরবাড়িতে সবরকম সুবিধার মধ্যে সবচেয়ে বড় অসুবিধা মতিলাল যেটা বোধ করতেন সেটা ছিল তামাকের অভাব। পড়ুয়া ছেলেদের মোটা ভাত-কাপড় ছাড়া আর কোন কিছুর দরকার যে থাকতে পারে, বাড়ির কর্তারা তা চিন্তা করতেন না। নেশাখোর বলতে যা বোঝায় মতিলাল ছিলেন তাই। তামাক ছিল তাঁর প্রিয় নেশা।' উত্তরাধিকারসূত্রে শরৎচন্দ্র তাঁর পিতার কাছ থেকে এটি লাভ করেছিলেন ষোল আনার ওপর আঠার আনা। বলতেন, তাম্রকূট সেবন চাটুজ্যে বংশের একটা অপরিহার্য ধারা। সকলেই জানেন, নেশার ওপর কি অপরিসীম দরদই তাঁর না ছিল আর কত না মূল্যবান সরঞ্জাম ছিল তাঁর বাড়িতে এজন্য। শরৎ-চরিত্রে এটি একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের লেখক দেখেছেন, সভাসমিতিতে পর্যন্ত কাউকে গ্রাহ্য না করে তিনি তামাকের পরিচর্যা করতেন। কেউ আপত্তি করলে অম্লানবদনে বলতেন, এ বস্তু যেখানে নেই, আমিও সেখানে নেই।

সঙ্গতি ছিল না, কিন্তু মতিলাল খুব শৌখিন ছিলেন। তাঁর মনে কাব্য ছিল, কল্পনা ছিল। দার্শনিকতাও ছিল। সেই সঙ্গে ছিল প্রবল অধ্যয়নস্পৃহা। আবার বই লেখার বাতিকও ছিল খুব। কত যে গল্প উপন্যাস কবিতা ও নাটকই না তিনি লিখেছিলেন তা বলবার নয়। কিন্তু তাঁর সকল পাণ্ডুলিপিই অসমাপ্ত রয়ে যেত। চির অস্থিরচিত্ত পিতার অচরিতার্থ সাহিত্যপ্রেরণাই কি স্ফূর্ত হয়েছিল পুত্রের প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকসম্পাতে? পিতার অধ্যয়নস্পৃহা তাঁর এই পুত্রটির মধ্যেও দেখা গিয়েছিল প্রবলভাবে। শরৎচন্দ্রের কেতাবী শিক্ষা ছিল সামান্যই, কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে আরো আলোচনা করা হবে।

জীবনটাকে কোনরকমে নিশ্চিন্ত-নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়াই ছিল মতিলালের প্রকৃতি। আবার সেই উদ্যমহীন নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে

আমিরি মেজাজে মশগুল থাকাও তাঁর স্বভাবের একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রকৃতি যেমন, আকৃতিও ছিল ঠিক তেমনি। উজ্জ্বল দুটি চোখ—সেই চক্ষুর দৃষ্টিতে ছিল একদিকে বাস্তবের স্পষ্ট স্বচ্ছ অভ্রান্ততা, অন্যদিকে আদর্শের কল্পনা। সাহস, অভিনিবেশ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, স্মরণশক্তি যেমন ছিল, তেমনি ছিল ধৈর্য আর সকল রকম প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার মত মানসিকতা। শ্রীকান্তের সাহাজী ও বড়দিদির সুরেন্দ্রনাথ—তাঁর সৃষ্ট এই দুটি চরিত্রে শরৎচন্দ্র তাঁর পিতাকে অনেকখানি ফুটিয়ে তুলেছেন।

মতিলালের স্বভাবের কাঠামো, তার উপকরণের ধাতু, মানুষের জীবনকে দেখার ভঙ্গীই ছিল অসাধারণ ও বিচিত্র। প্রকৃতির সহজ স্রোতের গতিতে ভেসে গিয়ে যেখানেই হয় না কেন ওঠা—তাতে কিছু-মাত্র আসে যায় না; তার কোন নির্দিষ্ট আদর্শ বা লক্ষ্য নেই। তাঁর চালচলন, মজ্জাগত অভ্যাস, তাঁকে শুধু নিয়ে চলেছে আগে সামনের দিকে—অনেকটা উপনিষদের চরৈবেতির মত। অন্যদিকে তাঁর শ্বশুররা ছিলেন একেবারে বিপরীতপন্থী। সংসারে নিয়ম পালনটা তাঁরা খুব বুঝতেন—গাঙ্গুলী বাড়িটা ছিল যেন রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'—সেখানে অখণ্ড নিয়মের রাজত্ব। কিন্তু গৃহ-জামাতা শুধু যে নৈষ্কর্ম্যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা নয়, নিয়ম পালনেও তিনি ছিলেন পরম উদাসীন।

মতিলাল পৃথিবীতে একটা জিনিসই বুঝতেন, আর তারই প্রাধান্য তিনি স্বীকার করতেন। সেটি হলো মানুষ। নিয়ম নয়, ধর্ম নয়—তিনি একমাত্র মানুষকেই বড় বলে মানতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর কাছে পৃথিবীতে মানুষই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হতো। গঙ্গাস্নান, পূজা-আহ্নিক এসব তাঁর কাছে বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র ছিল। অমৃতস্য পুত্রা—মানুষ অমৃতের পুত্র, তার জন্য কি এসব বাহ্যিক আচার-নিয়মের প্রয়োজন থাকতে পারে? মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য এ পথ নয়। শ্বশুরবাড়ির কঠিন আচার-নিয়মের মধ্যে মতিলাল অনেকটা যেন নির্গুণ ব্রহ্মের মত অবস্থান করতেন। যাযাবর মানুষ। ছন্নছাড়া জীবন।

গ্রন্থকীট, তাম্রকূট-বিলাসী ও সাহিত্য রচনায় প্রবল উৎসাহী। পিতা ও পুত্র দুজনেই যেন একই ধাঁচের, একই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

স্নেহশীলা মা ও সেবাপরায়ণা স্ত্রী ছিলেন ভুবনমোহিনী।

পিতার তিনি খুব আদরের মেয়ে ছিলেন, কিন্তু বিধাতাপুরুষ এমন একটি মানুষের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য সাত বছর বয়সের সময় থেকে বেঁধে দিয়েছিলেন যে, জীবনে তিনি কোনদিনই নিশ্চিন্তভাবে সংসার-ধর্ম করতে পারেন নি। সংসার-বিমুখ স্বামীকে সংসারী করে তুলতে তাঁর প্রয়াসের যেন অন্ত ছিল না। সরস কোমল হৃদয়ের অসীম মাধুর্য দিয়ে তিনি যদি মতিলালকে ঘিরে না রাখতেন তাহলে তিনি হয়ত ভেসে যেতেন। বাপের বাড়িতে ভুবনমোহিনীর অনাদর ছিল না সত্য, তথাপি স্বামীর পরাশ্রিত জীবন তাঁর আদৌ মনঃপূত ছিল না। তারপর নিজের সংসারের চাপ যখন বাড়ল তখন শ্বশুরবাড়ির অন্নদাস হয়ে না থেকে ভুবনমোহিনী স্বামীকে স্বাধীনভাবে কাজকর্মের চেষ্টা করতে তাগিদ দিতেন। স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করা মতিলালের পক্ষে কঠিন ছিল। চাকরির কথা এতকাল তিনি চিন্তাই করেন নি।

শেষ পর্যন্ত ভাগলপুর জেলে ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি নিলেন মতিলাল। বাপের বাড়িতে তখন থেকে মাসান্তে ভুবন-মোহিনীর হাতে যখন স্বামীর উপার্জনের ত্রিশটি টাকা আসত, তাতেই তিনি যেন পরম সুখ বোধ করতেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে মাইনের সব টাকা মতিলাল স্ত্রীর হাতে তুলে দিতেন না—তাঁর নেশার বাবদ অর্ধেক টাকা রেখে দিতেন। তাতেও ভুবনমোহিনী কোন অনুযোগ করতেন না। তাঁর মায়ের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলতেন, আমার মা ছিলেন খুবই উদারপ্রাণ, সংসারের সকল দুঃখকষ্ট তিনি হাসিমুখেই সহ্য করতেন। ত্যাগ, কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা, স্নেহপ্রবণতা—এইসব গুণের সমন্বয়ে গঠিত ছিল তাঁর চরিত্র। স্বামী-সেবা ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, নিজের হাতে তিনি বাবার তামাক সাজতেন। পতিভক্তি ও সন্তান-পালনে তিনি ছিলেন আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী।

পুরনারীর পক্ষে শান্ত স্বভাব, সেবাপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা যে একান্ত প্রয়োজন এবং এইসব গুণই যে নারীর ভূষণ এই জিনিস শরৎচন্দ্রের প্রায় নারীচরিত্রে ফুটে উঠেছে। মাতা ভুবনমোহিনীর নির্বাক ও নিঃশব্দ সাংসারিক জীবন, তাঁর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আন্তরিক সেবাধর্ম হয়ত বা পুত্রের অজ্ঞাতসারে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে একটি মহিয়সী মাতৃমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এরই প্রভাব পড়েছিল তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে। এই ভুবনমোহিনীকেই কি আমরা তাঁর সৃষ্ট অন্নপূর্ণা, নারায়ণী, সিদ্ধেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি নারীচরিত্রগুলির মধ্যে দেখতে পাই না? মনের দৃঢ়তা আর অন্তরের স্নেহ দিয়ে তিনি সব সময়ে ঘিরে রাখতেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। তবে তাঁর দৃষ্টিটা সর্বক্ষণের জন্য থাকত তাঁর দুরন্ত ও চঞ্চল পুত্র শরৎচন্দ্রের ওপর। মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটা যেন তাঁরই ওপর গিয়ে পড়েছিল।

এইবার দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের কথা।

'বালক শরৎচন্দ্র ছিলেন চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির। তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদেরই বাটীর নিকটবর্তী প্যারী পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে; একটি প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালাটি বসিত এবং এখানে অনেকগুলি 'পড়ুয়া' ছাত্র-ছাত্রী ছিল; শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র কাশীনাথ তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় শরৎচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও অনেক সময়ই তাঁহার দুরন্তপনা নির্বিচারে সহ্য করিতেন। পাঠশালায় দুরন্তপনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নূতন স্থাপিত সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মাষ্টার মহাশয়ের বাঙলা স্কুলে ভর্তি করিয়াছেন ও এই স্কুলে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল পড়েন। এই স্কুলেই যখন তিনি বোধোদয় ও পদ্যপাঠ পড়িতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ দশ বৎসরের অধিক নহে। এই সময়ে তাঁহার পিতা বিহারের কোন স্থানে

একটি চাকুরি পান ও স্ত্রী-পুত্রগণকে ভাগলপুরে রাখিয়া দেন এই সময়েই শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের বাঙলা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের শ্রেণীতে ভর্তি হন ও পর বৎসর (ইং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মতিলালও এই সময়ে আবার কার্যত্যাগ করিয়া দেশে সপরিবারে ফিরিয়া আসেন। কাজেই শরৎচন্দ্রকে হুগলী শহরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য ভর্তি হইতে হইল।

'তিনি ভর্তি হইলেন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ইং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ও গ্রাম হইতে যাতায়াত করিতেন। গ্রামের অনেকগুলি ছেলেই তখন হুগলী শহরে যাতায়াত করিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িত। শরৎচন্দ্র এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হন : কিন্তু এখানে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর পড়া শেষ করার সুযোগ হইল না। এই সময়ে তাঁহার পিতার ঋণভার এরূপ বেশি হইয়া পড়িয়াছিল যে বিদ্যালয়ের বেতন যোগানও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই এবং কিছুদিনের জন্য স্কুলে পড়াও বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ইং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতা পরিবারবর্গকে পুনরায় ভাগলপুরে লইয়া গেলেন এবং পুনরায় চাকুরির সন্ধানে বাহির হইলেন। শরৎচন্দ্র তাহার পর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাতুলালয়ে থাকিয়াই তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হইলেন। সুতরাং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি দেবানন্দপুরেই কাটাইয়াছিলেন।

'দেবানন্দপুর হইতে যে কয়টি ছেলে হুগলী শহরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত তাহাদের একটি দলের নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র। পাঁচ-ছয় জনে এই দলটি গঠিত ছিল ও তাঁহারা একত্রেই স্কুলে যাইতেন, তিন মাইল কাঁচা রাস্তা ; গ্রীষ্মকালে ধূলা ও বর্ষাকালে কাদায় রাস্তাটি পরিপূর্ণ থাকিত। শরৎচন্দ্র পথে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করিতে করিতে চলিতেন এবং পথের ধারে বাগান হইতে সুবিধামত সুস্বাদু ফলও সংগ্রহ করিয়া সদ্ব্যবহার করিতেন। পথে তাঁহাদের

বিশ্রামের জন্য দুই-তিনটি নির্জন স্থানও স্থির করা ছিল। (গ্রাম হইতে বাহিরে আসিয়াই প্রথমে তাঁহারা মিলিত হইতেন হুগলী-সাতগাঁও রাস্তার 'মুড়া অশ্বত্থতলায়'—'দত্তা' উপন্যাসে যাহাকে 'ন্যাড়া বটতলা' বলিয়াছেন।)

'এই স্থান তখনকার ছেলেদের মনে বিশেষ ভীতির সঞ্চার করিত; দুঃসাহসী শরৎচন্দ্রের দলের ছেলেরা তাঁহার সহিত মুড়া অশ্বত্থতলায় মিলিত হইয়া, 'গলায় দ'ড়ের বাগান' পার হইয়া যাইত। গ্রামের ভিতরেও তাঁহার দলের ছেলেদের একটি গোপনীয় আড্ডা ছিল। শরৎচন্দ্রের পৈতৃকভবনের অনতিদূরেই সরস্বতী নদীতে যাইবার যে সদর রাস্তা (বর্তমানে এই রাস্তাটির নাম শরৎ চট্টোপাধ্যায় রোড) আছে, তাহার পার্শ্বে মুন্সী জমিদার বাবুদের হেদুয়া পুষ্করিণীর সীমানাস্থিত গড়ের জঙ্গলের মধ্যে নিজহস্তে মাটি কাটিয়া শরৎচন্দ্র একটি বড় রকম গর্ত খনন করেন ও তাহার ভিতর একখানি ঘরের মত রচনা করিয়াছিলেন: এই ঘরে গ্রামের বাগান হইতে গোপনে আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলা প্রভৃতি যে সময়ের যে সুস্বাদু ফল তাহা সঞ্চয় করা হইত ও বন্ধুবান্ধবদের লইয়া ঐগুলি সকলের গোপনেই সদ্ব্যবহার করা হইত।

'ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরে বা অপরাহ্নে এবং মাঝে মাঝে স্কুল পলাইয়াও সরস্বতী নদীর তীরে বসিয়া বা গ্রামের জমিদার বাবুদের 'নূতন পুকুর' বা 'দীঘি' পুষ্করিণীর পাড়ে ঝোপের আড়ালে বসিয়া তিনি ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেন; এই ছিপ তিনি নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইতেন। ইহা ছাড়া কখনও একাকী, কখনও বা বন্ধুদের সহিত ফেরি-ঘাটে পারাপারের যে ডোঙা থাকিত তাহা খুলিয়া লইয়া বা জেলেদের নৌকা তাহাদের অজ্ঞাতসারে লইয়া নদীবক্ষে দুই-তিন মাইল দূর পর্যন্ত, হয় কৃষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত আখড়া-বাটী পর্যন্ত বা সপ্তগ্রামের পুল অবধি বেড়াইয়া আসিতেন। (কৃষ্ণপুরের এই বৈষ্ণবদের আখড়া-বাটী তাঁহার একটি প্রিয় স্থান ছিল এবং বন্ধুদের লইয়া বা একাকী পদব্রজেও এইস্থানে

যাইতেন। এই স্থানের বর্ণনা তাঁহার শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থপর্বে 'মুরারিপুরের আখড়া' নামে লিখিত হইয়াছে।

'বাল্যজীবনে শরৎচন্দ্র দুঃসাহসীও যেমন ছিলেন, কোমল হৃদয়ও তেমন তাঁহার ছিল। আর্ত ও পীড়িতের সেবার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সর্বদাই জাগ্রত থাকিত। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে যখন পড়িতেন, তখন আবশ্যক হইলে গভীর রাত্রিতেও একাকী একটি লণ্ঠন ও একটি লাঠি হাতে লইয়া তিন মাইল নির্জন পথ অতিক্রম করিয়া শহর হইতে কোনও রোগীর জন্য ঔষধ আনিতে বা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে মোটেই সঙ্কোচ করিতেন না বা রাত্রি জাগরণ করিয়া কোনও রোগীর সেবা করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার বালকসুলভ চাপল্যের জন্য যেমন তিনি গ্রামের কতক লোকের অপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার সৎসাহস ও আর্তসেবা প্রবৃত্তির জন্য তেমনি ছিলেন অনেকের প্রিয়। স্থানীয় জমিদার নবগোপাল দত্ত-মুন্সী মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের এতদূর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, তাঁহাদের অন্তঃপুরেও শরৎচন্দ্রের যাতায়াত ছিল এবং মহিলাগণও তাঁহাকে বাড়ির ছেলের ন্যায়ই আদর-যত্ন করিতেন।

'দেবানন্দপুরের আর একটি কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনে মেলামেশা ছিল এবং এই বাটীর একটি ছেলের সহিত তিনি প্রায়ই দাবা খেলিতেন। এই ছেলেটির কনিষ্ঠা ভগিনী—শরৎচন্দ্র যে সময়ে পাঠশালায় পড়িতেন সেই সময়ে ঐ পাঠশালারই ছাত্রী ছিলেন এবং তখন হইতেই শরৎচন্দ্রের সহিত সর্বদাই সঙ্গিনীর ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেন—দুজনের ভাবও ছিল যত ঝগড়াও হইত তত। নদী বা পুকুরের পারে ছিপ লইয়া মাছধরা, ডোঙা বা নৌকা লইয়া নদীবক্ষে বেড়ান, বৈঁচি ফল পাড়িয়া মালা গাঁথা, বাগান হইতে গোপনে ফল সংগ্রহ করা, ঘুড়ির সূতা মাজা ও ঘুরি তৈয়ার করা, বন-জঙ্গলে বেড়ান প্রভৃতি সকল রকম বালকসুলভ চাপল্যের কাজে এই মেয়েটিই ছিল শরৎচন্দ্রের সহচারিণী। এ কারণেই বোধ হয়

এই শৈশব-সঙ্গিনীর প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কয়েকটি নারীচরিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।) গান-বাজনায়ও এই বয়সেই শরৎচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল। গ্রামের ভিতরে গান-বাজনার নিয়মিত চর্চার সুযোগ ছিল না বলিয়া একবার তিনি বাটী হইতে পলায়ন করিয়া এক যাত্রার দলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখানে হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসা হয়।'

এই দেবানন্দপুরকে শরৎচন্দ্র কোনদিন বিস্মৃত হন নি।

॥ চার ॥

কোনো বিশিষ্ট লেখকের জীবন ও চরিত্র, তাঁর প্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি বুঝতে হলে, তিনি যে কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই কালের ইতিহাস কিছু জানতে হয়। বংশের পরিচয় অথবা জন্মস্থানের পরিচয় যেমন মানুষের বড় পরিচয়, তেমনি উত্তরকালে যাঁরা তাঁদের সাহিত্যকৃতি দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল করেন, জাতির মানসলোক উদ্দীপ্ত করেন, তাঁদের জীবনের প্রধান পটভূমিকা তাঁদের সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমি রচিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই। বাংলার নবজাগরণ তখন অনেকখানি পথ অতিক্রম করে সমাপ্তির দিকে চলেছে বহু ও বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার ভেতর দিয়ে। এসব ঘটনার কেন্দ্রভূমি ছিল শহর কলকাতা—এখানেই তখন নূতন একটা সমাজ গড়ে উঠেছিল। নূতন ও পুরাতনের সংঘাত এই নূতন শহরের সমাজ-জীবনকে তখন যতখানি

১. দেবানন্দপুরের অধিবাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত-মুন্সী বিরচিত 'দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

আলোড়িত করেছিল, সমগ্র গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনকে ঠিক ততখানি আলোড়িত করতে পারে নি।

উনিশ শতকের প্রারম্ভেই দেখা যায়, মধ্যযুগীয় চালচলন, সামন্ত যুগের মেজাজ আর ক্ষয়িষ্ণু নবাবী আমলের বহু সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার প্রাধান্য বাংলায় পুরোমাত্রায় রয়ে গেছে এবং এর ফলে তখনকার সংস্কৃতি এই নব-অভ্যুদিত সামাজিক আভিজাত্যের পদতলেই স্থান পেয়েছিল। আভিজাত্যের সামাজিক অভিব্যক্তিও ছিল বিকৃতরুচি বিত্তবানদের উৎকট বিলাসিতা দ্বারা চিহ্নিত। তারপর নূতন জীবনস্রোতকে আহ্বান করে নিয়ে রামমোহন যখন এলেন তখন থেকে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক এই বিকৃতির স্রোত মন্দীভূত হতে থাকে। সেদিন থেকেই পুরাতন জীবন-প্রবাহের পাশাপাশি একটি নূতন জীবনস্রোত, বলিষ্ঠ ও সুস্থ জীবনস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। বাংলার সমাজ-জীবনের উদয়াচলে রামমোহনের চিন্তা ও কর্মকে আশ্রয় করে যে নব সূর্যোদয় দেখা দিয়েছিল, উনিশ শতকের প্রকৃত মাঙ্গলিক সেই শুভক্ষণেই রচিত হয়েছিল।

প্রবর্তিত হলো ইংরেজী শিক্ষা। নবীন জীবনের প্রস্তুতির জন্য সমগ্র মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার সর্বাত্মক প্রয়াস দেখা দিল নানাদিকে। দেশের জায়গায় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজী স্কুল, জাতীয় ভাষা—বাংলাভাষারও প্রসার ঘটতে থাকে তারই পাশাপাশি। এইভাবে মানস-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নির্মিত হয় জাতীয় সমুন্নতির ভিত্তি। সেই ভিত্তির ওপর রচিত হতে থাকে সাহিত্যের নূতন সৌধ। এই সময়ে যে সমাজ-সংস্কার নবজাগরণকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল সেটি ছিল রামমোহনের নেতৃত্বে পরিচালিত সতীদাহ আন্দোলন।

সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এলো ধর্মসংস্কার। প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রহ্মসমাজ—জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে একেশ্বর ব্রহ্মের উপাসনা এবং বাংলাভাষায় বেদান্ত উপনিষদের অনুবাদ—এসবই ছিল রীতিমত বৈপ্লবিক কাণ্ড। নবজাগরণ তো বিপ্লবের বা আমূল সংস্কারের রাজপথ

দিয়েই আসে। একথা আজ নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, তাঁর শাণিত যুক্তি ও প্রখর বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই রামমোহন নির্মাণ করেছিলেন নবযুগের চালচিত্র। এই ঘুমন্ত দেশে তিনি যখন জাগরণের শঙ্খধ্বনি করে তাঁর স্বজাতির মধ্যে এসে দাঁড়ালেন তখন থেকেই যেন আলোর প্লাবন বয়ে যেতে থাকে বাঙালীর স্তিমিত জীবনের দুই তট দিয়ে।

এইভাবে সমাজ-জীবনের কূপমণ্ডুকতা যতই বিলীয়মান হচ্ছিল, শিক্ষিত বাঙালীর জীবনবোধ ততই প্রখর ও প্রবল হয়ে উঠছিল। বাংলার যে সমাজ-জীবন অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই স্তিমিত হয়েছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যেই বহিরাগত শক্তিশালী সভ্যতার সংস্পর্শে সেই স্তিমিত জীবনস্রোতে আবার তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠতে থাকে। সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে দেখা গিয়েছিল নবযুগ-জীবনের বর্ণাঢ্য চিত্র। রামমোহনের যুগ, ইয়ং বেঙ্গলের যুগ অতিক্রম করে সেদিন জন্ম নিয়েছিল যে নব সংস্কৃতি তারই সূতিকাগারে শরৎচন্দ্রের জন্মের আটত্রিশ বছর আগে জন্মেছিলেন তাঁরই পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র।

বাংলা সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করেছিলেন ইনিই।

ঠিক যে বছর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা উঠে যায় সেই বছরেই জন্মগ্রহণ করলেন শরৎচন্দ্র। বঙ্গদর্শন ছিল সেই সূর্যোদয়। বাংলার নব-জাগৃতির তৃতীয় বা শেষপর্বটি ছিল একান্তভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার আলোকে ভাস্বর। ১৮৬৫ অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জন্মের এগারো বছর আগের বৎসরটি বাংলা সাহিত্য-জগতের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বছরে আমরা যুগপৎ প্রত্যক্ষ করলাম এক প্রতিভার অস্তাচলে গমন, অন্য একটি প্রতিভার অভ্যুদয়। একদিকে প্রবাসে, সুদূর য়ুরোপে নবযুগের প্রথম মহাকবি মধুসূদন বাণী-প্রতিমা বিস্মৃতির জলে বিসর্জন দিয়ে কবি-জননীর কীর্তি-দীপান্বিতা পাদপীঠতলে চিরবিদায় গ্রহণ করছেন, আর অন্যদিকে সেই একই সময়ে বাংলার সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ করছেন সব্যসাচী

বঙ্কিমচন্দ্র। একদিকে কীর্তিক্লান্ত অশান্ত এক কবি-জীবনের মহাবসান আর অন্যদিকে অপর এক মহৎ শিল্পীর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটে নি। বিদায়কালে মাইকেল বাণীর কাছে বর প্রার্থনা করে লিখলেন ঃ

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

আমরা জানি, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যৌবন-মুক্তির প্রথম কবির এই প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নি। বাংলাদেশকে আপন প্রতিভার মহিমময় আলোকে উদ্ভাসিত করে আবির্ভূত হলেন বাণীর আর এক বরপুত্র—বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের আয়ুষ্কালের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সাহিত্যে আর এক নবরবি দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় কবিতায় যেমন বাংলা কথাসাহিত্যেও তেমনি নিয়ে এলো আর একটি যুগান্তর। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে যে নবযুগ দেখা দিয়েছিল, সেই যুগেরই সন্তান ছিলেন শরৎচন্দ্র। দেবানন্দপুরে নয়, নবযুগের কোলেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তিনি। ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন স্বাধীন চিন্তার উদার পরিবেশের মধ্যে।

কোন কোন মানুষ বড় হয়ে জন্মগ্রহণ করে, আবার কোন কোন মানুষ নিজের চেষ্টায় বড় হয়। প্রতিভা জিনিসটা যতখানি বিধিদত্ত সম্পদ, উত্তরাধিকারসূত্রে ঠিক ততখানিই প্রাপ্ত বস্তু। প্রতিভা আবার কিছুটা অর্জিত সম্পদও বটে। এ-কথা মিথ্যা নয় যে প্রতিভার জন্মরহস্য দুর্জ্ঞেয়। প্রতিভার প্রকৃতি-নির্ধারণ যথার্থই অসাধ্যসাধন। আবার এ-কথাও সত্য যে পরিবেশই প্রতিভার লালন-পালন করে থাকে। দেবানন্দপুরে বঙ্কিম-প্রতিভার আলোকোজ্জ্বল যে পরিবেশের মধ্যে শরৎ-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিল একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ

পরিবারে, সেই আবির্ভাব যুগের প্রয়োজনেই ঘটেছিল, এ-কথা আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে। শরৎচন্দ্রের জীবন ও তাঁর প্রতিভার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে তাঁর সমসাময়িক পটভূমিকা ও পরিবেশকে আমাদের দৃষ্টিপথে রাখা দরকার। সাহিত্যে যিনি বিদ্রোহের বাণী নিয়ে প্রবেশ করবেন, যিনি প্রবর্তন করবেন একটি নূতন অধ্যায়ের, তাঁর জীবনকথা পরিপার্শ্ব ও পটভূমি এ দুটিকে বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না।

শরৎচন্দ্রের জন্মকাল ইংরেজী ১৮৭৬ সালে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ তখন শেষ হয়ে প্রায় আরো ত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কাজেই শরৎচন্দ্র যে তাঁর প্রাণরস উনিশ শতকের বাংলার বর্ণাঢ্য নবজাগৃতি থেকেই আহরণ করবেন তা একরকম অবধারিত। উনিশ শতক একদিকে যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রভায় সমুজ্জ্বল, তেমনি আবার জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির অবদানে সমৃদ্ধ। আবার এই যুগই দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির তপস্যায় পবিত্র। মোট কথা, বাংলার আকাশে তখন নানাদিকেই যেন চাঁদের হাট বসেছিল। বাঙালী যে তার নিজের পথ নিজেই করে নিতে পেরেছিল তার কারণ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই এতগুলি সঞ্জীবনী প্রতিভার আবির্ভাব। যে জাতির জীবনে একটিমাত্রও এমন যুগের উদয় হয়, সে জাতির আশা আছে। এই ভাবময়, কর্মময় যুগের প্রাণশক্তিতে পরিপুষ্ট হয়েছিল শরৎচন্দ্রের মানসলোক, তাঁর ভাবজীবন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের মধ্যবর্তীকালে বাঙালীর সমাজ বা ধর্মজীবন যে একেবারে নিন্দনীয় ছিল তা নয়। ধর্মের উচ্চ চিন্তা না থাকলেও সেদিনের বাঙালীর মধ্যে ধর্ম ভাবটা ছিল প্রবল ও আন্তরিক। শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে তারা ছিল অভ্যস্ত। ধর্মভাব প্রবল ছিল বলেই না এই সময়কার সাধারণ বাঙালী-জীবন এই কয়টি বিশেষ গুণের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল—সভতা, সত্যবাদিতা, সরলতা, আন্তরিকতা ও লক্ষ্যসাধনে নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা। যৌথ পরিবার

প্রথা তখনো একেবারে লুপ্ত হয় নি, সমাজ তখন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ছিল না, ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক। যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শটা বাংলাদেশে ছিল বলেই না এর সমাজ-জীবনে সম্প্রীতি ও মানবিকতা-বোধ বিদ্যমান ছিল। শরৎচন্দ্রের সময়েও এই একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ একেবারে অবলুপ্ত হয় নি।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দুই-ই যেন সহসা গতিবেগসম্পন্ন হয়ে উঠল। আষাঢ়ের বর্ষণের মতই বাংলার শ্যামল মাটিতে নব নব প্রতিভার আবির্ভাব। এতকালের উপেক্ষিত ও অনাদৃত বাংলা ভাষাকে যাঁরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাকে ভাবপ্রকাশের একটা উত্তম বাহনরূপে পরিণত করলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের দানই ছিল সমধিক। বাঙালী-জীবনে এঁরাই বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিয়ে আসেন একটি নূতন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী। স্মার্ত রঘুনন্দনের বাংলা রাতারাতি রূপান্তরিত হয়ে গেল এক নূতন বাংলায়— বাঙালীর জীবন-বীণায় ঝঙ্কৃত হতে লাগল সাম্য এবং স্বাধীনতার সুর। এই বিচিত্র ও বৈভবমণ্ডিত পরিবেশের মধ্যেই উনিশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

॥ পাঁচ ॥

এইবার শরৎচন্দ্রের মাতুল বংশের কথা বলি।

তাঁর মাতামহ রামধন গাঙ্গুলী থেকেই এই পরিবারের সৌভাগ্য ও প্রতিপত্তির সূচনা। যে বছরে রামমোহন সেরেস্তাদারের চাকরি ছেড়ে রংপুর থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, রামধন গাঙ্গুলী সেই বছরে হালিসহর থেকে ভাগ্যান্বেষণে পাটনা যাত্রা করেন। তাঁর দেশত্যাগের কারণ ছিল দারিদ্র্য। কথিত আছে, তাঁর মায়ের পরামর্শেই ও প্রেরণায় পুত্র রামধন পাটনায় আসেন প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায়।

তখন রেল-লাইন খোলা হয় নি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব সবে কায়েম হয়েছে।

নবাবী আমলের চিহ্ন তখনো পর্যন্ত কিছু কিছু রয়ে গেছে। রয়ে গেছে সেই সুবা বাংলা বিহার উড়িষ্যার মানচিত্রের ওপর। নদীপথে নৌকা দিয়ে তখন যেতে হতো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। সক্ষমদের জন্য ছিল পায়ে হাঁটার সড়ক। বাংলা থেকে পেশোয়ার অবধি এই সড়ক তৈরী করিয়েছিলেন শেরশাহ। এই সড়কের এখনকার নাম গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। রামধন এই পথ দিয়েই জীবিকার অন্বেষণে পায়ে হেঁটে পাটনা এসেছিলেন।

বিদেশী শাসকের ভাষার তখন খুব আদর।

সরকারী চাকরি পেতে হলে ইংরেজী জানতেই হতো। যেমন তেমনভাবে জানলেই চলত। রামধন লেখাপড়া সামান্যই জানতেন। কারণ তখনো পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনটাই হয় নি ঠিক মত। তবে তিনি ইংরেজী বুঝতেন, পড়তে পারতেন। হাতের লেখা ছিল মুক্তার মত। মিশনারি সাহেবরা তখন কলকাতার আশেপাশে দু-একটা ইংরেজী পাঠশালা বসিয়েছে—তারই একটাতে রামধন হয়ত কিছুদিন ইংরেজী শিখে থাকবেন। সেই সামান্য ইংরেজী জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন ছিল বলতেই হবে। ইংরেজী বুলির জোরে তিনি একেবারে কালেক্টরের সেরেস্তাদারির চাকরিতে বহাল হন।

পাটনায় তিনি অবশ্য বেশিদিন ছিলেন না।

বদলি হয়ে এলেন ভাগলপুরে।

এইখানেই তিনি বসতি স্থাপন করেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বর্তমান বিহারের পাটনা, ভাগলপুর, মজঃফরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু বাঙালী এসে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করেছেন এবং ঐসব স্থানে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রধানতঃ তাঁদেরই প্রচেষ্টায় হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে এইসব অঞ্চলে বাঙালীদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। রামধন

পাটনায় থাকাকালেই সরকারী কাজে দক্ষতা দেখিয়ে তাঁর উপরওলার প্রশংসাভাজন হন। পাটনার কালেক্টরের কাছ থেকে ভাগলপুরের কালেক্টর যখন রামধনের কর্মদক্ষতার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর সেরেস্তাদাররূপে রামধনকে পাবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

রামধন ভাগলপুরে এলেন।

রামমোহনও তাঁর কর্মজীবনে এক্‌সময়ে এখানে ছিলেন।

অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। গঙ্গার তীরে অবস্থিত। জলবায়ু উৎকৃষ্ট। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যও ছিল। দামেও খুব সস্তা। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তখন ভাগলপুরে রুইমাছ বিক্রী হতো এক পয়সা সেরে; সরষের তেল টাকায় ছয় সের। খাঁটি দুধ টাকায় আধমণ, কি আরো বেশি। দামে যেমন সস্তা, ওজনও বেশি। সবকিছু মিলিয়ে তখনকার ভাগলপুর বাঙালীর কল্পনার স্বর্গ ছিল। এসব জিনিসের ভাগীদারও কেউ ছিল না। কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল একেবারেই নিরামিষাশী—তাদের প্রধান খাদ্য ছাতু আর লাড্ডু। খাদ্যদ্রব্যের দাম যেমন, জমিজমার দামও তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য রকমে সস্তা। খুব বেশি হলে মাত্র কুড়ি টাকায় মিলত বড় মাপের এক বিঘা জমি।

রামধন সেরেস্তাদার ছিলেন।

সেরেস্তাদারিতে উপরি পয়সার সুযোগ অনেক।

ইচ্ছে করলে রামধন সে সময়ে এখানে জমীদারী করতে পারতেন। তাঁর সময়েই তো বহিরাগত অনেক বাঙালী—যাঁদের কেউ সরকারী কর্ম উপলক্ষে আবার কেউবা ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন—প্রচুর জমিজমা করে মান্যগণ্য হয়েছিলেন। পাটনা ও ভাগলপুরে তখন থেকেই বাঙালীর প্রাধান্য গড়ে উঠতে থাকে। তখন এখানে ইংরেজী জানেবালা বলে বাঙালীর খুব খাতির ছিল, ইজ্জত ছিল। শিক্ষাদীক্ষা প্রসার করবার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তাদের সমাদরও ছিল অপরিমেয়। বিহারীদের কাছে তখনো পর্যন্ত মাছ-মাংসের তুল্য ইংরেজী শিক্ষাটাও ছিল বর্জনী

জমিদারী করলে করতে পারতেন রামধন।

কিন্তু মানুষটা ছিলেন ধর্মভীরু; উপরিতে মতিগতি ছিল না।

তা'ছাড়া দেশের মাটির প্রতি প্রবল টান ছিল তাঁর। হালিসহরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাটা সবসময়েই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। পেনসন নিয়ে দেশে ফিরেও এসেছিলেন তিনি, কিন্তু ম্যালেরিয়াতে মারা যান। তাঁর কোন ছেলেই আর হালিসহরে প্রত্যাবর্তন করেন নি, তাঁরা ভাগলপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। ভাগলপুরে তাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই গাঙ্গুলীরা ভাগলপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন ও কালক্রমে শিক্ষায়-দীক্ষায় ও বৈভবে এঁরা এখানে অশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেন। রামধনের একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, নাম রামচন্দ্র। এঁর একমাত্র পুত্র অক্ষয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র, প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী; ইনি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল হতেন। রামধনের স্ত্রী গোবিন্দমণি স্বামীর মৃত্যুর পরে অনেকদিন জীবিতা ছিলেন। গাঙ্গুলী-পরিবারে তিনিই ছিলেন কর্তামা।

কেদারনাথ, দীননাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথ—রামধনের এই পাঁচটি কৃতী পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনী ছিলেন শরৎচন্দ্রের মা। রামধন তাঁর এই পৌত্রটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। রামধনের হাতেই তো শরৎচন্দ্রের পিতামহী মতিলালকে সঁপে দিয়েছিলেন। কন্যা ও জামাতা দুজনেই বিন্ধ্যবাসিনী ও কেদারনাথের অশেষ স্নেহের পাত্রী ও পাত্র ছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী কেদারনাথের স্ত্রী। কেদারনাথের দুই পুত্র ও তিন কন্যা—পুত্র দুটির নাম ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। শরৎচন্দ্র তাঁর 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের নামের সঙ্গে তাঁর এই মাতুলটির নাম গ্রথিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের বহু চরিত্রের বাস্তব উপকরণ তাঁর মাতুল-পরিবার থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। আদর্শবাদী ও হিন্দুধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও আস্থাবান এই পরিবারের একটি সুন্দর চিত্র আমরা পাই 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে।

তিনপুরুষ ধরে গাঙ্গুলীরা সেরেস্তাদারি করেছেন।

এই পরিবারের একান্নবর্তিতার দৃষ্টান্ত সে সময়ে অন্য পরিবারেরও অনুকরণীয় ছিল। সংসারে সকল ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার —রোজগার একজনেরই হোক বা দুজনেরই হোক, সকলের সমান অধিকার ছিল তাতে। জেঠতুতো-খুড়তুতো বলে কারো মনেই কোন-রকম পার্থক্যের ভাব ছিল না, তার প্রয়োজনও হতো না, এমন কি সে চিন্তাই জাগত না কারো মনে। সবাই যেন একই পিতা-মাতার সন্তান।

একেই বলে একান্নবর্তী পরিবার।

এই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে, এই উন্নত আদর্শের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন শরৎচন্দ্র। তাইতো হিন্দুধর্ম ও একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শের প্রতি তাঁর মধ্যে একটা সহজ প্রবণতা ছিল। শরৎ-সাহিত্য যে বাঙালী পাঠকের হৃদয়-মনকে আকর্ষণ করে তার আসল রহস্যটা তো এইখানে। গাঙ্গুলী-পরিবারের কথা বললাম। এইবার ভাগলপুরে বাঙালীটোলায় বিখ্যাত গাঙ্গুলীবাড়ির একটু বর্ণনা দিই। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের এই বাড়ির বৈঠকখানা তো অক্ষয় হয়ে আছে।

দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিরাট দোতলা বাড়ি।

আবার শিক্ষাদীক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরবে অতি গৌরবান্বিত একটি বাড়ি। পরিকল্পনা মাফিক তৈরী নয়। যখন যেমন দরকার হয়েছে তখন এর পরিধি বিস্তার লাভ করেছে। উত্তরে, গঙ্গা থেকে দুশো হাত দূরে, পূবদ্বারী শিমুল কাঠের একটি প্রকাণ্ড দরজা। সেই দরজা পার হলেই চোখে পড়বে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি সুবৃহৎ প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। নানারকম জীব-জন্তু ও পাখির নিরাপদ আশ্রয়স্থান সেটি। সামনে, দুধারে বারান্দায় পশ্চিমা দারোয়ানদের আস্তানা। কেদারনাথ কালেক্টরের সেরেস্তাদার, তাই অফিসের কিছু পেয়াদা-প্নিওনও তাঁর বাড়িতে থাকত। বাড়ির এই ভৃত্যমহলটি জমকালো ছিল। বিচিত্র নামধারী এইসব দারোয়ান-

পেয়াদা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করত, ডন-কুস্তি মুগুর ভাঁজতো, সিদ্ধি ঘুঁটতো, ভাঙ খেতো আর ডাল-রুটি ভোজন করত। একজন অপরজনকে 'জয় সীয়ারাম' বলে সম্বোধন করত। এইভাবেই গাঙ্গুলীবাড়ির সদর দেউরিতে এই ভৃত্যকুল তাদের অস্তিত্ব জাহির করত। যেমন বিশ্বাসী তেমনি প্রভুভক্তি-পরায়ণ এই ভৃত্যদের অনেককেই আমরা শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাই। গৌরী সিং ছিল তখন এই বাড়ির প্রধান দারোয়ান।

বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি নধরকান্তি নিমগাছ। শাখায়-প্রশাখায় প্রকাণ্ড গাছ। সাধারণতঃ অত বড় নিমগাছ দেখা যায় না। তারই নীচে দারোয়ানদের রান্নাঘর। তার পাশেই গোয়ালঘর; অনেকগুলি হৃষ্টপুষ্ট গরু-বাছুর সেখানে; তারা প্রচুর পরিমাণে দুধ দিত। এদের পরিচর্যার জন্য কয়েকটি হিন্দুস্থানী চাকর ছিল। দেবানন্দপুরে মতিলালের একটি গরু ছিল; নাম—বুধী। এই বুধী বালক শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিল। সকালের দিকে গঙ্গার তীরবর্তী গোচারণের মাঠে যখন গরুগুলিকে নিয়ে যাওয়া হতো তখন রাস্তায় সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আর বলত, গাঙ্গুলীবাড়ির গরু।

রাস্তার পূর্বদিকে বেড়াবাঁধা একটি গেট-দেওয়া বাগান। টগর, চাঁপা, মল্লিকা, রজনীগন্ধা, চামেলী প্রভৃতি কত রংবেরং-এর ফুলের গাছ সেই বাগানের শোভা বর্ধন করত। তখনকার দিনে যা দুর্লভ সেই গোলাপ গাছও ছিল কয়েকটি, বাগানের একধারে বাঁধানো একটি তুলসীমঞ্চ। বাগান পরিচর্যার জন্য দেশ থেকে আনা তিন-চারটি মালী ছিল। কথিত আছে, এইসব ফুলগাছের বেশির ভাগই রামধন হালিসহর থেকে আনিয়েছিলেন। এই বাগানে গৃহকর্ত্রী গোবিন্দমণি নিত্য স্বহস্তে সাজিভরে ফুল তুলতেন। দোতলায় ছিল তাঁর ছোট্ট ঠাকুরঘর। শেষ বয়সে পূজা-অর্চনাতেই তাঁর অধিকাংশ সময় কেটে যেত। পুত্রবধূরাই গৃহকর্ম দেখতেন। সর্বক্ষণ ধূপের ধোঁয়া আর

ফুল-চন্দনে আমোদিত সেই ঠাকুরঘরে বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিড় লাগত সন্ধ্যায় হরিরলুটের সময়। হরিরলুটের বাতাসা পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে যেন রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এই বাগান, এই ঠাকুরঘর—সবই শরৎ-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। (বাস্তবকে কল্পনার জারক রসে জারিত করেই তো সার্থক তাঁর অনুপম সাহিত্য-সৃষ্টি।)

দারোয়ানদের মহল পার হলেই একটা বড় দরজা। সেই দরজাটি অতিক্রম করে ভেতরে গেলে কর্তাদের বৈঠকখানা বাড়ি। তারপরেই দক্ষিণমুখো একটি প্রকাণ্ড আটচালা বাংলা। সামনে গোল থাম দেওয়া। এটা বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ। এ বাড়ির পূজা-পার্বণ সবই অনুষ্ঠিত হতো সাত্ত্বিকভাবে। পুরোহিত আসতেন ভাটপাড়া থেকে। বাইনাচ, যাত্রা, থিয়েটার এসবের বালাই ছিল না, কারণ এদিক দিয়ে কর্তারা ছিলেন খুবই কড়া। চণ্ডীমণ্ডপের সংলগ্ন ভোগের ঘর; এর পাশ দিয়ে বাঁ-হাতি গিয়ে গলির দোর পার হলেই অন্দর-মহল। এই মহলের রান্নাঘরটি মাটির, বাকী সব ঘরই পাকা। রান্না-ঘরের পিছন দিয়ে খিড়কির দরজা। পুরমহিলারা সেই দরজা দিয়ে যেতেন গঙ্গাস্নানে।

খিড়কির সংলগ্ন একটা বাগান ছিল।

লোকে বলত—শ্যামবাবুর বাগান।

অরক্ষিত পোড়ো বাগান।

বাড়ির ছেলেদের দৌরাত্ম্যের লীলাভূমি।

এই বাগানে ছেলেদের সর্দারি করতেন কিশোর শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র যখন মাতুলালয়ে আসেন তখন এ বাড়ির কর্তা ছিলেন তাঁর মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথ। খুব রাশভারি মানুষ। তাঁর ব্যাঘ্র-গর্জনে ছেলেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের পিতা ও অঘোরনাথ দুজনে দুজনের সতীর্থ ও সমবয়সী ছিলেন। কঠিন সত্যবাদী মানুষ ছিলেন অঘোরনাথ। ভিতরে-

বাইরে একরকম প্রকৃতি তাঁর। এই চরিত্রটিকেও শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন।[১]

গাঙ্গুলী-পরিবারের কথা এতখানি বললাম এইজন্য যে, শরৎ-চন্দ্রের জীবনের কৈশোর ও প্রাক্-যৌবনের অনেকগুলি বছর তাঁর মাতুলালয়েই অতিবাহিত হয়েছিল এবং তখন যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তার যথেষ্ট প্রতিফলন আছে তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে। তিনি নিজেই বলতেন যে, তাঁর বর্ণিত বহু পুরুষ ও নারী-চরিত্রের বাস্তব উপকরণ তিনি এই পরিবার থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরে সেগুলি তাঁরই অসামান্য কল্পনার স্পর্শে তাঁর সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। বড় বড় লেখকদের ক্ষেত্রে এমনই হয়ে থাকে। কাঁঠালপাড়ার চাটুজ্যে বাড়ির পরিবেশ, সেই বাড়ির সংলগ্ন পুষ্করিণী ও বাগান বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি জোড়াসাঁকোর বিশাল ঠাকুরবাড়িতে শৈশবাবধি রবীন্দ্রনাথের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল তারও প্রতিফলন আছে তাঁর কাব্যে ও গল্প-উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—এঁরা তিনজনেই ছিলেন প্রখর বাস্তববোধসম্পন্ন ও কল্পনা-কুশল লেখক। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের পরিধিটা ছিল আরো বিশাল—দেবানন্দপুর, ভাগলপুর, মজঃফরপুর ও রেঙ্গুন—এই চার মুল্লুক জুড়ে হলো তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি। শরৎচন্দ্রের জীবনকে এই চারটি স্থানের পটভূমিকাতেই দেখতে হবে, বুঝতে হবে, নতুবা আমরা তাঁর জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারব না। অথবা পারব না তাঁর প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করতে।

১. গাঙ্গুলীবাড়ির বর্ণনা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। ইনি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল হতেন।

॥ ছয় ॥

—ন্যাড়ার দুরন্তপনায় তো অস্থির হয়ে উঠলাম।

শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার নাম ছিল ন্যাড়া।

আট-দশ বছর বয়সে তাঁর চেহারার দিক দিয়ে চোখ দুটি ছাড়া আর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। গায়ের রং কালোর দিকেই; ফর্সা কি শ্যামবর্ণ নয়। দেহটিও মোটাসোটা, গ্যাঁটাগোটা নয়; বরং রোগা, পাকাটো পা-দুখানা হরিণের মত সরু, দৌড়তে মজবুত। হাত-পায়ের সাহায্যে গাছে চড়তে কাঠবিড়ালীর মতই ক্ষিপ্র।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জৌলুস চারদিক দিয়ে যেন উপচে পড়ছে।

কিন্তু সে বুদ্ধি তার দুষ্টুমির পথেই চলে।

ঐটুকু তো বয়স, তবু তাকে এঁটে ওঠা শক্ত; এবং সে ব্যবস্থা যে-ই করুক না কেন, ন্যাড়াচন্দ্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেনই। বাল্যকালে ন্যাড়ার দুরন্তপনায় গ্রামের লোক সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। প্যারী পণ্ডিতমশাই পর্যন্ত তাঁর এই ছাত্রটির নষ্টামি বুদ্ধির পরিচয় পেলেন একদিন যেদিন তিনি হুঁকো টানতে গিয়ে দেখেন কলকে থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না কিছুতেই। পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের একটা কাজ ছিল গুরুমশাইয়ের জন্য রোজ পালা করে তামাক সেজে দেওয়া। সেদিন ছিল ন্যাড়ার পালা। সে করেছিল কি কলকের মধ্যে তামাকের বদলে শক্ত শক্ত মাটির টুকরো ভরে দিয়েছিল।

—কই রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কৈ?

পড়ুয়ারা-সব তখন এ ওর মুখপানে তাকায় আর ঠোঁট চেপে হাসাহাসি করছে। —এ নিশ্চয়ই ন্যাড়ার কাণ্ড; কোথায় গেল হতভাগাটা? বালক শরৎচন্দ্র ততক্ষণে পাঠশালার চৌহদ্দি থেকে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছেন।

একদিন পাশের বাড়ির মুখুজ্যে-গিন্নী এসে ভুবনমোহিনীকে নালিশ করলেন ন্যাড়ার বিরুদ্ধে। তাঁদের বাগানে শসা ফলেছে প্রচুর। একটিও তোলা হয় নি। সামনের পূর্ণিমাতে নারায়ণকে

ভোগ দিয়ে তবে সেই শসা খাওয়া হবে। গ্রামের প্রথাই ছিল এইরকম। কারো বাড়ির বাগানে কোন ফলমূল হলে, আগে সেটা ঠাকুরকে নিবেদন করে পরে খেতে হয়। এখন হয়েছে কি সেদিন পাঠশালা যাবার পথে মুখুজ্যে বাড়ির ঐ নধর কচি কচি শসার দিকে ন্যাড়ার লুব্ধ দৃষ্টি হঠাৎ নিবদ্ধ হয়ে যায়।

—জ্যাঠাইমা, দুটো শসা দেবেন ?

—বলিস কি রে ন্যাড়া ? এখনো ঠাকুর-দেবতাকে নিবেদন করা হয় নি।

ন্যাড়া আর দ্বিরুক্তি করে নি। সেইদিন রাত্রেই তার দলবল নিয়ে সে অভিযান করল মুখুজ্যেদের ঐ শসাক্ষেতের ওপর। পাঁচ মিনিটেই সব সাফ—এবং এমন চুপিসারে কাজটি সমাধা হয়ে গেল যে পরের দিন সকাল হবার আগে এই নষ্টামির কথা ওবাড়ির কেউ জানতেই পারে নি। সকালে বাগানে পূজোর ফুল তুলতে গিয়ে মুখুজ্যে-গিন্নী শসাশূন্য ক্ষেত দেখে হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে থাকেন আর বলেন, এ নিশ্চয়ই ঐ ন্যাড়া হতচ্ছাড়ার কাণ্ড। একটু বেলা হলে তিনি ভুবনমোহিনীর কাছে এসে নালিশ করলেন। এমনি ধরনের নালিশ তো তাঁকে প্রায়ই শুনতে হতো।

ছেলেকে কিছু বললেন না।

সন্ধ্যার পর মতিলাল গৃহে ফিরতেই তিনি স্বামীর কাছে এসে অনুযোগের সুরে বলেন : ন্যাড়ার দুরন্তপনায় তো অস্থির হয়ে উঠলাম।

তারপর সবিস্তারে তার শসা চুরির কাহিনীটা বর্ণনা করলেন। মতিলাল অনুযোগ শুনলেন বটে, কিন্তু হাঁ-হুঁ কিচ্ছুই করলেন না তিনি। স্বামীর এই নিস্পৃহ ভাব দেখে তিনি আর একটু চড়া সুরে বললেন, আদর দিলে বাঁদর হয় জানো তো। এখন থেকে যদি একটু রাশ টেনে না ধরো, একটু-আধটু শাসন না করো, তাহলে ও-ছেলের আর কিছুই হবে না।

তুলসীতলায় তখন মতিলালের মা প্রদীপ দিচ্ছিলেন।

তাঁর কানে পুত্রবধূর শেষের কথাগুলো যখন এলো তখন তিনি দাওয়ার কাছে এসে ভুবনমোহিনীকে উদ্দেশ করে বললেন, এ কি কথা বলছ তুমি বৌমা! সন্ধ্যেবেলায় অমন অলক্ষ্ণে কথা বলতে নেই। আমি বলছি ন্যাড়ার মতিগতি ফিরবে একদিন যখন ও আর একটু বড় হবে। বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, এ আমি তোমায় বলে রাখলাম।

বধূ অবগুণ্ঠন টেনে সেখান থেকে নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মতিলাল কাগজ-কলম নিয়ে গল্প লেখায় মনোনিবেশ করতে থাকেন। দেবানন্দপুরে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নামল—মুহূর্ত মধ্যে গাছপালা, মাঠঘাট সবকিছু সন্ধ্যার অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। ন্যাড়া কিন্তু তখনো বাড়ি ফেরে নি। আমরা পরে দেখতে পাব, তার পিতামহীর এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর এই দুরন্ত চপল নাতিটির জীবনে কি রকম আশ্চর্যভাবেই না সফল হয়েছিল, কিভাবে তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসেবে বাঙালী পাঠকের চিত্ত জয় করেছিলেন আর কেমন করেই বা এই ছন্নছাড়া, গৃহহারা মানুষটি আপন প্রতিভা-বলে আরোহণ করেছিলেন অপরিমিত খ্যাতির সুউচ্চ শিখরে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে তা একটি স্বর্ণপ্রভ অধ্যায় বললেই হয়।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের দুরন্তপনার অনেক কাহিনী আছে। তাঁকে বকলে বা শাসন করলে কারো বাগানে কলা লাউ কুমড়ো কিছুই থাকত না। এই দুরন্ত অষ্টম বর্ষীয় বালক তার দলবল নিয়ে সব নিঃশেষে উজাড় করে তছনছ করবে। বাড়িতে তাকে বশে আনতে পারতেন একমাত্র তার ঠাকুরমা। আর এই বশে আনবার একটা ওষুধই ছিল। মহাভারত পড়ে শোনানো। ঠাকুরমা যখন মহাভারত পড়েন, তখন এই দুরন্ত বালক নিবিষ্টমনে তা শুনত, কোথায় চলে যেত তার দুরন্তপনা।

একদিন। শীতের সকাল।

একতলার বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে ঠাকুরমা মহাভারত পড়ছেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, চক্রভেদ। ন্যাড়া একমনে শুনছে। জলের মধ্যে শূন্যে ঘূর্ণায়মান চক্রের ছায়া দেখে বাণ ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করা—কি আশ্চর্য কাণ্ড!

—অর্জুন কেমন করে এটা পারলে?

—অর্জুন সব পারে। তাইতো তার নাম সব্যসাচী।

—সব্যসাচী মানে কি?

—যে দুহাত দিয়ে তীর ছুঁড়তে পারে—যার হাতের নিশানা অব্যর্থ।

—তাহলে আমিও সব্যসাচী।

একটা তীর-ধনুক বানিয়েছিল বাখারি চেঁছে ন্যাড়া; তাতেই দুহাতে বাণ ছোঁড়ে। তারো হাতের নিশানা ছিল অব্যর্থ। কিন্তু সেদিন ঠাকুরমার মুখে মহাভারত শুনতে শুনতে ঐ 'সব্যসাচী' শব্দটা যেন বালকের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। দু'দিন বাদে আবার সে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ ঠাকুরমা, সব্যসাচী কথাটার মানে তুমি কি বলেছিলে যেন। ঠাকুরমা আবার কথাটার মানে বুঝিয়ে দেন। তাহলে আমিও সব্যসাচী হব মনে মনে বলেন তিনি। সব্যসাচীকে শরৎচন্দ্র বিস্মৃত হন নি। পরিণত বয়সে তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস 'পথের দাবী'র নায়কের নাম তিনি দিয়েছিলেন সব্যসাচী। এমনি প্রখর ছিল শরৎচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি।

আর একদিন।

সেদিন ঘরে চাল বাড়ন্ত।

চালের খোঁজে গিয়ে মতিলাল কোথাও না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। ক্লান্তিতে তিনি দাওয়ায় বসে পড়েন। ছেলের মুখ দেখে ন্যাড়ার ঠাকুরমা অনুমান করেন, আজ কিছু যোগাড় হয় নি। তিনি ছেলেকে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। এমন সময় বাড়ির মুসলমান চাকর আকবর কোথা থেকে সেরখানিক চাল গামছায় বেঁধে এনে দাওয়ায় রাখে।

—এমনভাবে আর ক'দিন চলবে মা। বুধীকে বিক্রী করে দিই।

—সর্বনাশ ! এ-কথা শুনলে ন্যাড়া অনর্থ বাধাবে।

—তবে—

মতিলালের কথা শেষ হওয়ার আগে দ্বারান্তরাল থেকে ঈষৎ অনুচ্চ কণ্ঠে ভুবনমোহিনী বলেন, একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখ।

—এখানে, এই পাড়াগাঁয়ে চাকরি কোথায় জুটবে, বড়বৌ ?

—এখানে জুটবে না, জানি। ভাগলপুরে জুটবে।

ইতিমধ্যে একদিন ভাগলপুর থেকে কেদারনাথের চিঠি এলো। তিনি তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তার কিছুদিন বাদেই তাঁর মেজভাই দীননাথ মারা গেলেন আর ন'ভাই অমরনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগশয্যায় শায়িত অমরনাথ একবার ভুবনমোহিনীকে দেখতে চাইলেন। মেয়েকে আনতে দেবানন্দপুরে এলেন কেদারনাথ।

'মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে কেদারনাথ স্বচক্ষে দেখলেন ভুবনমোহিনীর দুরবস্থা। চোখে তাঁর জল বাধা মানে না। অথচ মতিলালবাবু সেইরূপই নির্বিকার। তিনি শিশুদের সঙ্গে মিশে, শিশুর মত খেলা করেন। অবসর সময়ে বই নিয়ে বসেন—কখনও বা কাগজ-কলম নিয়ে গল্প বা কবিতা লিখতে বসেন কিন্তু শেষ করার ধৈর্য তার থাকে না। সকল লেখাগুলোই অসমাপ্ত রয়ে যায়।

'আর ভুবনমোহিনী এপাড়া ওপাড়া থেকে শাকসব্জি সংগ্রহ করে কোনরকমে স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। বাকী সময়টুকু ছেলেমেয়েদের নিয়েই তাঁর কেটে যায়। সন্ধ্যায় কাটেন পৈতের সুতো, কখনও বা বোনেন আসন। ভুবনমোহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তার কিছুদিন পরেই অমরনাথ গেলেন মারা। কেদারনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঠিক সেই সময়ে ডিহিরিতে মতিলাল একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। সপরিবারে তিনি যাত্রা করলেন ডিহিরিতে কিন্তু সে চাকরি তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হলো না। পুনরায় ফিরে এলেন ভাগলপুরে।'[১]

আবার শুরু হয় পরাশ্রিত জীবন।

১. শরৎ-পরিচয় : সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আগের মতই সেই শাসন ও নিয়মের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি মতিলালের কাছে যে খুব আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল তা নয়, সেখানে যে তাঁর অনাদর হতো তা নয়, তবু চির-স্বাধীন তাঁর প্রকৃতি নানারকম ব্যবস্থা কণ্টকিত এই পরিবেশের সঙ্গে যেন কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারত না। শ্বশুরবাড়ি তাই তাঁর কাছে মনে হতো কারাগার। তবু এই কারাগারের মধ্যেই তাঁকে থাকতে হয়। কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। দেবানন্দপুরে তাঁর মত নিরোজগার স্বামীকে নিয়ে ভুবনমোহিনী ছেলেমেয়েদের মানুষ করবেন কেমন করে, তাদের মুখে দুটো ভাত তুলে দেওয়া তো দূরের কথা!

ভাগলপুরে মাতুলালয়ে আরম্ভ হয় শরৎচন্দ্রের নূতন জীবন।

একেবারে রাশহীন, বল্গাহীন না হলেও নানা রকম দুষ্টুমি আর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর তখনকার জীবন। সঙ্গীসাথীরও অভাব ছিল না। মামার বাড়িতেই কি তাঁর সমবয়সী ছেলের সংখ্যা কম? তাদের সর্দার হয়ে উঠতে তাঁর দেরি হলো না। তিনি হলেন তাদের 'নূতনদা'। নূতনদা'র মধ্যে তারা এমন একটা আকর্ষণী শক্তি অনুভব করত যে সবসময় তারা চাইত তাঁর সঙ্গে থাকতে, তাঁকে খুশি করতে আর তাঁর দুষ্টুমির অংশগ্রহণ করতে। এই দুষ্টুমির দুই-একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিই।

এ বাড়ির একটা নিয়ম ছিল ছোট বয়সের ছেলেমেয়েরা বিনা অনুমতিতে বাইরে কোথাও যাবে না। গেলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মামার বাড়ি এসে এই নিয়মের কথাটা শুনলেন তিনি। তাঁর মা নিজেই ছেলেকে এ বিষয়ে সচেতন করে দিয়ে বলেন, বাবা যা পছন্দ করেন না, এমন কাজ যেন কখ্‌খনো করিস নে। মায়ের কথা কানে গেল, ব্যস ঐ পর্যন্ত, মনের মধ্যে পৌঁছল কিনা ভুবনমোহিনী তার সন্ধান নিলেন না।

—বাড়ির বাইরে গেলে কি হয় নূতনদা?

—কিছুই হয় না—বরং লাভ হয়। দুচোখ মেলে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখা যায় আর প্রাণভরে জলে অথবা গাছে দৌড়-ঝাঁপ করা যায়। তাছাড়া দেখার সঙ্গে অনেক কিছু শেখাও যায়, বুঝলি ?

—তা যেন বুঝলাম, কিন্তু—

—তোদের ঐ কিন্তু-কিন্তু ভাবটা ছাড় তো। ওতেই তো তোরা সব পঙ্গু হয়ে আছিস এই চার-দেয়ালের মধ্যে। নিষেধের গণ্ডি ভাঙার আনন্দ যে কত তা তোরা জানিস না। চল্ না, আজ নদীর ঘাটে একটু ঘুরে আসি।

বকুনির ভয় অগ্রাহ্য করে ছেলের দল নিঃশব্দে খিড়কি-পথে বেরিয়ে পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে। মুক্ত আকাশের তলায় এসে তাদের কি আনন্দ! কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে নদী। নদীর বুকে মৃদু স্রোত, কত লোকজন সেখানে। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল গঙ্গার ধারে একটা বিরাট অশ্বত্থগাছ। গাছের ডালে উঠে একটু ঝুললে কেমন হয়! ডালে চড়ে শুরু হয় তাদের খেলা। তারপর যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেলের দল গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ির সদর দেউড়িতে ঢুকবে এমন সময় শোনা যায় কেদারনাথের হুঙ্কার—কোথায় ছিলি এতক্ষণ হতচ্ছাড়ার দল ?

কেউ সাহস করে জবাব দেয় না।

শরৎচন্দ্র এগিয়ে এসে বলেন, গঙ্গার ধারে।

—সেখানে কি হচ্ছিল, শুনি।

—বেড়াচ্ছিলাম, দৌড়-ঝাঁপ করছিলাম।

—আমার হুকুম ছাড়া আর কোনদিন যাবি না। যা, এখন পড়তে বস্ সবাই।

তারপর মেয়েকে কাছে ডেকে কেদারনাথ বলেন, কি সৃষ্টিছাড়া ছেলে তোর ভুবন। ওকে একটু শাসন করিস, নইলে এর পরে কি আর বাগ মানবে।

ভুবনমোহিনী তাঁর ছেলের এইরকম আচরণে মনে মনে খুবই ব্যথা পেতেন, লজ্জাও বোধ করতেন। শ্বশুরবাড়িতে যা শোভা পেত,

এখানে বাপের বাড়িতে ছেলের এই দুষ্টুমি যে আদৌ শোভা পায় না, সে কথা শরৎচন্দ্রকে তিনি কতবার বুঝিয়েছেন। আজো সস্নেহে ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, আমার কথা কেন শুনিস নে বল্ তো? কেন এইরকম দুষ্টুমি করিস। এতে আমার যে মাথা কাটা যায়।

আর একদিন।

বাড়ির গোয়ালঘরের কাছে একটা বারোমেসে পেয়ারা গাছ ছিল। কাশীর পেয়ারা। গাছভর্তি কাঁচা-পাকা কত পেয়ারা। এই গাছটার ওপর ছেলেদের ছিল লুব্ধ দৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের তো কথাই নেই। গাছের প্রত্যেকটি ডালের পেয়ারা হিসেব করা থাকত। একদিন চাকর এসে কর্তাকে খবর দিল, গাছের তিনটে ডাল শূন্য—একটা পেয়ারাও নেই সেখানে।

এ নিশ্চয়ই শরতের কাণ্ড, অনুমান করলেন কেদারনাথ।

পরে জানা গেল পেয়ারাগাছের ওপর দস্যুবৃত্তিটা নির্ঝঞ্ঝাটে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র রাত্রির অন্ধকারে তাঁর কয়েকজন নির্বাচিত সঙ্গী নিয়ে পেয়ারা গাছে উঠে ঐ লোভনীয় ফলগুলি সংগ্রহ করতে থাকেন। সবাই তো তাঁর মত ডানপিটে আর ওস্তাদ নয়। তার ফলে যা হবার তাই হলো। দু'চারজন গাছের ডাল থেকে পা ফসকে মাটিতে পড়ে গিয়ে অল্পবিস্তর জখম হলো। শরৎচন্দ্রই আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন—ক্ষতস্থানে দিলেন চিবানো দুর্বাঘাস। দেবানন্দপুরে থাকতে তিনি এই বিদ্যা শিখেছিলেন।

রান্নাঘরের পেছন দিকের সেই পোড়ো বাগান—শ্যামবাবুর বাগানটি শরৎচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের খেলার জায়গা হয়ে উঠেছিল। বাড়ির ছোট কর্তাকে সরকারী কাজে প্রায়ই সফরে যেতে হতো। সফরের তল্পীতল্পা বইবার জন্য ছিল দুটি টাট্টু ঘোড়া। এই বাগানের একধারে তাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল আর তাদের তদারকী করার ভার ছিল একটা বাচ্চা চাকরের ওপর। তাকে হাত করে শরৎচন্দ্র ঘোড়ায় চড়তে শুরু করেন ও তার পিঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের নানা

রকম কসরত দেখিয়ে বাহবা নিতেন। বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল একটা বিরাট মাটকোঠা। তার ওপরে ওঠার জন্য একটা সিঁড়ি ছিল। ইঁটের তৈরী। আট-দশ হাত উঁচু। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিপথে একদিন পড়ল সেটি। লাফ দিয়ে পড়বার সুন্দর জায়গা। একদিন বিকেলে সঙ্গীদের সেখানে ডেকে নিয়ে এলেন। বললেন, দেখবি একটা খেলা। ঐ উঁচু থেকে নীচে কেমন করে লাফ দিতে হয়।

—বলো কি নূতনদা, পা ভেঙে যাবে।,

—দূর বোকা! লাফ দেবার কায়দা আছে। পায়ে স্প্রিং দিয়ে লাফ দিতে হয়।

এই বলে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন এবং অবলীলাক্রমে নীচে লাফ দিয়ে পড়লেন। পায়ে এতটুকু চোট লাগল না তাঁর। সবাই চেয়ে বিস্মিত হয়। সঙ্গীদের কসরতটা শিখিয়ে দিলেন।

কিন্তু এইরকম ডানপিটেমি করে দিন কাটালে ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভুবনমোহিনী বাবাকে বলেন, ন্যাড়া যদি লেখাপড়া না শেখে তাহলে কি হবে আমাদের। দেবানন্দপুরে বনে-জঙ্গলে ঘুরেছে, সঙ্গীদের নিয়ে হৈচৈ করেছে। বোধোদয় বা চারুপাঠের বেশি বিদ্যে আর এগুল না। বয়সটা তো কম হলো না। ওর বয়সী ছেলেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করেছে।

মেয়ের আবেদন নিষ্ফল হলো না।

দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন শরৎচন্দ্র। দৌহিত্রের জন্য একজন গৃহশিক্ষকও নিযুক্ত হলো। যথাসময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাস করে শরৎচন্দ্র মায়ের প্রশংসাভাজন হলেন। ঐ বয়সেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সঙ্গেও পরিচিত হলেন বাড়ির ছোটগিন্নী কুসুমকামিনীর দৌলতে। গাঙ্গুলী-পরিবারে ইনিই ছিলেন শিক্ষিতা। 'প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী ও বঙ্গদর্শন' নিয়ে বসতেন। বাড়ির ছোট-বড় ছেলেমেয়ের দল তাঁর পাশে বসে সেই পাঠ শুনতো একমনে। তাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রই ছিলেন প্রধান শ্রোতা।'

ঠিক এই সময়ে গাঙ্গুলী-পরিবারে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে যায়। তার ফলে মতিলালকে আবার সপরিবারে দেবানন্দপুরে চলে আসতে হয়। তখন শরৎচন্দ্রকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হলো। এদিকে ছেলের পৈতা দেবার বয়স পার হয়ে যায় দেখে ভুবনমোহিনী কোনরকমে ছেলের পৈতা দিলেন। এই সময়েই তাঁদের বাস্তুভিটা বন্ধক পড়ে। এখানকার স্কুলে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত একটানা লেখাপড়া করেছিলেন। আবার এইখানে তিনি দাবাখেলা, বাঁশী ও বেহালা বাজাতে শিখেছিলেন। গানও গাইতে পারতেন বেশ। গাইয়ে ও বাজিয়ে বলে সুনামও হলো একটু। এই সময়ে তিনি কিছুদিনের জন্য একটা যাত্রাদলে ভিড়ে গিয়েছিলেন। পরে মতিলাল ছেলেকে ধরে নিয়ে আসেন। এমনি করে শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রথম ষোলটা বছর অতিক্রান্ত হলো।

আবার মতিলাল সপরিবারে এলেন ভাগলপুরে।

এখানকার জুবিলী স্কুলে তিনি ভর্তি হলেন প্রথম শ্রেণীতে। এণ্ট্রান্স পাস করে ভর্তি হলেন জুবিলী কলেজে এফ. এ. ক্লাশে।

১৮৯৫ সালটি তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে মায়ের মৃত্যুর জন্য। উনিশ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র মাতৃহীন হন। সেই বয়সে অমন স্নেহময়ী মাকে হারিয়ে তিনি অন্তরে যে বেদনা আর হৃদয়ে যে শূন্যতা বোধ করেন তাঁর স্মৃতি থেকে কোনদিনই মুছে যায় নি। তাঁর সৃষ্ট একাধিক মহিয়সী নারী-চরিত্রের মধ্যে তিনি তাঁর মাকে স্মরণ করেছেন। ভুবনমোহিনীর জীবন ও চরিত্রই যে তাঁর এই জাতীয় সৃষ্টির অন্যতম উৎস ছিল—আমাদের এমন অনুমান অসঙ্গত নাও হতে পারে। তাই শরৎ-সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছেন বিশ্বেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, নারায়ণী প্রভৃতি মাতৃমূর্তি। বাংলা কথা-সাহিত্যে অমন সুন্দর মূর্তি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কারো লেখনীমুখে ফুটে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথও অল্প বয়সে মাতৃহীন হয়েছিলেন।

ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর বৎসরেই মতিলাল দেবানন্দপুরের বাড়ি বিক্রী করেন। শরৎচন্দ্র শুধু মাতৃহীন হলেন না, গৃহহীনও হলেন। এখানে উল্লেখ্য যে একটি কন্যাসন্তান প্রসবের পর ভুবনমোহিনী মারা গিয়েছিলেন। সেই মা-হারা মেয়েটিকে মানুষ করার জন্য মোতিয়া বলে একটা অল্প বয়সের হিন্দুস্থানী মেয়েকে রাখা হয়েছিল ; তারই স্তন্যপান করে শিশুটির জীবন রক্ষা হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মতিলাল শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে ভাগলপুরের অদূরে খঞ্জরপুরে একটা দোকানের পেছনে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে এলেন। সঙ্গে তিন ছেলে—শরৎ, প্রভাস ও প্রকাশ আর চার মাসের একটি মেয়ে। প্রভাস স্কুলে পড়ে ছোটটি তখনও ছেলেমানুষ। মোতিয়ার সঙ্গে একদিন শরৎচন্দ্রের বিবাদ বেধে গেল। মোতিয়া তাঁর ছোট ভাইকে শাসন করতে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের এটা পছন্দ হয় নি। তিনিও দুটো-চারটে কড়া কথা মোতিয়াকে শুনিয়ে দিলেন এবং বাবার কাছে এসে পরিচারিকার আচরণের প্রতিবাদ জানালেন।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই পিতা-পুত্রের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ হয়েছিল। তখন থেকেই ভাই-বোনদের মানুষ করার জন্য শরৎচন্দ্র চাকরি খুঁজতে থাকেন। কলেজের পড়া বন্ধ হলো। লেখাপড়ায় ছেদ পড়ার প্রধান কারণ ছিল দারিদ্র্য—এ-কথা শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন। পিতার খামখেয়ালী ভাবও এর জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। ভাগলপুরে থাকতেই শরৎচন্দ্রের জীবনে বহুপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ হয় আর তা-ই ছিল তাঁর উত্তরকালের সাহিত্য-জীবনের পুঁজি। তাঁর জীবন তখন সদ্য বিকাশোন্মুখ ; সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি ঐরকম একজন লেখক হবার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তাঁর বাবার লেখাগুলোও বার বার পড়ে তাঁর মনে লেখক হবার সাধ জেগে থাকবে। দেবানন্দপুরে থাকতেই তো তিনি এই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছিলেন।

ভাগলপুরেই লেখার কাজে হাত মক্‌শ শুরু হয়।

হাতে-লেখা পত্রিকা—নাম 'ছায়া'।

এই 'ছায়া'র বুকেই শরৎপ্রতিভার ছায়াপাত ঘটেছিল।

'যখন বঙ্গসাহিত্যাকাশ আমাদের সাহিত্যরবির আলোকে উদ্ভাসিত, তখন বাংলার বাহিরের একটা অনতিখ্যাত শহরের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষুদ্রতম সাহিত্যসভার মধ্যে যে আমরা একটি পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে দেখিয়াছিলাম এ গৌরব করিতে পারি। মনে পড়ে একদিন আমাদের সেই খেলাঘরের সাহিত্যসভায় যুবক শরৎচন্দ্রের একটা রচনা লইয়া ঘোর তর্ক করিতে প্রায় হাতাহাতির যোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম—বঙ্কিমের চাইতেও শরৎদার লেখা ভাল।

'শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে পড়েন। আমি তখন স্কুলের ছাত্র এবং মাস্টার পণ্ডিতদের বিশেষতঃ দাদাদের গম্ভীর তত্ত্বাবধানের মধ্যে শাসিত ও পালিত। আমরা দুইটি ভাই-ভগ্নী প্রাক্-রবীন্দ্রী কবিগণের লেখার ভাঙাচোরাই হউক আর অনুকরণই হউক একটা কিছু করিতাম। ......আমরা সে সময় যে পাড়ায় থাকিতাম তাহার নাম খঞ্জরপুর। শরৎদা একদিন হঠাৎ প্রস্তাব করিলেন যে যখন আমরা এতগুলি কুঁড়ি-সাহিত্যিক ফুটি ফুটি করিতেছি তখন একটা কাজ করা যাক। একটা হাতের লেখা কাগজ বাহির করা যাক। যে মুহূর্তে বলা সেই মুহূর্তেই কার্যারম্ভ। এই মাসিক পত্রখানা আমাদের কুঁড়ি-সাহিত্যিকদের সভার মুখপত্র হইল। লেখক অনেকগুলি এবং লেখিকা মাত্র একটি—তিনি আর কেহ নয়, আমার অন্তঃপুরচারিণী বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী নিরুপমা। মাসিক পত্রখানির নামকরণ হইয়াছিল 'ছায়া'।[১]

এই 'ছায়া'র বুকেই ভাবীকালের শরৎচন্দ্রের ছায়াপাত হয়েছিল।

১. শরৎদা: বিভূতিভূষণ ভট্ট। নিরুপমা দেবী এর ভগ্নী। এঁদের পিতা ভাগলপুরের সাবজজ ছিলেন। এঁরা দুজনেই বাংলা সাহিত্যে লেখক ও লেখিকা হিসেবে কিছু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে নিরুপমা দেবী লিখেছেন ঃ

'আমরা ভাগলপুরে থাকাকালীন তাঁহার প্রথম সাহিত্য-জীবনে শরৎচন্দ্রকে জানিতাম। আমার দাদারা তাঁহাকে অনেকদিন হইতে জানিতেন। কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমার লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। তিনি আমার লেখার পাঠক ও সমালোচক।...আমাদের পাড়া খঞ্জরপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন; এখানে মসজিদ ও যমানিয়া নদীতীর প্রভৃতি তাঁর বিচরণস্থান ছিল। দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি।

'আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোট্দা (বিভূতিভূষণ ভট্ট) তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে ঐসব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত।......তিনি ছোট্দাকে বলিয়াছিলেন যে, বুড়ী (নিরুপমা দেবীর ডাকনাম) যদি চেষ্টা করে তো গদ্যও লিখিতে পারিবে। ক্রমে আমরা শরৎদাদার 'বাসা', 'বাগান' প্রভৃতি কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই। বাগান—খাতায় বোঝা, কোরেল-গ্রাম, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, বড়দিদি প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প ছিল। ক্রমে তাঁহাদের সাহিত্যসভা ও ছায়ার কথাও জানিতে পারি। আমার লেখাও তাহাতে 'শ্রীমতী দেবী' নামে তাঁহারা দিতে লাগিলেন।...এইরূপে শরৎদাদা সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন এবং সাহিত্য সঙ্গীগুলির মধ্যে সমালোচনা-শক্তির বিকাশও আনিবার নানাবিধ পথনির্দেশ করিতেন।'[১]

মিসেস হেনরি উড ও মেরি করেলি—য়ুরোপে তখন এই দুজন মহিলা লেখিকার খুব নাম। মেরি করেলির *Sorrows of Satan* উপন্যাসখানিই লাখ লাখ কপি বিক্রী হয়েছিল। লিটনের *My*

১. আমাদের শরৎদাদা: নিরুপমা দেবী। এঁরই লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির' পাঠকসমাজে দুখুব সমাত হয়েছিল।

Novel বইটিরও তখন পাঠকমহলে খুব সমাদর। ডিকেন্সের উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তা বেশি ছিল। ভাগলপুরের 'আদমপুর ক্লাব' লাইব্রেরী থেকে এইসব বই শরৎচন্দ্র ঐ বয়সেই পড়ে শেষ করেছিলেন। তবে চার্লস ডিকেন্সই বোধ হয় তাঁর বেশি প্রিয় ছিলেন। 'ডেভিড কপারফিল্ড' বইটি হাতে করে তিনি এবাড়ি ওবাড়ি করে বেড়াতেন—দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে পড়তেন। বঙ্কিমের বইতো তাঁর ঐ সময় কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়। তাঁর বাগান-খাতার অনেকগুলি গল্পের ভাব ও ভাষা পর্যন্ত ছিল বঙ্কিমের ধাঁচের। এই ছিল ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন। ভাগলপুরে যে সাহিত্য-সভার তিনি দলপতি ছিলেন, তারই এক সভ্য একদিন পরিহাস করে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দাদা, আপনি কি বাংলা সাহিত্যের ডিকেন্স হবেন, না বঙ্কিমের শূন্য সিংহাসনের অধিকারী হবেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন : আমি শরৎচন্দ্রই হব আর সিংহাসনে যদি বসতেই হয়, তবে নিজের সিংহাসন নিজেই তৈরী করে নেব।

শরৎচন্দ্রের জীবনে দুটোই সত্য হয়েছিল।

॥ সাত ॥

ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পরে সংসারের অবস্থা সঙ্গীন হলে দায়িত্ব নিতে হয় শরৎচন্দ্রকে। তাঁহার পিতার উপার্জন তখন সামান্যই ছিল। চাকরি নিলেন বনেলি স্টেটে। তিনি নিজেই বলেছেন : 'আমি কিছুদিন বনেলি স্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগনায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চলছে। স্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্মচারী সেই কাজে স্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। ডাঙার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো। কখনো কখনো রাজকুমার আসতেন সেখানে।

সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে নাচ-গানের মজলিস দিতেন।'

চাকরির বাঁধন ভাল লাগে না।

তবুও তাঁকে সে কাজে লেগে থাকতে হয়।

নইলে সংসার যে অচল। ছোট ভাই-বোনেরা যে উপোস করে শুকিয়ে মরবে। বনেলি স্টেটে চাকরি করবার সময় তাঁর বহু এবং বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আছে শ্রীকান্ত উপন্যাসের বাইজী চরিত্রটির মধ্যে। পিতার চঞ্চল প্রকৃতি পুত্রের মধ্যেও অনেকখানি সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। বলা নেই কওয়া নেই একদিন শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে উধাও হলেন। অনেকে বলেন এর কারণ ছিল একটি প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার। বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ থাকে, এ-কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই অভিশাপই তাঁকে একদিন ভাগলপুর থেকে নিয়ে এলো মজঃফরপুরে। নাগা সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে গিয়ে তিনি চলে এলেন এখানে কাউকে কিছু না জানিয়ে। উঠলেন এসে একটা ধর্মশালায়। এইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় ঠিক তাঁরই মত ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, পরোপকারী এক নিঃস্বার্থ যুবকের সঙ্গে। যুবকটির নাম নিশানাথ। সুন্দর বেহালা বাজাতে পারতেন তিনি। একদিন গভীর রাতে তিনি যখন তাঁদের বাড়িতে বেহালা বাজাচ্ছিলেন শরৎচন্দ্র সেই সুরে আকৃষ্ট হলেন। ভাগলপুরে থাকতেই গান গাইতে ও বাঁশী বাজাতে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর গলার সুর ছিল যেমন মিষ্ট তেমনি মিহি। ও বাড়িতে বেহালা বাজছে, এখানে ধর্মশালার ছাদে উঠে তন্ময় হয়ে শুনছেন শরৎচন্দ্র।

পরের দিন দুজনের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হতে দেরি হলো না। সেই পরিচয় পরিণত হয় বন্ধুত্বে। নিশানাথ যখন জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে থাকবে কোথায়? ধর্মশালায় তো বেশিদিন থাকতে পারবে না। তখন শরৎচন্দ্র তাঁকে উত্তর দিলেন, কোথায় থাকব, সে চিন্তা করে তো ঘর ছাড়ি নি।

—তা যেন ছাড় নি, কিন্তু একটা আস্তানা তো চাই, পেটে দুটো ভাতও চাই। বাঁচতে হলে এ দুটো জিনিস দরকার।

—তুমি তো বেশ প্র্যাকটিক্যাল কথা বল দেখি।

—তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি তোমার প্রতিভা আছে।

সদ্য পরিচিত বন্ধুটির সহৃদয়তা শরৎচন্দ্রের হৃদয়কে স্পর্শ করল। পরে এই নিশানাথই তাঁর এক আত্মীয় ও অগ্রজস্থানীয় শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। শিখরনাথ অনুরূপা দেবীর স্বামী। তখন তিনি এখানে ওকালতি করতেন ও খুব পসার ছিল। নিশানাথ পরের দিনই সকালে শিখরনাথের কাছে এসে বললেন, দাদা, একটি ভবঘুরে ছেলেকে আশ্রয় দেবেন ?

—কি নাম ? কোথাকার ছেলে ? বয়স কত ?

—ভাগলপুরের গাঙ্গুলী বাড়ির ভাগ্নে—নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বয়স আমারই কাছাকাছি, কি আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট-বড় হতে পারে।

—শরৎচন্দ্র ! নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। আচ্ছা এ কি লিখতে-টিখতে পারে ?

—বিলক্ষণ। তার ওপর গান-বাজনাতেও ওস্তাদ। মধু-ঢালা কণ্ঠস্বর।

—তুমি ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো নিশানাথ।

অজানা-অচেনা জায়গায় আশ্রয় পেয়ে গেলেন গৃহত্যাগী শরৎচন্দ্র।

এই প্রসঙ্গে অনুরূপা দেবী লিখেছেন : 'মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তাঁর খুব সখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলিলেন, একটি বাঙালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়, অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলেই পরিচয় দিলেন ; কিন্তু তা নয়, লোকটা বাঙালীই। একদিন নিয়ে আসবো তাকে ? গান শুনবে ? তার খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে—তোমার এখানে রাখতে পারলে

ভালো হয়। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসিল। ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়ির অতিথিরূপে এইখানেই ছিলেন। কিজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতোই ছিল।'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কতাবার্তায় গৃহকর্তা শিখরনাথ বিশেষ তৃপ্তি বোধ করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরটি সত্যিই অপূর্ব। তখন থেকে প্রতি রবিবার তাঁর বৈঠকখানায় একটি গানের বৈঠক বসতে থাকে। ক্রমে স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেরাও সেই বৈঠকে যোগদান করতে থাকেন। বাঁশি বাজিয়ে, হারমোনিয়ম সহযোগে গান গেয়ে, অভিনয় করে একা শরৎচন্দ্র যেন মজঃফরপুরবাসী বাঙালীদের জীবনে নিয়ে এলেন এক নবীন প্রাণ-চাঞ্চল্য। অন্তঃপুরচারিণীরা পর্যন্ত এই নবাগত ও পরিচয়হীন যুবকটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। শরৎচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা ভাগলপুরে যেমন এখানেও তেমনি সকলকে মুগ্ধ, বিস্মিত করল। এছাড়া, 'অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যেও তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এইসব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটি স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।'

ভাগলপুরে থাকতে শরৎচন্দ্র শুধু যে বেপরোয়া ও খামখেয়ালী জীবনযাপন করেছিলেন অথবা সমবয়সী সঙ্গীসাথীদের নিয়ে নানা-রকম দৌরাত্ম্য বা দুষ্টুমি করে বেড়াতেন তা নয়, সেই একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে যে কয়টি আশ্চর্য গুণ পরিলক্ষিত হয়েছিল ঐ বয়সের ছেলেদের মধ্যে সচরাচর তা দেখা যায় না। তাঁর তখনকার সাহিত্য-চর্চার কথা ছেড়েই দিলাম—তিনখানি বৃহদায়তন 'বাগান'-খাতাই তো এর জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন বহন করতো। সাহিত্যচর্চা ভিন্ন ঐ বয়সে তাঁর অভিনয়-প্রতিভা কি রকম ছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন বিভূতিভূষণ ভট্ট: 'যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি —কত না নূতন নূতন রূপে শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াছি। মনে পড়ে ভাগল-পুরের আদমপুর ক্লাবের 'জনা'র অভিনয়। জনার ভূমিকায় অভিনয়ে

শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন পরবর্তীকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর অভিনয়ের মধ্যে তাহা দেখিলাম কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্রের অভিনয়ে যে গম্ভীর সংযত তেজস্বিতা ও শোকপ্রকাশের ভঙ্গী দেখিয়াছিলাম কলিকাতার সেই প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহা পাই নাই বলিয়াই স্মরণ হয়।' বিভূতি-বাবুর এই উক্তি যে আদৌ অত্যুক্তি নয়, এই গ্রন্থের লেখকও তার সাক্ষ্য দিতে পারেন। বাংলা থিয়েটারে যখন শরৎ-শিশির প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিল তখন নাট্যমন্দিরে 'রমা' ('পল্লীসমাজ'), 'ষোড়শী' ('দেনা-পাওনা') ও নব-নাট্যমন্দিরে 'বিজয়া' ('দত্তা') নাটক-গুলির রিহার্স্যালে সবিস্ময়ে দেখতাম নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষাপ্রদানের নৈপুণ্যের পাশাপাশি নাট্যকার শরৎচন্দ্রেরও অনুরূপ নৈপুণ্য। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল ছিলেন অনেকটা নিস্পৃহ ব্যক্তি, সংসার সম্বন্ধে উদাসীন এবং অর্থোপার্জনের প্রতি রীতিমত বীতশ্রদ্ধ। তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে দারিদ্র্য এসেছিল শরৎচন্দ্রের জীবনে। পিতার এই উদাসীনতা, গৃহের দারিদ্র্য এই সময়ে তাঁর গৃহ-জীবনকে সুখী করতে পারে নি, সেইজন্য বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনটা বহির্মুখী হয়ে উঠেছিল। নিরানন্দ সংসারের সন্তানেরাই সাধারণতঃ বহির্মুখী হয়ে থাকে, কারণ বাইরেই তারা আনন্দ পায় ও বালকসুলভ চপলতায় নানা অকীর্তি-কুকীর্তি করার দিকেই তাদের মন ছুটে যায়। এইভাবেই তারা পূর্ণ করে জীবনের অভাবকে। শরৎচন্দ্রও এই কারণেই তাঁর ছাত্রজীবনে বেশ দুরন্ত হয়ে উঠেছিলেন। পাঠশালা পর্যায় থেকেই তাঁর মধ্যে দুরন্তপনা দেখা গিয়েছিল। ডিহিরীবাস, ভাগলপুরবাস এবং পুনরায় দেবানন্দপুর থেকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে অধ্যয়ন, আবার ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন ও স্থানীয় জুবিলী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া—এই

রকম এলোমেলো ছাত্রজীবনে তাঁর এই দুরন্ত মনের ক্রিয়া সমানভাবেই বর্তমান ছিল। এই দুরন্তপনা ও ছন্নছাড়া ভাবের মধ্যে তাঁর অসুখী অন্তর সুস্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত। মানসিক এই অশান্তি ভুলবার জন্যই তিনি কি গান-বাজনার আশ্রয় নিয়েছিলেন? মাঝে মাঝে যাত্রার দলে অভিনয়, বৈষ্ণব আখরায় গমন প্রভৃতির মধ্যে তাঁর মানসিক অপরিতৃপ্তি ও না-পাওয়ার বেদনা সুস্পষ্ট। জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই জীবনসমুদ্র-মন্থনে যে হলাহল উঠেছিল কিশোর ও প্রাক্-যৌবন বয়সেই সেই হলাহল তাঁকে কণ্ঠে ধারণ করতে হয়েছিল। শরৎ-জীবনের ও শরৎ-চরিত্রের বিকাশ, বিস্তার এবং পরিণতির ইতিহাস তাই তাঁর জীবনীকারের পক্ষে খুব সতর্কতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

তাঁর এক জীবনীকার বলেছেন, কৈশোরের প্রারম্ভে একটি মেয়ে দেবানন্দপুরে তাঁকে বৈঁচির মালা দিত। সেই মেয়েটির প্রতি তাঁরও হয়ত বালখিল্য একটা প্রেম গড়ে উঠেছিল। নিরানন্দ গৃহ থেকে পলাতক কিশোর শরৎচন্দ্র, আমরা কল্পনা করতে পারি, এই সখীর কাছে এসে হয়ত না পাওয়ার ক্ষতিপূরণ করতে চাইতেন। এই বৈঁচির মালার অধিকারিণীই হয়ত শ্রীকান্তের জীবনে রাজলক্ষ্মীরূপে আশ্রয় নিয়েছিল।

এমনি আর একটি প্রেমজীবন এসেছিল শরৎচন্দ্রের জীবনে ভাগলপুর পর্বে। এটা গড়ে উঠেছিল স্থানীয় ভট্টবাড়ির নিরুপমাকে কেন্দ্র করে। সনাতনপন্থী পরিবারের নিষ্ঠাবতী বালবিধবা নিরুপমা, সতীত্ববোধে প্রখরভাবেই সচেতন। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল না এবং সেটা আদৌ সম্ভব ছিল না, কারণ নিরুপমা ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী। উত্তর-কালের 'দিদি' ও 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রভৃতি উপন্যাসের যশস্বিনী লেখিকার প্রতিভা তাঁর তৎকালীন অপরিণত রচনার মধ্যে আবিষ্কার করেই কি শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতি তখন অমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন? একে রূপজ মোহ বলব, না অন্য কিছু? সে যাই হোক, তাঁর

জীবনীকারদের প্রদত্ত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, শরৎচন্দ্রের উদ্বেলিত হৃদয় আহত হয়ে ফিরে এসেছে কিন্তু সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁরও সংস্কারের বাধা ছিল। তাই দেখা যায় তাঁর বর্ণিত বালবিধবা চরিত্রগুলি যেন তাঁরই হৃদয়রক্তে সঞ্জীবিত।

তথাপি নিরুপমা দেবীর সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি যে, 'অবরোধ প্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে শরৎচন্দ্র আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।' শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি দিনের যে ঘটনা নিরুপমা দেবী লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য, কারণ শরৎ-চরিত্রের একটি সুমহৎ দিক এই ঘটনাটির মধ্যে আভাসিত হয়েছে। ঘটনাটি ছিল এই :

'সেদিন আমার ৺স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধদিন। যমানিয়া নামে অভিহিত গঙ্গার ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি ঠাকুরবাড়ি ছিল ; তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আমার এক মাতৃতুল্য বয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃজায়া আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম—দাদারা বা ভগ্নীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন নাই ; মাত্র ছোট্‌দা (বিভূতিভূষণ) আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম তিনিই শরৎদাদা। উক্ত কার্যের দানাদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অসংকোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎদাদা বলিলেন, ছ্যাখ দেখি কতটা হাঙ্গামে পড়্‌তে হলো—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়ে না দিয়ে তখনি দিলে না কেন? আমি খুব অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভীমরুল উক্ত শ্রাদ্ধকার্যের মধ্যেই আমাকে মোক্ষম-ভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল ; কিন্তু সেটা এমন সময়—যাহার মধ্যে চঞ্চল হওয়া বা আসন ত্যাগ করা উচিত মনে হয় নাই ; যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে তখন তাঁহারা জানিতে পারিয়া

বিষম ব্যস্তভাবে তাহার প্রতিষেধার্থ ছুটাছুটি বাধাইয়া দিলেন। ছোট্‌দার সঙ্গেই শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন—অথচ তখন আমাদের সঙ্গে পরিচয় সামান্যই। প্রতিবেশী এবং দাদাদের বন্ধুভাবেই সাহায্যার্থে আসিয়াছিলেন মাত্র। শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বাড়ি ফিরিতেছি—দেখি তখন শরৎদাদা আমাদের বাড়ির দিক হইতে পুঁটুলির মত কি লইয়া আসিয়া ছোট্‌দার হাতে দিলেন। ছোট্‌দা তাহা ভ্রাতৃজায়ার হাতে দিলে দেখি একখানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা—শ্রাদ্ধের পূর্বে যাহা বাড়িতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধ.হয় সে সময় আবার সেগুলো লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেছিলেন—ছোট্‌দা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছে—একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন।'

আজ যখন আমরা এই ঘটনাটি কল্পনা করি তখন শরৎচন্দ্রের মনের এই কোমলতা ও পরদুঃখকাতরতার পিছনে যে প্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাকে বাল্যপ্রণয়ের রূপান্তর বলে অনুমান করা যায়। এই জাতীয় প্রেমের একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে যার উৎস রূপজ মোহ হলেও কামগন্ধহীন। যেখানেই তিনি নারী হৃদয়ের ঐশ্বর্যের বা মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছেন সেখানে রূপজ মোহ শরৎচন্দ্রকে বিভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারত না। উত্তরকালে তাঁর জীবনে নারীঘটিত একাধিক ঘটনার মধ্যে তার পরিচয় আছে। যে ছেলের কাছে গৃহ আনন্দহীন, সেখানে বাইরে তাকে আনন্দ খুঁজতেই হবে।

ছাত্রজীবন অথবা কর্মজীবনে শরৎচন্দ্রের স্বভাবের এই দিকটি সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলতেন এবং সেই সব কথা যখন পল্লবিত হয়ে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে অনেকের মনে হাজার রকম প্রশ্ন জাগাত বা সংশয় দেখা দিত তখন একান্ত নির্বিকারচিত্তে আমরা এই মানুষটিকে বলতে শুনেছি; 'জানি আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত

লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি প্রচারিত আছে, কিন্তু তাহা আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।' এমন কথা যিনি বলতে পারেন তাঁর প্রেমজীবন বা প্রণয়কাহিনী যেসব লেখক রচনা করেছেন, সে সবের মধ্যে বর্ণসমারোহ বা রোমাঞ্চ থাকা সত্ত্বেও, তা কাহিনী মাত্র—তদতিরিক্ত কিছু নয়। এবং কিছু নয় বলেই শরৎচন্দ্রের চরিত্রের উপর তা কিছুমাত্র কলঙ্ক আরোপ করতে সক্ষম হয় নি বলেই আমার বিশ্বাস। নিজের জীবনের স্খলন-পতনের কথা, দুর্বলতার কথা, দারিদ্র্যের কথা তিনি নিজেই তো অকপটে বলে গেছেন। কলঙ্ক চাঁদেই থাকে, সেজন্য তার চন্দ্রিমার কি হানি হয়?

ভাগলপুরের জীবনে আর একটি সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পিতা ছিলেন শ্বশুরেব আশ্রিত, কিন্তু বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট পরিবার ও সমাজ তখন ভাঙতে শুরু করেছে, ব্যক্তি-স্বার্থ প্রবলতর হয়ে উঠেছে, জীবনের নূতন মূল্যায়ন পরিবারের মধ্যেও অনুভূত হতে শুরু হয়ে উঠেছে। তার ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ব্যক্তি-জীবনের সংঘাত প্রবলতর হয়ে উঠেছে। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে, যেখানে ভাঙার সুযোগ হয় নি সেখানে ব্যক্তি-জীবনে অতৃপ্তি ও দুঃখ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। মায়ের মৃত্যুর পর খঞ্জরপুরে বাস ও সেখান থেকে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়ে মজঃফরপুরে আগমন—এই ব্যক্তি-সংঘাতজনিত দুঃখেরই পরিণতি ছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত নাও হতে পারে।

মজঃফরপুরে যাবার সময় শরৎচন্দ্র এমন একজন সাহিত্যরসিককে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন যিনি তাঁর সঙ্গে আজীবন বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ইনি প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। উত্তরকালে ইনিই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সংযুক্ত ছিলেন। শিখরনাথের বৈঠকখানাতেই প্রমথনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। এইখানেই তিনি বনেলি স্টেটের জমিদার মহাদেব সাহুর কেবলমাত্র কর্মচারী নয়, একেবারে প্রাণের বন্ধু হয়েছিলেন। প্রমথনাথ শরৎচন্দ্রের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁকে দাদা বলেই সম্বোধন

করতেন। পরিচয়ের সূত্রপাত থেকেই তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্র একজন মস্ত বড় লেখক হবেন। তাঁর সেই ধারণা বৃথা হয় নি। আরো একজন সাহিত্যরসিককে তিনি শিখরনাথের বৈঠকখানায় পেয়েছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। উত্তরকালে ইনি 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দুর্ভাগ্য আর দারিদ্র্য, অবহেলা আর অসচ্ছলতা—ছেলেবেলায় এরই মধ্যে মানুষ হয়েছেন শরৎচন্দ্র। মায়ের মৃত্যুর আট বছর পরে 'আবার তাঁর জীবনে নেমে এলো নিয়তির নির্মম আঘাত। ভাগলপুর থেকে তাঁর সুরেন মামার চিঠির মাধ্যমে দুঃসংবাদ এলো—বাবা মারা গেছেন। আট বছর আগে মাকে হারিয়েছিলেন, আজ, সাতাশ বছর বয়সে, বাবাকে হারালেন। চিঠিখানা সুরেন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন মজঃফরপুরে শিখরনাথকে। সংবাদটা পেতে চার-পাঁচ দিন দেরি হয়েছিল। শিখরনাথই খবরটা শরৎচন্দ্রকে দিয়ে বলেন, তোমার বাবা মারা গেছেন। তাঁর শেষ কাজের আর বেশি দেরি নেই। ভাগলপুরে ফিরে যাওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন।

বাবা মারা গেছেন ?

সংসারে নিস্পৃহ, নির্বিকারচিত্ত সেই মানুষটি ইহজগতের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন শুনে শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ়ের মতো বসে রইলেন। সংসার আজ তাঁর কাছে শূন্য মনে হলো। কিছুক্ষণ পরেই দুর্বলতা কাটিয়ে তিনি স্থির হলেন। বললেন, কোন কিছুই যখন পালন করা হলো না, তখন প্রকাশ কিংবা প্রভাস যে হোক বাবার পারলৌকিক কাজ করবে। আমার আর দরকার কি ? শিখরনাথ বলেন, তা কি হয়, শরৎ। তুমি যে বড় ছেলে, তোমায় যেতেই হবে। নইলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে কেন ? তাঁর শেষ কাজে তোমার যাওয়া কর্তব্য।

শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন ভাগলপুর। মামাদের অর্থানুকূল্যে ও সহৃদয় প্রতিবেশীদের সাহায্যে নির্বিঘ্নে শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন হয়ে গেল।

॥ আট ॥

গৃহহীন, পিতৃমাতৃহীন শরৎচন্দ্রের চোখে সংসারটা যেন এখন শূন্য মনে হলো।

পঁচিশ বছরের এক নবীন যুবকের সামনে এই পৃথিবীটা সহসা যেন অর্থহীন ও বিবর্ণ হয়ে গেল। এতকাল যে ধারায় জীবন কাটিয়েছেন তিনি—সাহিত্যচর্চা করে, গান-বাজনা করে এবং অল্পবিস্তর প্রেম করে—সেই ধারায় চললে ভাই-বোনদের যে মানুষ করা যাবে না, এই চিন্তাই এখন শরৎচন্দ্রের মনে প্রবল হয়ে উঠল। ভাগলপুর—যে কোন কারণে হোক—তখন তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। জীবনের কঠোর, রূঢ় বাস্তবতা আজ যেন তাঁর যৌবনের সকল স্বপ্ন, সকল আদর্শকে নির্মমভাবে পরিহাস করে উঠল। কুড়িটা টাকার অভাবে পরীক্ষার ফি দিতে পারেন নি বলে কলেজের পড়া বন্ধ করতে হয়েছে। চোখের সামনেই দেখেছেন কেমন করে পিতার নিস্পৃহতার জন্য মায়ের সমস্ত অলংকার একে একে অধমর্ণের ঘরে চলে গেছে।

পথের কোন দিশাই তাঁর চোখে ভাসল না।

কি করবেন তিনি এখন?

দেখতে দেখতে পূজোর ছুটি এসে গেল।

মামারা কলকাতা থেকে ভাগলপুরে এলেন। এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন তাঁর সমবয়সী ও বন্ধুস্থানীয়। সুরেন মামা ও উপেন মামা। এঁদেরও খুব সাহিত্য-প্রীতি ছিল আর সেটাই ছিল মামা-ভাগ্নের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্র।

—শরৎ কলকাতায় চলো।

—গিয়ে কি করব? কোথায় বা থাকব?

চাকরি একটা জুটবেই। থাকার কথা বলছ? আমাদের কাসারীপাড়ার বাড়িটা ত খালি আছে।

—কিন্তু কলকাতায় যে যাব তার টাকা কোথায়?

সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু ভেবো না তুমি।

মামাদের পরামর্শক্রমে কলকাতায় এলেন শরৎচন্দ্র চাকরির সন্ধানে। হাইকোর্টে একটা অনুবাদকের কাজ জুটে গেল। আপিল কেসের নথিপত্র ইংরেজী থেকে হিন্দীতে অনুবাদ করা। হিন্দী তিনি ভালই জানতেন। এ চাকরিটা ঠিক মাসমাইনের চাকরি ছিল না—অনুবাদের পরিমাণ হিসেবে পারিশ্রমিক। প্রথম মাসে উপায় হলো মন্দ নয়—প্রায় একশো টাকা। ধার-কর্জ যা-হয়েছিল, কিছু শোধ দিলেন। সাহিত্যের নেশাটা আবার পেয়ে বসল। ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আসবার সময় সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল—সেই 'বাগান'-খাতা তিনখানি যেগুলির পৃষ্ঠায় মুক্তাক্ষরে লেখা ছিল 'বড়দিদি' প্রভৃতি গল্প।

আরো একটা ইচ্ছা জাগল তাঁর মনের মধ্যে।

সাহিত্য-সম্রাট বেঁচে নেই, কিন্তু সাহিত্য-জগতের শাহানশা রবীন্দ্রনাথ তো রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে কি রকম হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র জানতেন না জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি কি রকম দুর্ভেদ্য দুর্গ। দুই-একদিন চেষ্টা করে কবির দর্শনলাভে তিনি ব্যর্থ হন। সেইদিন তিনি বোধ হয় অনুভব করেছিলেন যে শিক্ষা ছাড়াও বংশকৌলীন্য ও কাঞ্চনকৌলীন্যের মূল্য কত। শুধু প্রতিভার ছাড়পত্র নিয়ে ঠাকুরবাড়ির দেউড়ি অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করতে যখন তিনি সক্ষম হলেন না, তখন তিনি দূর থেকে কবিকে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে হয়ত বলে থাকবেন—হে কবি, আমি তোমার একলব্য শিষ্য হব। কবিতায় না পারি, সাহিত্যের একটা বিভাগে যেন আঁচড় কেটে তোমার প্রশংশাভাজন হতে পারি।

প্রতিভা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

শরৎচন্দ্রও তাই পেরেছিলেন।

'এই তো সেদিনও দূর প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জনে ব্যাপৃত ছিলাম।' এই প্রবাস ছিল সাগরপারে ব্রহ্মদেশ—যাকে তখন বলা হতো মগের মুলুক। সেই মগের মুলুকে জীবিকার সন্ধানে পাড়ি দিলেন শরৎচন্দ্র একদিন। এই শতাব্দীর সূচনাকালে—১৯০২ সালে—শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন এবং এক দশকের কিছু বেশি সময় তিনি ঐ দেশেই অবস্থান করেছিলেন। তাঁর জীবনের এই সময়টাকে অজ্ঞাতবাসও বলা চলে। বাংলার প্রথম মহাকবি মাইকেল মধুসূদনও একদিন ঠিক এইভাবে অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছিলেন সুদূর মাদ্রাজে।

শরৎচন্দ্রের এক জীবনীকার লিখেছেন :

'ঠিক সেই সময়ে বর্মা থেকে এলেন অঘোরবাবু। উপেনবাবুর ভগ্নীপতি। সম্পর্কে তিনি হলেন শরৎচন্দ্রের মেসোমশায়। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং আলাপও জমে উঠলো। তাঁর মুখে বর্মাদেশের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে তিনি বর্মায় পাড়ি দেবেন স্থির করে ফেললেন।......অঘোরবাবু বর্মায় ফিরে যাওয়ার অল্পদিন পরেই গোপনে তিনি বর্মা যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেললেন।'[১]

কিন্তু একেবারে গোপনে নয়। শরৎচন্দ্রের তিন মামা—সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ এই খবরটা জানতেন।

মগের মুলুকে পাড়ি দেবার আগে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিভার একটি অব্যর্থ পরিচয় রেখে গিয়েছিলেন। সেকালের বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন বসু। এইচ. বোস নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। কলকাতায় প্রথম বাঙালীর সাইকেলের দোকান ইনিই করেন। সুগন্ধী দ্রব্যের ব্যবসায়েও বাঙালীর মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। তাঁর প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল এইচ. বোস পারফিউমার্স। এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত দুটি সুগন্ধী দ্রব্য—'দেলখোশ' আর 'কুন্তলীন'—তখন বাংলার ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করেছিল। দেলখোশ পানের সঙ্গে খেতে হতো আর কুন্তলীন ছিল সুরভিত কেশ

১ শরৎচন্দ্র : কানাইলাল ঘোষ।

তৈল। 'কেশে মাখো কুন্তলীন, পানে খাও দেলখোশ, ধন্য হোক এইচ. বোস'—এই ছড়াটি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত।[১] কিন্তু হেমেন্দ্রমোহন শুধুমাত্র ব্যবসায়ী ছিলেন না। অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন ও মার্জিতরুচির মানুষ ছিলেন তিনি।

পণ্যদ্রব্য দুটিকে জনপ্রিয় করবার জন্য তিনি একটি সুন্দর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। সেটি হলো 'কুন্তলীন পুরস্কার'। ঐ নাম দিয়ে হেমেন্দ্রমোহন একটি সুমুদ্রিত বার্ষিকী প্রকাশ করতেন। কুন্তলীন প্রেস নামে তাঁর একটি নিজস্ব ছাপাখানাও ছিল। গল্পের জন্য তিনি প্রতিযোগিতা আহ্বান করতেন। প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম হতেন তাঁকে নগদ একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হতো ও পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পটি অন্যান্য প্রতিযোগী গল্পের সঙ্গে ঐ বার্ষিকীতে প্রকাশিত হতো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতা আহ্বান ও পুরস্কার দেওয়ার প্রথা সেই প্রথম। কুন্তলীন পুরস্কার তখন একটি সম্মানজনক পুরস্কার বলেই নূতন বা উদীয়মান গল্প-লেখকগণ বিবেচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ একবার এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রও পেয়েছিলেন, তবে স্বনামে নয়, বেনামে অথবা বিনা নামে। ঘটনাটি খুলে বলি।

রেঙ্গুন যাবার আগে শরৎচন্দ্র জানতে পারলেন যে তাঁর তিনজন মাতুলই কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য গল্প পাঠাবেন ঠিক করেছেন। তিনি তাঁদের গল্পগুলি একবার দেখতে চাইলেন, কারণ তিনিই তো মাতুলদের সাহিত্যগুরু।—না উপীন, তোমাদের এই গল্প প্রতিযোগিতায় stand করবে না, ভাগিনেয়র এই অভিমত শুনে তাঁরা প্রতিযোগিতা থেকে নিরস্ত থাকেন। পরের দিন সকালবেলায় তাঁর সুরেন মামা যখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন

১. বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে এখন যেখানে প্রবর্তক ফার্নিসার্স ঐ বাড়িটাই আগে 'কুন্তলীন হাউস' নামে পরিচিত ছিল। এটি এইচ. বোসের নিজস্ব বাড়ি ছিল; তাঁর বাসভবন ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটে সিটি কলেজের কাছে। এটি তাঁর পৈতৃক বাড়ি।

ভাগিনেয়র বর্মা যাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে, তখন তিনি দেখেন যে, শরৎচন্দ্র একমনে কি লিখছেন, একটা পাতা টেনে নিয়ে পড়ে দেখেন যে সেটি একটি গল্প। কিছুক্ষণ বাদে লেখা শেষ হলে, তিনি তাঁর মাতুলকে বলেন, এই নাও সুরেন, এই গল্পটা তোমার নাম দিয়ে পাঠিয়ে দাও, মনে হয় এই গল্পটাই পুরস্কার পেতে পারে।

—তোমার নামে দিতে আপত্তি কি, শরৎ?

—বিলক্ষণ আপত্তি আছে। সাহিত্যে আমার আত্মপ্রকাশের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। গল্পটা পাঠিয়ে দিও। ফল কি হয়, জানিও কিন্তু।

নিজের লেখার ওপর বিশ্বাস ছিল শরৎচন্দ্রের। প্রতিযোগিতার ফলাফল যখন ঘোষিত হলো, দেখা গেল 'মন্দির' গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করেছে; কিন্তু লেখকের নাম নেই। মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গল্পটি ঐভাবেই পাঠিয়েছিলেন। মতান্তরে, সুরেন্দ্রনাথের নামেই এটি বেরিয়েছিল। কিন্তু যে পাঠ করল, সেই বুঝল যে, এটি একজন সত্যিকার গল্প লিখিয়ের কলম থেকে বেরিয়েছে। এই 'মন্দির' গল্পই ছাপার অক্ষরে শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প। ১৯০৩ সালের প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত এই গল্পটি ১৯০৪ সালের কুন্তলীন পুরস্কার বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে বাংলার কৌতূহলী পাঠকসমাজ জানতে পারে 'মন্দির' গল্পটির প্রকৃত লেখকের নাম। এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক জলধর সেন। তিনিই এই গল্পটিকে প্রথম পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, লেখকের নামহীন এই গল্পটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একজন বিদগ্ধ পাঠকের। তিনি বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল' —প্রমথ চৌধুরী। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন: 'আমি বহুকাল পূর্বে কুন্তলীন পুরস্কারে একটি ছোট গল্প পাঠ করে বিস্মিত হয়েছিলুম। যে গল্পটির নাম 'মন্দির'। গল্পের নীচে লেখকের নাম ছিল না। পরে খোঁজ করে জানতে পারলুম যে এই নূতন লেখকের নাম শরৎচন্দ্র।...পরিচিত লেখকের নাম দেখে তাঁর লেখার প্রতি

আমাদের মন অনুকূল হয় এবং তাঁর খ্যাতির প্রভাব আমাদের মতামতের রূপ দেয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন কি নামহীন লেখকের রচনা আমাদের নয়ন মন আকৃষ্ট করে সেখানে আমরা একটি যথার্থ নূতন লেখককে আবিষ্কার করি। 'মন্দির' গল্পটির কথাবস্তুও সম্পূর্ণ নূতন, তার উপর সেটি ছিল সুগঠিত।' কুন্তলীন পুরস্কারের টাকা দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথের মারফত মোহিতচন্দ্র সেন প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী কিনেছিলেন। প্রবাসে এই গ্রন্থাবলী ছিল তাঁর নিত্য পাঠ্য।

অবশেষে ব্রহ্মদেশে এলেন শরৎচন্দ্র ভাগ্যান্বেষণে। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ বছর। নানা কারণে তাঁর জীবনে এই প্রবাস-বাস স্মরণীয় হয়ে আছে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ এক শাসনের অন্তর্গত ছিল।

৫৬ নম্বর লিউস স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

বাড়িটির দরজায় পিতলের একটি নেমপ্লেট।

তার ওপর ইংরেজী হরফে লেখা রয়েছে: অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, এ্যাডভোকেট।

রেঙ্গুন বারের উদীয়মান উকিল। এঁদেরও বাড়ি ছিল হালিসহরে। শরৎচন্দ্রের মাতুলদের ভগ্নীপতি। এঁরই সঙ্গে কলকাতায় শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। খুব সহৃদয়তার সঙ্গেই তিনি গ্রহণ করলেন ভাগ্যান্বেষী যুবকটিকে। অঘোরবাবুর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নাম তাঁর গিরীন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অঘোরনাথ। গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন সরকারী ঠিকেদার—সরকারী মহলে তাঁর প্রতিপত্তিও ছিল। তাঁকেই বললেন, গিরীন, এই ছেলেটির জন্য একটু চেষ্টা-চরিত্র করো। ছেলেটি বেশ ইন্‌টেলিজেন্ট। মগের মুলুকে এসেছে ভাগ্যের সন্ধানে।

আলাপচারী শরৎচন্দ্রের পক্ষে গিরীন্দ্রনাথের আলাপ জমে উঠতে দেরি হলো না। বয়সে তিনি একটু বড় ছিলেন, তাই গিরীন্দ্রবাবু তাঁকে শরৎদাদা বলে সম্বোধন করতেন। সম্ভবতঃ রেঙ্গুনে তিনিই ছিলেন শরৎচন্দ্রের প্রথম বন্ধু—দরদী বন্ধু। অঘোরবাবুর চেষ্টায় তিনি বার্মা রেলের হিসেব পরীক্ষকের অফিসে পঁচাত্তর টাকা মাইনের একটা চাকরি পেলেন। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই দেশের ভাষাটাও শিখতে থাকেন ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রতিপদেই অনুসরণ করেছে শরৎচন্দ্রকে। কিছুকাল পরে নিউমোনিয়া রোগে অঘোরবাবু মারা গেলে শরৎচন্দ্রকে পুনরায় আশ্রয়হীন হতে হয়।

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের প্রথম বন্ধু ছিলেন যিনি সেই গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বন্ধুর জীবনের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

'১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যৌবনের প্রারম্ভে শরৎচন্দ্র নিঃসম্বল অবস্থায় রেঙ্গুন শহরে আসিয়া প্রথমে তাঁহার আত্মীয় হালিসহর-নিবাসী রেঙ্গুনের উদীয়মান উকিল স্বর্গীয় অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই অঘোরবাবু নিউমোনিয়া রোগে পরলোকগমন করায় শরৎচন্দ্র আবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহায়-সম্বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বা অর্থবল কিছুই ছিল না। সম্বল ছিল মাত্র ভাবপ্রবণ দরদী হৃদয়খানি ও সুমধুর কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বর প্রথম আকৃষ্ট করে আমাকে। রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীদিগের মধ্যে আমিই তাঁহার প্রথম বন্ধু। শরৎচন্দ্রের আত্মীয় অঘোরবাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরিবারবর্গ নিকটে না থাকায় তাঁহার মৃত্যুশয্যায় সেবা-শুশ্রূষার ভার শরৎচন্দ্র ও আমি লইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং রাত্রি জাগরণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সাহায্য করিতাম। তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যূষে আপন মনে কত কি আবৃত্তি

করিতেন এবং ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন। ঐ আবৃত্তি ও গানের অধিকাংশই ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে।

'কয়েকদিন শরৎচন্দ্রের সাহচর্যে থাকিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, শরৎচন্দ্র একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। কখন কখন তিনি সহজ লোকের মত আচার-ব্যবহার করিলেও অধিকাংশ সময় আপনার খেয়ালে আপনি মত্ত থাকিতেন। কোনপ্রকার নিয়ম বা বাঁধাবাঁধির ধার ধারিতেন না। তাঁহার আচরণে বা কথাবার্তায় কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার কার্যকলাপের পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত যে, তিনি একজন মহাভাবুক লোক, সর্বদা আপন ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ...শরৎচন্দ্র সংসারচক্রের ভীষণ আবর্তনে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এ-কথা তিনি গোপন করিতেন না এবং প্রথম জীবনে প্রণয়-ঘটিত নৈরাশ্যের একটি আঁচ তাঁহার হৃদয়ে লাগিয়াছিল, কথা প্রসঙ্গে এইরূপ আভাসও দিতেন।'[১]

রেঙ্গুনে আসার পর দু'বছর কেটে গেল।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ১৯০৫ সালে রেঙ্গুনে এলেন। সঙ্গে তাঁর একমাত্র পুত্র, ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেন। পলাশীর যুদ্ধ, প্রভাস, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি কাব্য রচনা করে নবীনচন্দ্র তখন খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীসমাজ তাঁকে অভ্যর্থনা করে একটি মানপত্র দেওয়ার সংকল্প করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের, বিশেষ করে বাংলা ও মাদ্রাজের বহু অধিবাসী সরকারী কার্যোপলক্ষে অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে বাস করতেন। বাঙালীর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার ; তার মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল এক হাজার। 'অতি কষ্টে একখানি অভিনন্দনপত্র লেখা হইল বটে, কিন্তু অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাহিবার লোক মোটেই পাওয়া গেল না।...আমি অনন্যোপায় হইয়া শরৎচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলাম। তখন তিনি রেঙ্গুন শহরে সম্পূর্ণ

১. ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র : গিরীন্দ্রনাথ সরকার।

অপরিচিত ও লোকসমাজে মিশিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া প্রথমে বিশেষ আপত্তি করিলেন।'[১]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধুর অনুরোধে তাঁকে এই অনুষ্ঠানে গান গাইতে হয়েছিল। সংবর্ধনা দেওয়া হয় স্থানীয় বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে। আত্ম-প্রচারবিমুখ শরৎচন্দ্র পর্দার অন্তরাল থেকে মধুরকণ্ঠে একটি অভ্যর্থনা-সংগীত গাইলেন। গাইলেন তদ্‌গতচিত্তে ভাবাকুলতার সঙ্গে মধুর কণ্ঠে। কিন্তু কে এই মধুকণ্ঠ গায়ক? উপস্থিত সকলেই তাঁকে দেখতে চাইলেন—দেখতে চাইলেন স্বয়ং কবিবর নবীনচন্দ্র। কিন্তু সেই না-দেখা গায়ককেই তিনি পরে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বাস্তবিক শরৎচন্দ্রের বহু অন্তরঙ্গস্থানীয় একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, কণ্ঠ-সংগীতে তিনি সকলকেই বশীভূত করতে পারতেন।

১৯০৫ সালে রেঙ্গুনের আর একটি ঘটনা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব। স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবক-সমিতির উদ্যোগে সমারোহের সঙ্গে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এখানে শুভাগমন হয়েছিল। রামকৃষ্ণদেবের ইনি অন্যতম শিষ্য ছিলেন; রামকৃষ্ণ সংঘে ইনি শশীমহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। কাজেই তাঁর আগমন রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীদের মনে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল সেদিন। সেই তাঁহাব ব্রহ্মদেশে প্রথম পদার্পণ এবং ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের অকালমৃত্যুর পর 'বৌদ্ধপ্লাবিত ব্রহ্মদেশে তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের বাণী প্রচার করিয়া যান।'

শরৎচন্দ্র সহজে কোথাও গান গাইতেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণানন্দের সৌম্য মূর্তি দর্শনে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন—আকৃষ্ট হলেন তাঁর মুখে তত্ত্বকথা শুনে। একদিন স্বামীজী তাঁকে একটা গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলেন। শরৎচন্দ্র মধুরকণ্ঠে গাইলেন:

এস সবে মিলে গাই কুতূহলে রামকৃষ্ণ-গুনগান।
রামকৃষ্ণ-নামামৃত প্রেমানন্দে আজি করিব পান॥

---

১. তদেব।

বলা বাহুল্য, তাঁর এই প্রাণ-মাতানো গান শুনে স্বামীজী মুগ্ধ হলেন।

এই সময়কার আর একদিনের ঘটনা গিরীন্দ্রনাথ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

'যেদিন রেঙ্গুন শহরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অভ্যর্থনা হয়, অভ্যর্থনা-সভায় বহু সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তির সহিত স্বয়ং কবিবর নবীনচন্দ্র সেন আসিয়াছিলেন শুনিয়া স্বামীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি স্বামীজী ও শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে কবিবরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি অকস্মাৎ স্বামীজীর সহিত শরৎচন্দ্রের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং বিশেষ সমাদরের সহিত আমাদের বসাইয়া স্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।···তাহার পর শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কবিবর বলিলেন, আপনার গান শোনবার আশায় আমি তৃষিত চাতকের মত লালায়িত হয়ে আছি। উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিলেন, আজ আমি গান শোনাতে আসি নি, আপনার পুত্র সুকণ্ঠ নির্মলচন্দ্রের গান শুনতে এসেছি। কবিবর বলিলেন, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলচন্দ্রের তুলনা হতে পারে না। স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, আজ এখানে একত্রে নবীনচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উদয় হয়েছে বটে, কিন্তু আমি শরৎ-সুধাই পান করতে চাই। ইহার পর আর বলিতে হইল না, শরৎচন্দ্র অর্গানের সম্মুখে বসিয়া আপন মনে প্রাণের আবেগে ভাব-বিভোর হইয়া গাহিলেন ঃ

আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা! বাকী কিছু নাই।
যাহা দাও বাঁচিবার মত তার বেশী নাহি চাই॥

এই সংগীতের রস-মাধুর্য আস্বাদন করিয়া কবিবর বলিলেন, রেঙ্গুন শহরে এমন রত্ন লুকান ছিল জানতাম না, আমি আজ আপনাকে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধি দিলাম।

শরৎচন্দ্রের জীবনের এই ঘটনাটি মনে রাখবার মত।

উনিশ শতকের বাংলার তৃতীয় মহাকবির হাতে ভাবীকালের

অপরাজেয় কথাশিল্পীর এই যে শিরোপা লাভ, এই ঘটনাটি বড় সামান্য ছিল না সেদিন। কিন্তু যে গানটি তিনি সেদিনের সেই সন্ধ্যায় গেয়েছিলেন, তারই মধ্য দিয়ে কি গৃহহারা ঊনত্রিশ বছরের এক যুবকের হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত হয় নি? ঠিক এমনিভাবেই আর একদিন তাঁকে মনের ব্যথা প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল যেদিন গভীর রাত্রে মজঃফরপুরে ধর্মশালার ছাদে উঠে আর একজনের বেহালা শুনে তিনি গেয়েছিলেন: 'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' বস্তুতঃ জীবিকার্জনের জন্য রেঙ্গুনে এসে শরৎচন্দ্র যেন বেশি করে তাঁর শূন্য জীবনের রিক্ততা বোধ করতেন। সবসময়ই লোকলোচনের আড়ালে থাকতে চাইতেন। আর লোকসমাজে মিশতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন।

আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। শরৎচন্দ্র যখন এখানে এলেন তখন এখানকার বাঙালী সমাজে বিশিষ্ট বাঙালী সন্তানদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল না। তখন এখানে রেঙ্গুন হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদে ছিলেন সতীশরঞ্জন দাশ; সম্পর্কে ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাই হতেন; ব্রহ্মদেশের এডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ব্যারিস্টার পূর্ণচন্দ্র সেন, সরকারী চাকরির বড় বড় পদগুলির সবই বাঙালীর অধিকৃত ছিল। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন যেমন উচ্চশিক্ষিত তেমনি মার্জিত-রুচিসম্পন্ন। এই সাগর-পারে বান্ধববর্জিত দেশে এসে শরৎচন্দ্র প্রথম যাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন, ইচ্ছা করলে সেই উদীয়মান ব্যবহারজীবী অঘোরনাথের মাধ্যমেও তিনি এই উচ্চ সমাজে মেলা-মেশা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজের ওজন বুঝতেন—বুঝতেন যে শিক্ষায়-দীক্ষায় তিনি এঁদের কারো সমকক্ষ তো নন, এমন কি কাছাকাছিও নন। জীবনের এই ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন এবং সর্বদাই এই শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে তিনি দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন। উত্তরকালেও যখন তিনি যশের উত্তুঙ্গশিখর-দেশে পৌঁছেছেন, তখনও দেখা গিয়েছে তিনি তথাকথিত এলাইট

সমাজ পরিহার করে চলতেন। কিন্তু যেখান থেকে অথবা যার কাছ থেকে এসেছে প্রীতি ও শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ আন্তরিক আহ্বান বা আমন্ত্রণ, সেখানে অথবা তার কাছে যেতে এই মানুষটি কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ circle তাই চিরকালই সীমাবদ্ধ ছিল আর সে ঘনিষ্ঠতাও ছিল সমমর্মী সাধারণ স্তরের মানুষের সঙ্গেই। এই কারণেই রেঙ্গুনে তাঁর যাঁরা অন্তরঙ্গস্থানীয় ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন সাধারণ মানুষ—সহৃদয় মানুষ। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই শ্রেণীর মানুষেরই প্রতিনিধি। শরৎচন্দ্রের জীবনকে এই দিক থেকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। শরৎ-সাহিত্যকেও।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে আসার চৌদ্দ বছর পরে স্থানীয় বাঙালী অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। যাকে তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবনে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে এলেন ১৯১৬ সালের মে মাসে। এখানে তিনি তিন-চারদিন অবস্থান করেন।[১] ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীরা এই সুযোগে কবিকে প্রকাশ্যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। একটি সংবর্ধনা কমিটি গঠিত হয় বিশিষ্ট বাঙালীদের নিয়ে ; এর সভাপতি হয়েছিলেন সতীশরঞ্জন দাশ। ঠিক হলো কবিকে একটি মানপত্র প্রদান করতে হবে। কিন্তু সেটি রচনা করবে কে? কবির যোগ্য মানপত্র রচনা করতে পারেন এমন লোক কাউকে পাওয়া গেল না। স্থানীয় বেঙ্গলী ক্লাবের একজন সদস্য প্রস্তাব করলেন, এই দায়িত্বটা শরৎচন্দ্রকে দিলে কেমন হয়। একজন বললেন, তিনি তো গায়ক, লিখতে পারেন কি? খুব ভালো পারেন, বললেন আর একজন। শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের উপরেই সেই মানপত্র রচনার ভার দেওয়া হলো।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানের দেবতা। কবির তিনি একলব্য-শিষ্য।

১. আমেরিকা যাত্রার পথে জাপান হয়ে কবি রেঙ্গুনে উপস্থিত হন ১৯১৬ সালের ৭ মে। তাঁ জন্মদিনের উৎসব সে বছর এখানেই উদ্‌যাপিত হয়।

দেবতার চরণে প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার জন্য শরৎচন্দ্র হাতে কলম তুলে নিলেন। রচনা করলেন অল্প কথায় একটি সুন্দর মানপত্র। ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেন সভায় সেটি পাঠ করেন ও পরে একটি রৌপ্যাধারে করে মানপত্রটি কবির হস্তে অর্পণ করা হয়। কবি এই মানপত্রটির রচনার খুব প্রশংসা করেছিলেন। কথিত আছে, এর রচয়িতাকে তিনি একবার দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও লাজুক প্রকৃতির মানুষ শরৎচন্দ্র সেই সুযোগ গ্রহণ করেন নি। অথচ ইচ্ছা করলে তিনি সেইদিনই রেঙ্গুনে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হতে পারতেন। বিচিত্র স্বভাবের মানুষ শরৎচন্দ্র, সন্দেহ নেই। তাঁর রচিত সেই মানপত্রটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

'হে কবি, আপনি অপূর্ব কবি—প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুরে নব রাগিণীতে বঙ্গ-হৃদয়কে এক নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। আপনার কাব্যকলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবি-শিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট[১] পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ··· এই বিশাল সৃষ্টির অণুপরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে, এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি।'

রবীন্দ্র-প্রতিভার সেই মধ্যাহ্নকালে শরৎচন্দ্রের চেতনায় কবির মহত্ত্ব-মহিমা যে কেমন করে এমন অভ্রান্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, সে কথা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র-পূজার

১. কবি তখন সাহিত্যের দুর্লভ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেছেন।

এমন দৃষ্টান্ত আরো আছে; যথাস্থানে তার উল্লেখ করব। তিনি চির-দিনই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য ও সংগীতের অনুরাগী ছিলেন।

সুগায়ক হিসেবেই রেঙ্গুনে প্রথমে তাঁর খ্যাতি রটে গিয়েছিল।

'শীর্ণ রুগ্ন মলিন চেহারার এই লোকটির যে এমন সুকণ্ঠ, ইহাতে মনে হইত যে বিধাতার বিচারে এতটুকু ভুল হয় নাই। এই শুষ্ক শীর্ণ দেহের ভিতরে তিনি যে মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সুর, এই সংগীত তাহারই লীলায়িত গতি-প্রবাহের শব্দ মাত্র।[২]

কিন্তু শুধু গান-বাজনা নিয়ে থাকলে তো আর পেট ভরে না। এসেই চাকরি যদি বা একটি জুটেছিল, অঘোরবাবুর হঠাৎ মৃত্যুর ফলে শরৎচন্দ্রের সেই চাকরিটি খোয়া যায়। শোনা যায়, তিনিই ইস্তফা দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বেকার ছিলেন। আশ্রয়দাতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পর রেঙ্গুনে তিনি স্বাধীনভাবে কিন্তু নিঃসম্বল অবস্থায় বাস করতে আরম্ভ করেন। শুরু হয় তাঁর অবিন্যস্ত জীবন—অবিন্যস্ত এবং কিছু পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খলও বটে। এটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। রেঙ্গুন থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে পোজানডং-এ মিস্ত্রীপল্লীর মধ্যে অল্প ভাড়ায় দোতলায় একটি কাঠের ঘর ভাড়া নিলেন। সেখানে বাস করত ধানকল, পাটকল, ডক-ইয়াড ও ঢালাইয়ের কারখানার যত ফিটার, বাইসম্যান ও ঢালায়ের মিস্ত্রী। তাদের অনেকেই ছিল দেশত্যাগী, অল্পশিক্ষিত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ। শরৎচন্দ্র অবাধে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। ফলে, সকলেই তাঁকে দেখতেন শ্রদ্ধার চক্ষে। ডাকতো 'বামুনদা' বলে। এই সময় তিনি পেগুতে একটা অস্থায়ী চাকরি পেয়ে সেখানে চলে যান। মাস ছয় বাদে যখন রেঙ্গুনে ফিরলেন তখন তাঁকে আর চেনাই যায় না। লম্বা লম্বা চুল, দাড়ি নিয়ে যখন তিনি তাঁর পরিচিত মহলে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁর গানের একজন ভক্ত তাঁকে পরিহাস করে বললেন, দাদা, এই চেহারায় একটা আলখাল্লা হলেই ঠিক

২. ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র: যোগেন্দ্রনাথ সরকার। ইনি কর্মসূত্রে একই অফিসে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

মানাত। আর একজন বললেন, বাউলের বেশ তো ঠিকই হয়েছে, এবার একটা গুপীযন্তর নিয়ে শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়ুন। গলা আছে, ভাবনা কি।

—না ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু তাতে ক'দিন চলবে। চাকরি একটা চাই।

ভাগ্যক্রমে এই সময় তিনি একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেলেন।

এই চাকরি তিনি যাঁর দৌলতে পেয়েছিলেন তাঁর নাম মণীন্দ্রনাথ মিত্র। ইনি তখন ঐখানে একটি উচ্চ পদে ছিলেন—ডেপুটি একজামিনার, পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউণ্টস্। বিশিষ্ট ভদ্র বাঙালী। কলকাতার ঝামাপুকুরের মিত্রবাড়ির সন্তান। এঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া শরৎচন্দ্রের জীবনে ভগবানের আশীর্বাদের মত ছিল। ইনি যখন ছন্নছাড়া মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হন তখন তিনি শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটি আশ্চর্য মানুষের সন্ধান পেয়েই বুঝি তাঁর প্রতি মিত্র মহাশয় প্রবলভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজেও একজন সাহিত্যরসিক এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। শুধু চাকরির ব্যাপারে নয়, শরৎচন্দ্র এঁর কাছে অশেষভাবেই ঋণী ছিলেন। সাহিত্যচর্চা ও পড়াশুনার ব্যাপারে তিনিই তো তাঁকে উৎসাহিত করতেন। শুধু তাই নয়। মণীন্দ্রনাথের বাড়িতেও তিনি কিছুকাল সমাদরের সঙ্গে বাসও করেছিলেন। তিনি থাকতেন টমসন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। ক্রমে মিত্র মহাশয় শরৎচন্দ্রের গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর একান্ত অনুরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরই সুপারিশে শরৎচন্দ্র ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুনের পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউণ্টস্ অফিসে একটি চাকরি পেয়ে গেলেন। কেরানীগিরির চাকরি—তাঁর নিজের ভাষায় 'অধম কেরানী।'

তখন থেকে তিনি আবার সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করেন।

তন্ময় হয়ে প্লট তৈরীর চিন্তা করেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে তাঁর সুরেন মামার কাছ থেকে তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে তাঁর লেখা সেই 'মন্দির' গল্পটি প্রতিযোগিতায়

প্রথম হয়ে কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেছে। তিনি আরো জানিয়েছিলেন যে, বিচারক জলধর সেন নাকি মন্তব্য করেছেন—এই গল্প যার লেখা সে একজন পাকা লিখিয়ে। অতএব শরৎ, তুমি সাহিত্যচর্চায় মন দাও, এই আমাদের অনুরোধ।

১৯০৭। নভেম্বর মাস।

শরৎচন্দ্র হাইড্রোসিল রোগে আক্রান্ত হলেন।

সবাই উপদেশ দিয়ে বলল, কলকাতায় গিয়ে অপারেশন করিয়ে আসুন। তাই হলো। অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি কলকাতায় এলেন। ভর্তি হলেন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। তিন মাস পরে সুস্থ হয়ে তিনি ফিরে এলেন তাঁর কর্মস্থলে এবং নিশ্চিন্ত মনে কাজে মনোযোগ করলেন। এই সময়ে তাঁর একটা নূতন খেয়াল চেপেছিল। ছবি আঁকা। সুকণ্ঠ গায়ক শরৎচন্দ্র যে অঙ্কনবিদ্যাতেও নিপুণ ছিলেন, এই কথা শুনে আজ হয়ত অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হবেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে শরৎচন্দ্রের একটা আশ্চর্য মিল দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর সেই প্রবাস-জীবনের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মীর একটি বিবরণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি লিখেছেন ঃ

'একদিন আমাকে শরৎদা বই-এর দোকানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি কিনব বল তো? মুখের পানে নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিয়া কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি নিজেই বলিয়া ফেলিলেন, এই দেখ আজ কি কিনতে এসেছি। বলিয়াই তিনি রং তুলি বাছাই করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ আবার কি খেয়াল মাথায় ঢুকল, শরৎদা?—দেখ কি করে বসি এবার, বলিয়া তিনি গুটিতিনেক তুলি আর দু'তিন রকম রং কিনিয়া লইলেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হবে এ দিয়ে। উত্তর পাইলাম, পরশু রবিবারে একবার আমার বাসায় গিয়ে দেখো, কি হয় এসব দিয়ে।

'রবিবারে তাঁহার বাসায় গেলাম। গিয়া দেখি, তিনি মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া যে বাড়িতে একাকী অবস্থানের বন্দোবস্ত

করিয়াছেন, সে বাড়িটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও একার পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষুদ্র গৃহটির সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানের প্রান্ত-সীমায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি পহন্‌ডাঙের খাড়িটি রেঙ্গুন হইতে বাহির হইয়া উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে জনপদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মাঠটির দৃশ্য কি সুন্দর তখন। যেদিকে তাকাও যেন সোনা গলানো। গিয়া ডাকিলাম, শরৎদা !—ও শরৎদা !

'কে সরকার নাকি? আরে এসো এসো। এতদূরে চিনে আসতে পেরেচ ত? উত্তর করিলাম, দেখতে পাচ্ছেন, পেরেছি। আর নাই যদি পারবো তো এলাম কি করে?……সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। সম্মুখে কক্ষটির উপযোগী একটি স্বল্প-পরিসর বারান্দা। রেলিং-এর একপাশে তক্তার উপরে টবে বসানো একটি তুলসীর চারা, অপর পাশে একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব কি, শরৎদা ?

'ওহে, এটা যে হিঁদুর বাড়ি, এ কথাটা ভুলে যেয়ো না, সরকার। বলিয়াই আমার হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিতে টানিতে মাঝের ঘরটিতে আনিয়া বসাইলেন। প্রথমটায় চোখে পড়ে নাই। এবার ঘরের ভিতরটায় ঢুকিতেই চোখে পড়িল, একটা ইজেলের উপর ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাসের পট। তার গায়ে কেবল পেন্সিলের দাগ—কোথাও কোথাও রং-এর পোঁচ। ব্যাপারটা বুঝিতে বাকী রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ শিক্ষার গুরু কে, শরৎদা ?—এ গুরু আমি নিজে, বলিয়া বাম হাতের তর্জনী দিয়া নিজের কপালটি দেখাইয়া একটুখানি হাসিলেন। তারপর ছবির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যটি কিরূপ করিলে সুন্দর মানাইবে, কোন্ রং-এ ইহার এফেক্ট কিরূপ বাড়িবে সেই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। মোটের উপর আমি তার একবর্ণও বুঝিলাম না। কেবল চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া গেলাম।

'ছবি আঁকার ঝোঁকটার ভিতরে শরৎচন্দ্রের কতখানি যে প্রাণের দরদ ছিল তাহা এতদিন পরে সত্য সত্যই নির্ণয় করা কঠিন। তবে

এ-কথা সত্য যে, তাঁহার যতটুকু চিত্রকলা বুঝিবার এবং বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাহাতে তাঁহাকে চিত্ররসজ্ঞ বলিলে ভুল হইবার কোনই কারণ ছিল না।……তাঁহার সর্বপ্রথম চিত্র 'রাবণ-মন্দোদরী' কেমন অস্পষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নূতন ছবি 'মহাশ্বেতা' অস্পষ্টতা দোষ রহিত, অতিরিক্ত আলোকসম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল তাও নয়। আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মত নয়। বাস্তবিক তাহার মধ্যে এ্যানাটমির জ্ঞান, পারস্‌পেক্‌টিভ এবং ব্যাকগ্রাউণ্ডের আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। মোটের উপর, একসঙ্গে নিসর্গ-চিত্র ও মনুষ্য-চিত্র মিলাইয়া যাহা হয়, ঠিক তাহাই এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্রে সুন্দর ফুটিয়াছিল, প্রকৃতির খেয়ালী-সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।'[১]

চিত্রবিদ্যায় প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তাঁর।

এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য চিত্রবিদ্যা সম্পর্কিত বহু বই তিনি যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁর একাধিক অন্তরঙ্গজনের সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি যে, শরৎচন্দ্র সত্যিই একজন চিত্রশিল্পী ও চিত্ররসজ্ঞ ছিলেন। একবার রেঙ্গুনে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা শুনে সকলেই এই বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো ও টিসিয়ান—এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, টিসিয়ান সবচেয়ে বড় পেণ্টার। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে রেনল্‌ডস ও গেইনসবরোর পরে য়ুরোপে এখন কাদের বেশি নাম—এর উত্তরে তিনি এভারেস্ট মিল ও টার্নারের নাম করেন। তবে ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্টিং-এর চেয়ে শরৎচন্দ্র মানবীয় মূর্তি অঙ্কনের পক্ষপাতী ছিলেন। বলতেন, রীতিমত অ্যানাটমির জ্ঞান না থাকলে হিউম্যান পেণ্টিং ভাল আঁকা যায় না। ছবিখানি হওয়া চাই হুবহু জীবন্ত, তবে তো ছবি

১. ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র : যোগেন্দ্রনাথ সরকার।

কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্র না গান-বাজনায়, না চিত্রাঙ্কনে বেশিদিন নিজেকে নিয়োজিত রাখেন না। মাইকেল যেমন বহু অসমাপ্ত কাব্যের কবি ছিলেন, শরৎচন্দ্রও ঠিক তাই। তবে তাঁর প্রতিভার স্থিরভূমি ছিল কথাসাহিত্য।

॥ নয় ॥

১৯০৭।

শরৎচন্দ্রের জীবনে যেমন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনি একটি অবিস্মরণীয় বৎসর। ঐ বছরে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'বড়দিদি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাস নয়, বড় গল্প। ঐ বছরের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে এর প্রথম কিস্তি বেরুল, কিন্তু লেখকের নাম নেই; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বেরুল দ্বিতীয় কিস্তি, এবারেও লেখকের নাম নেই। কিন্তু যে পড়ল সেই-ই ভাবল, এ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের রচনা। ভারতী-সম্পাদিকা সরলাদেবী তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী, কাজেই এমন অনুমান অসঙ্গত ছিল না। তখন নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, গোড়ার দিকে এর সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং; কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে এর সম্পাদনার ভার অর্পিত হয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের ওপর। ভারতী পত্রিকায় ঐ গল্পটি পাঠ করে তিনি অনুমান করলেন, এর লেখক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তাই তিনি সোজা গিয়ে কবির দরবারে অনুযোগ করে বললেন—আপনি আর উপন্যাস লিখবেন না বলেছেন, অথচ এই তো ভারতীর জন্য লিখেছেন একটি সুন্দর উপন্যাস বিনা নামে।

রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন। বললেন, আমি তো ভারতীতে কিছু লিখি নি, শৈলেশ। লেখাটা একবার দেখাতে পারো আমাকে?

শৈলেশচন্দ্র বৈশাখ সংখ্যা ভারতী একখানি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা তিনি দিলেন কবির হাতে। তিনি পড়লেন কিন্তু বললেন, এ লেখা

তাঁর নয়। তবে যারই হোক, তিনি নিশ্চয়ই শক্তিশালী লেখক! তারপর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতী বেরুল। শেষে আষাঢ় সংখ্যায় গল্পটি যখন শেষ হয় তখন লেখকের নাম হিসেবে ছাপা হলো শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখন, কথিত আছে, রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করেছিলেন: 'বড়দিদি'র লেখক অসাধারণ শক্তিশালী; অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে এঁকে সাহিত্যের আসরে টেনে আনা উচিত।

কিন্তু এই চমকপ্রদ ঘটনাটির একটি নেপথ্য ইতিহাস আছে। সেটি আমাদের জানা দরকার। সেই ইতিহাস এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যাঁর ওপর তখন ভারতীর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তিনি লিখেছেন:

'১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতীর সম্পাদিকা সরলাদেবী লাহোর থেকে কলকাতায় আসেন। সে বছরের ভারতী তখনও ছেপে বেরোয় নি—তিনি এসেছিলেন ভারতী প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে। আমি তখন বি.এ. পাস করে এটর্ণির আর্টিকেল আছি এবং আইন পড়ছি। একদিন দীনেশচন্দ্র সেন[১] এসে আমাকে পাকড়াও করে সরলাদেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বললেন, এর হাতে ভারতীর ভার দিয়ে আপনি লাহোর যেতে পারেন। সরলাদেবী আমার হাতে ভারতীর পরিচালনার ভার দিলেন এবং তখন বৈশাখ মাসের কপি তৈরীর জন্য আমাকে বললেন, একটি মাঙ্গলিক কবিতা এবং একটি ছোট গল্প লিখে দাও। তাঁর হাতে দু'চারটি রচনা ছিল—ইংরাজী ভাষায় লেখা। সেগুলির তর্জমার ব্যবস্থা হল। কিন্তু উপন্যাস চাই!

'সরলাদেবী বললেন, ভারতী রেগুলার না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ কেউই ভারতীর জন্য লেখা দেবেন না।

---

১. 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য' গ্রন্থের যশস্বী লেখক রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট.। এঁরই সহায়তায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন।

আমাকে বললেন উপন্যাস সংগ্রহ করতে। আমার মনে পড়লো শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র কথা। আমি বললাম, উপন্যাস নেই, তবে আমার এক বন্ধুর লেখা বড় গল্প আছে। সে গল্পটি দু'তিন মাস চলতে পারে। অপূর্ব লেখা। সরলাদবী পড়তে চাইলেন। দিলুম তাঁকে পড়তে। পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, চমৎকার! এক কাজ কর, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়—তিন মাসে ছাপাও। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখকের নাম দিও না। সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আষাঢ় সংখ্যায় লেখকের নাম ছাপবে। তাই হল।...তারপর সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কার লেখা। বললুম, ধৈর্য ধরুন, লেখকের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সে বছর আষাঢ় মাসের ভারতী বেরিয়েছিল পূজোর পর এবং সে সংখ্যায় 'বড়দিদি' উপন্যাসের শেষে লেখকের নাম 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' বেশ বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।' নামহীন বড়দিদি বেরুবার পর সেদিনের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আর বিস্ময়ের অবধি রইল না।'

বাংলা সাহিত্য-সংসারে এক নবীন প্রতিভার শুভ আবির্ভাব সেদিন এইভাবেই ঘটেছিল। এই ঘটনার প্রায় চার দশক আগে ঠিক এমনিভাবেই ঘটেছিল আর একটি নবীন প্রতিভার আবির্ভাব। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ঠিক এমনি চমকের সৃষ্টি করেছিল সেদিন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলা সাময়িক পত্রিকা দু'চারখানির বেশি ছিল না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য', নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' আর 'ভারতী'—উল্লেখযোগ্য এই তিনখানি মাসিক পত্রিকাই তখন লেখকদের সম্বল ছিল। ভারতীর গৌরব এই যে, ভাবীকালের অপরাজেয় কথাশিল্পীকে সেই-ই প্রথম তার বুকে স্থান দিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বড়দিদি গল্পটি 'প্রবাসী' থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কারণে শরৎচন্দ্র প্রবাসীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না কোনদিন ; বলতেন কাগজটি অপাঠ্য।

রেঙ্গুনে বসে শরৎচন্দ্র সব খবর পেলেন।

খবর পেলেন বড়দিদির দৌলতে একদিনেই বাংলার সুপরিচিত লেখক হয়ে উঠেছেন।

আরো পাঁচটা বছর কেটে গেল বাঁধা রুটিনের কাজের মধ্য দিয়ে —অফিস যাওয়া, খাওয়া আর লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করা। স্থানীয় বার্নার্ড ফ্রি লাইব্রেরী থেকে অনেক ইংরেজী সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা বই সংগ্রহ করে তিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। 'পড়েছি বিস্তর, কিন্তু সে তুলনায় লিখেছি কম'—শরৎচন্দ্রের এই কথাটি বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। রেঙ্গুনে কর্মজীবনে তিনি যেমন অবিন্যস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতেন, বন্ধুদের নিয়ে ছুটির দিনে হৈচৈ করতেন, তেমনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে নানা বিষয়ের পড়াশুনা করতেন। কেতাবী বিদ্যার অভাব তিনি এইভাবেই পূরণ করেছিলেন। ভাগলপুরে থাকতে পড়ার যে অভ্যাসটা তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে রেঙ্গুনে আসার পরেও তাঁর সেই অভ্যাসটা সমান ভাবেই বলবৎ ছিল। এইভাবেই তো শরৎচন্দ্র তৈরী করেছিলেন তাঁর সাহিত্য-জীবনের সুদৃঢ় বনিয়াদ।

১৯১২। অক্টোবর মাস।

এক মাসের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এলেন।

এই সময়ে ভবানীপুর থেকে একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা বের করবার উদ্যোগ-আয়োজন করছিলেন একজন সাহিত্যরসিক ব্যক্তি। তাঁর নাম—ফণীন্দ্রনাথ পাল। এবার তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। ফণীবাবুই এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন।

—একটা কাগজ বের করব, তাতে আপনাকে লেখক হিসেবে পেতে চাই।

—আমি তো নাম-করা লেখক নই।

—কিন্তু আপনি ভাল লেখেন।

—কে বললে?

—'বড়দিদি'-ই তো তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

—কিন্তু এখন তো আমি কিছুই লিখি না।

—শুনেছি আপনার লেখা অনেক গল্প আছে তাই দিন না, আমি ছাপব।

—সেসব তো কাঁচা হাতের লেখা। কাগজের নাম কি ?

—যমুনা। বলুন, যমুনা আপনাকে লেখক হিসাবে পাবে।

—উত্তম। প্রতিশ্রুতি দিলাম।

ঠিক এই সময়েই প্রখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে (স্বনামধন্য নাট্যকার ডি. এল. রায়) সম্পাদক করে 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়ে একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা বের করবার আয়োজন করছিলেন। এই পত্রিকার সঙ্গে গোড়া থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের সেই বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। এই প্রমথনাথকে রেঙ্গুন থেকে লেখা একাধিক পত্রে শরৎচন্দ্রের তখনকার সাহিত্য-জীবনের অনেক কথা জানা যায়। 'ভারতবর্ষ'ও তাঁকে একজন লেখক হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বড়লোকের কাগজ, তার ওপর নাম-করা সম্পাদক, শরৎচন্দ্র তাই সহসা এখানে লেখা দিতে স্বীকৃত হন নি। যমুনার সম্পাদক বিত্তবান ছিলেন না, তবে তিনি শরৎচন্দ্রের লেখার একজন অনুরাগী ছিলেন ও শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই না তিনি তাঁকে লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর এই মহানুভবতা সেই নূতন পত্রিকাটির পক্ষে যেমন হিতকর হয়েছিল, তেমনি 'যমুনা'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক তাঁর সাহিত্য-জীবনের পথ অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল। 'যমুনা'-ই তো তাঁকে সর্বপ্রথম সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত করে তুলেছিল। যমুনার বুকেই ফুটে উঠেছিল শরৎ-চন্দ্রিমা।[১] তাই যমুনার কথা না বললে তাঁর সাহিত্য-

১. যমুনা ও ভারতবর্ষ পত্রিকা দুটি প্রায় একসঙ্গেই প্রকাশিত হয়। ১৯১৩, আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যার কিছু অংশমাত্র সম্পাদনা করেই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। তখন জলধর সেন এর সম্পাদক হন।

জীবনের অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। তাঁর লেখার সুখ্যাতি তো এই নূতন কাগজে লিখেই হয়েছিল।

'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গেও সম্ভবতঃ এই সময়ে শরৎচন্দ্রের আলাপ-পরিচয় হয়ে থাকবে এবং তিনিও তাঁর পত্রিকায় এই নবীন লেখকের গল্প প্রকাশ করতে সম্মত হয়ে থাকবেন। কাশীনাথ, বোঝা, অনুপমার প্রেম, হরিচরণ প্রভৃতি ভাগলপুরে থাকার সময় লেখা গল্পগুলি 'যমুনা' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তার 'বিরাজ বৌ' এবং তখন থেকে শরৎচন্দ্রের বেশিরভাগ লেখাই এই কাগজে প্রকাশিত হয়ে একদিকে যেমন এই নূতন পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, তেমনি অন্য-দিকে উদীয়মান লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্রকেও সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই পত্রিকাই শরৎচন্দ্রের বহু বিখ্যাত ও বহু বিতর্কিত উপন্যাস 'চরিত্রহীন' ছাপতে অসম্মত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার আগে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের প্রথম অংশের পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষ পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় ভারতবর্ষ প্রকাশের উদ্যোগপর্ব চলছিল; দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রকে ভারতবর্ষের লেখকরূপে পাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বন্ধু প্রমথনাথ এই আগ্রহের কথা শরৎচন্দ্রকে জানালেন। পাণ্ডুলিপি এলো, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নূতন কাগজে তা প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না। চরিত্রহীন বাতিল হয়ে ফিরে আসে এবং পরে যমুনায় বেরুতে আরম্ভ করে।[১] এই প্রত্যাখ্যানের জন্য শরৎচন্দ্র মনে যে আঘাত পেয়েছিলেন, সেটা তখনকার অনেক সাহিত্যিক বন্ধুর

১. শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসটি যমুনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি; ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস থেকে আরম্ভ হয়ে মাত্র আংশিকভাবে ছয় সাত মাস বেরিয়েছিল। চার বছর পরে 'চরিত্রহীন' সম্পূর্ণ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়।

কাছে প্রকাশ না করে পারেন নি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর পত্রিকায় এটি প্রকাশ করতে পারবেন না বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর ব্রহ্মপ্রবাস স্মরণীয় হয়ে আছে এই উপন্যাসটির জন্য।

এর গোড়ার অর্ধেকটা তিনি লিখেছিলেন অল্প বয়সে।

তারপরে ওটা পড়েছিল। শেষ করবার কথা মনেও ছিল না, তার প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন যখন হলো তখন শরৎচন্দ্র বইটি সম্পূর্ণ করেন রেঙ্গুনে বসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চরিত্রহীনের প্রথম পাণ্ডুলিপি সবটাই আগুনে পুড়ে যায়। ১৯১২সালের মার্চ মাসে লেখা একটি পত্রে শরৎচন্দ্র বন্ধুকে জানালেন: 'প্রমথ, আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই—লাইব্রেরী ও চরিত্রহীন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। ...আবার শুরু করিব। এখন উৎসাহ পাই না। চরিত্রহীন ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।'

শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ পত্রিকায় চরিত্রহীন যখন ছাপা হলো না তখন রেঙ্গুন থেকে একটি পত্রে শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রমথনাথকে যা লিখেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। এই চিঠির তারিখ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। তিনি লিখছেন: 'আমি জানিতাম ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না। তবে, এ সম্বন্ধে আমার এই একটু বলিবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া মেসের ঝিকে আরম্ভেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই। অনেক বিশেষজ্ঞ ও-বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে চাহিয়াছ। এ একটা **scientific psychological and ethical novel :** আর কেউ এরকম করিয়া বাংলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এতেই ভয় পেলে ভাই? কাউণ্ট টলস্টয়ের 'রিজারেকশন' পড়েছ কি? **His best book** একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে,

আমাদের দেশে এখনো অতটা art বুঝিবার সময় হয় নাই সে কথা সত্য।'

আসল কথা, শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মশক্তির ওপর আস্থাবান ছিলেন।

এই উপন্যাসের সার্থকতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার কি রকম সুনিশ্চিত ছিলেন তা জানা যায় যমুনা-সম্পাদককে লেখা একটি চিঠি থেকে। এই চিঠির তারিখ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ ; তখনো পর্যন্ত যমুনায় চরিত্রহীন আত্মপ্রকাশ করে নি। শরৎচন্দ্র লিখছেন ঃ

'চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপ্টার লেখা আছে ; বাকীটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপ্টার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না। তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভাল হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral হোক, immoral হোক, লোকে যেন বলে, হ্যাঁ, একটা লেখা বটে। আর এতে আপনার বদনামের ভয় কি ? বদনাম হয়তো আমার। তাছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি ? 'চরিত্রহীন' এর নাম—তখন পাঠককে তো পূর্বাহ্ণেই আভাস দিয়াছি, এটা সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুল পাঠ্যও নয়।...তাছাড়া ভাল বই, যাহা art হিসেবে psychology হিসেবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই ?'

আসল কথা, এর নাম দেখে আর গোড়াটা পাঠ করে সেদিন সবাই অমন আঁৎকে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন ঃ 'আমি একজন Ethics-এর student—সত্য student, Ethics বুঝি এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না।...ওটা বটতলার বই নয়।' এইরকম আত্মবিশ্বাস নিয়েই তো সেদিন বাংলার সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। যমুনাতে চরিত্রহীন পাঠ করে একশ্রেণীর রুচিবাগীশ লোক তার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত

করে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন অটল। রেঙ্গুনে বসে যখন তিনি যমুনা-সম্পাদকের কাছ থেকে একদিন একটি টেলিগ্রাম পেলেন: 'Charitraheen creating alarming situation' অর্থাৎ, 'আপনার চরিত্রহীন ঝড় তুলেছে', তখনও তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাসে কি রকম অবিচল ছিলেন তা জানা যায় ঐ সময়ে ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা এই পত্রটি থেকে। এই চিঠির তারিখ ১০ই মে, ১৯১৩। তখন যমুনায় উপন্যাসটি বেরুতে আরম্ভ করেছে। তিনি লিখছেন:

'শুনিতেছি, চরিত্রহীন-এ মেসের ঝি থাকাতে রুচি নিয়ে হয়তো একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশি পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা art-এর ধার ধারে না তারা হয়তো নিন্দা করিবে। কিন্তু নিন্দা করিলেও কাজ হবে—এটা একটা সম্পূর্ণ scientific ethical novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'ভারতবর্ষ'-গোষ্ঠীর লেখকরাই তখন চরিত্রহীনের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তাইতো দেখা যায় বন্ধু প্রমথনাথকে একটি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখছেন: 'আমার চরিত্রহীন তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কিআছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে কোন কারণেই হোক, বাসায় ঝি-বৃত্তি করিতেছে (character unquestionable নয়) আর একজন ভদ্র-যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে, অথচ শেষ পর্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' উপন্যাসে ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই। আর আমার চরিত্রহীন যত অপরাধে অপরাধী।...যাই হোক, আমি এখনও স্বীকার করি না যে চরিত্রহীনে একবর্ণও দুর্নীতি আছে। কুরুচি থাকিতে পারে, কিন্তু যা পাঁচজনে বলিতেছে তা

নাই। যাহার ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে, সে পড়িবে না।'[১]

কিন্তু গ্রন্থাকারে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হবার পরে দেখা গেল যে এই বহুবিতর্কিত উপন্যাসটিই ছিল সেদিনের পাঠকসমাজে বহুল পঠিত ও সমাদৃত বই। শরৎপ্রতিভার বিজয়-বৈজয়ন্তী এই 'চরিত্রহীন'। যথাস্থানে আমরা এর সাহিত্যিক মূল্য আলোচনা করব। চরিত্রহীন-প্রসঙ্গ এখন থাক; শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 'যমুনা' তথা এর সম্পাদকের সম্পর্কের বিষয়টা আর একটু আলোচনা করা যাক। নবজাত এই পত্রিকাটির কার্যালয়ে তাঁকে প্রথমবার সন্দর্শন করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন:[২]

'একদিন বৈকাল বেলায় যমুনা-অপিসে বসে বসে রচনা নির্বাচন করছি, এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগা ও নাতি-দীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উস্কোখুস্কো চুল, একমুখ দাড়ি-গোফ। পরণে আধ-ময়লা জামাকাপড়, পায়ে চটি জুতো। সঙ্গে একটি বাচ্চা লেড়ী কুকুর। লেখা থেকে মুখ তুলে শুধোলুম, কাকে দরকার?—যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।—ফণীবাবু এখনো আসেন নি।—আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বসবো কি?

'চেহারা দেখে মনে হলো লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম। প্রায় আধঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুককে দেখেই সসম্ভ্রমে ও সচকিত কণ্ঠে বললেন, এই যে শরৎবাবু! কলকাতায় এলেন কবে? ঐ বেঞ্চিতে বসে আছেন কেন?

যমুনায় উপন্যাসটি সম্পূর্ণ বের না হবার কারণ তখন শরৎচন্দ্র ঐ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী ও শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি। ছোটদেরও প্রিয়তম লেখক ছিলেন ইনি। যমুনা-পত্রিকার গোড়া থেকেই তিনি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ স্থানীয়দের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন।

আগন্তুক মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, ওঁর হুকুমেই এখানে বসে আছি।

'ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, সে কি! হেমেন্দ্রবাবু, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেন নি? অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে স্বীকার করলুম, আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী। শরৎবাবু সকৌতুকে হেসে উঠলেন।'

কথা-সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শরৎচন্দ্রের নাম জনসাধারণের মধ্যে তখনো পর্যন্ত খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে নি। যমুনা পত্রিকাতে সবেমাত্র তাঁর কয়েকটি গল্প—রামের সুমতি, পথনির্দেশ ও বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি — প্রকাশিত হয়েছে এবং তার ফলেই তিনি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই গল্প তিনটিই গল্পকার হিসেবে শরৎচন্দ্রের খ্যাতির পথ সেদিন কিছুটা প্রশস্ত করে দিয়েছিল। তারপর এই পত্রিকায় তাঁর চরিত্রহীনের কিছু অংশ পাঠ করে পাঠকদের মধ্যে জেগে উঠতে থাকে বিপুল আগ্রহ। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ—'নারীর মূল্য'। তাঁর দিদি অনিলাদেবীর নামেই এটি প্রথম বেরিয়েছিল এবং এই প্রবন্ধটিও সেদিন পাঠক-সমাজে তুমুল সাড়া জাগিয়েছিল। নারী-দরদী শরৎচন্দ্রের এটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন:

'যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল—একটা উচ্চাশা ছিল যে, 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়ে একটা volume তৈরী করব। যেমন সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখের মূল্য, নরের মূল্য, নারীর মূল্য,—এইরকম মূল্য-বিচার। তারই ভূমিকা হিসেবে তখনকার কালে নারীর মূল্য লিখি। সেটা বহুদিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে। পরে যমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই দ্বাদশ মূল্য আর শেষ করতে পারি নি, কারণ অভাব। আমার জমিদারী নেই, টাকা নেই, তখন এমন কি দু'বেলা ভাত জোটাবার পয়সা পর্যন্ত ছিল না।'[১]

১. কোন্নগর পাঠচক্রে সভাপতির অভিভাষণ: বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৪২।

সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুঘরের অন্তঃপুরচারিণী নারীর জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চনা-নিগ্রহ অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সকল উপন্যাস ও গল্পে নারী-চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। পুরুষ শাসিত হিন্দুসমাজে নারীর দুঃখের কথা তাঁর আগে আর কোন লেখক এমন গভীরভাবে অনুভব করেন নি যেমনটি করেছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি যেন এই বঞ্চিতা ও লাঞ্ছিতাদের জীবনের কথা বলবার জন্যই লেখনী ধারণ করেছিলেন। উপন্যাসে বা গল্পে এই বিষয়ে যা বলবার তা তিনি সুন্দরভাবেই বলেছেন। কিন্তু নারীর প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করবার জন্য তিনি 'নারীর মূল্য' শীর্ষক যে গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন অনিলাদেবী এই ছদ্মনামে সেটি বিশেষ-ভাবেই আমাদের প্রণিধ্যানযোগ্য। স্বল্পায়তন এই বইটি যেন নারীর জীবনবেদ। এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে বহু ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করতে হয়েছিল। এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য: মানুষের নৈতিক উন্নতি-অবনতি একান্তভাবেই নির্ভর করে সমাজে নারীর স্থান ধার্য করার ওপর।

'যমুনা' পত্রিকাটি শরৎচন্দ্রের কতখানি প্রিয় ছিল তা জানা যায় রেঙ্গুন থেকে ফণীন্দ্রনাথ পাল ও বন্ধু প্রমথনাথকে লেখা চিঠিপত্র থেকে। বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন: 'ভারতবর্ষ' যেমন তোমার, 'যমুনা' তেমনি আমার। যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, একটু সেদিকে নজর রেখো ভাই। ফণীকে আমি স্নেহ করি। তার কাগজ আমার কাগজ। আমি একরকম প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ছোট্ট যমুনাকে বড় করিব।' আর 'যমুনা' সম্পাদককে লিখেছিলেন: 'আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না। আমি নিয়মিত যমুনা ছাড়া আর কোথাও লিখিব না।' (১৯১২) তখন অন্য কাগজ থেকেও অনুরোধ আসছে লেখার জন্য। তথাপি শরৎচন্দ্রের যমুনা-প্রীতি কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর একটি চিঠিতে লিখলেন: 'আমাকে অনেকেই বলেন বড় কাগজে লিখতে, কেননা, বেশি নাম হবে। আপনার ছোট

কাগজ—ক'টা লোকেই বা পড়ে? অবশ্য এ-কথা আমিও স্বীকার করি।······আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি —সেইটাকেই বেশি লাভ মনে করি। এখন ইতরের মত অন্যরকম করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।' (২৮-৩-১৯১৩) অপর একটি পত্রে লিখছেন: 'আমার ও আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়।······যমুনার উন্নতি আমার সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য, তারপরে আর কিছু।······ তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হতে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাগজে লেগে থাকব।' (৩-৫-১৯১৩)

এই প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছিলেন। তাঁর লেখ্যর জন্যই তো যমুনার প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ; নিজে তো লিখতেনই, এমন কি তাঁর ভাগলপুরের বন্ধুদেরও এই কাগজে লিখবার জন্য অনুরোধ করতেন। কিন্তু যমুনার তিনি শুধু লেখক ছিলেন না—ছিলেন এর একজন যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপদেষ্টা। গল্প ও প্রবন্ধ তিনি নিজেই নির্বাচন করে দিতেন। ঐগুলি সম্পাদক ডাকযোগে শরৎচন্দ্রের কাছে রেঙ্গুনে পাঠাতেন। তিনি তাঁর বহুমূল্য সময় নষ্ট করে সেগুলি পাঠ করে নির্বাচন করে দিতেন। শরৎচন্দ্র যে একজন বড়দরের ক্রিটিক ছিলেন তা এর থেকেই জানা যায়। যমুনাকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন ; এই ভালবাসার সঙ্গে অর্থের কোন প্রশ্ন ছিল না। ভারতবর্ষ পত্রিকা তো তখন তাঁকে টাকা দিয়ে কিনতেই চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। এই শরৎচন্দ্র—মানুষ-দরদী শরৎচন্দ্র। তথাপি যমুনাকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি ; স্বনামে-বেনামে অনেক লেখাই তিনি এতে লিখেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ফল হয় নি। এই পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ছিল। তথাপি এরই বুকে প্রথম ফুটেছিল শরৎ-চন্দ্রিমা। এ বড় কম গৌরবের কথা নয়।

॥ দশ ॥

এইবার শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতবাসের সেই অধ্যায়টি আলোচনা করব যাকে কেন্দ্র করে কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে সেদিন প্রচারিত হয়েছিল। সেইসব অর্ধ সত্য ও অর্ধ মিথ্যা জনশ্রুতির ফলেই তো এত বড় একজন প্রতিভাবান লেখককে চিরজীবন সজ্জন সমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের প্রেমজীবন তথা তাঁর বিবাহিত জীবনের কথাই আমরা এই অধ্যায়ে বলছি।

বাংলাদেশ ত্যাগ করে যখন তিনি বর্মা মুলুকে যান তখন শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। ভাগলপুরে তিনি বাস করেছেন সতেরো-আঠারো বছর বয়স থেকে। সেই সময়েই তাঁর বয়ঃসন্ধির পূর্ণকাল। বয়ঃসন্ধির যুগ প্রতিটি মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ —প্রতিভাধর লেখক বা শিল্পীর জীবনে তো বটেই। এই সময়ে কোন নারীকে ঘিরে, দেহ-নিরপেক্ষভাবেই যৌনজীবন ও প্রেমজীবন গড়ে ওঠে। মানুষের জীবনে, বিশেষ করে শিল্পীর জীবনে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ এর ফলেই মানুষের আবেগ-অনুভূতি পরিণতি লাভ করে এবং পরে এর থেকেই তাঁর রসানুভূতি ও কান্তিবোধ সৃষ্টির পথে প্রবাহিত হয়। প্রতিভা কোনদিনই সমাজ রীতিনীতির একান্ত বশীভূত হয়ে ভাল ছেলের মত থাকে না। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এর বড় দৃষ্টান্ত ছিলেন। শরৎচন্দ্রই বা কেন এর ব্যতিক্রম হতে যাবেন?

ভাগলপুরে থাকতেই তিনি বাল্য-প্রণয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন।

যে বিধবা তরুণীকে উপলক্ষ করে এই হৃদয়-দৌর্বল্য প্রকাশ পায় তিনিই ছিলেন শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রথম নায়িকা। নাম—নিরুপমা দেবী ওরফে বুড়ী। তাঁর এক জীবনীকার প্রদত্ত বিবরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।[১] সেই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই সময়ে

১. শরৎচন্দ্র: গোপালচন্দ্র রায়।

নিরুপমা দেবীকে ঘিরে তাঁর জীবনে প্রেমের বিদ্যুৎচমক ঘটে। এই প্রেমের মধ্যে ছিল ঈপ্সিতকে না-পাওয়ার বেদনা। এই বেদনাই তাঁর সমস্ত জীবনে অনুক্ষণ নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। নিরুপমা বাল-বিধবা, হিন্দু বৈদিক ব্রাহ্মণঘরের আচারনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণা বিধবা। বৈধব্যপ্রাপ্তির পর ভাগলপুরে তিনি তাঁর দাদাদের সংসারে থাকতেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শরৎচন্দ্রের এই উদ্বেল প্রেম ও যৌনচেতনা তাঁর সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে তরুণী বিধবা চরিত্রগুলিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। বিধবার মর্মবেদনা তাই শরৎসাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে। জীবনের এই প্রথম প্রেম ও তার ব্যক্তিগত বহির্মুখী জীবনের গ্লানি ও লাঞ্ছনা তাঁর চরিত্রগুলির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বিধবা নিরুপমা দেবীর প্রতি তাঁর উদ্বেল প্রেম খণ্ডিত হয়েছিল।

প্রাচীনপন্থী গৃহের বালবিধবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার অবাধ সুযোগও ছিল না। যদি কোনও হৃদয়-দৌর্বল্য সেই বালবিধবার দিক থেকে এসেও থাকে, তবে তা আচার, ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মজীবনের সংযম ও সামাজিক জীবনের নিষেধে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। অনুমান করা যেতে পারে, এই বাধানিষেধ কঠিন প্রাচীরে প্রহত হয়ে শরৎচন্দ্রের প্রাক্-যৌবনের উন্মুখ উৎসুক ভালবাসা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতা ও বেদনাই তো ছিল তাঁর ভাগলপুর-জীবনের পর্বে, শিল্পী-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। বড়দিদির মাধবী, চন্দ্রনাথের গৃহত্যাগিণী সুলোচনা, অনুপমার প্রেমের অনুপমা—এরা সকলেই বিধবা। বোঝায় নলিনী, চন্দ্রনাথে সরযূ, দেবদাসে পার্বতী—এদের প্রত্যেকের জীবনের প্রেম খণ্ডিত। এই খণ্ডিত প্রেম তাদের জীবনকে ব্যথিত করেছে নানাভাবে, নানা দিক থেকে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যে 'পরের মুখে ঝাল-খাওয়া কল্পনা' নয়, সত্যিকার সাহিত্য তার রহস্যটা তো এইখানেই। তাঁর নিজের অকপট স্বীকৃতির মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে জীবনে তিনি ভালবেসেছেন,

কলঙ্কও কিনেছেন, দুঃখের ভার বয়েছেন আর এইভাবেই তো তিনি সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন। তিনি নীলকণ্ঠ সাহিত্যিক, তাই তাঁর বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র চিরকালই অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন এবং এই ঔদাসীন্যের ফলে বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত হয়ে তাঁর জীবন ও চরিত্রকে রহস্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। তবে এ কথাও সত্য যে, শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা এবং অপপ্রচারের সুযোগ দিয়েছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ স্থানীয়দের কাছে এই গ্রন্থের লেখক শুনেছেন, 'শরৎচন্দ্র চিঠিপত্রে এবং মুখে সত্য-মিথ্যায় করে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের এমন সব কাহিনী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলে গেছেন, যাতে করে তিনি নিজেই তাঁর সম্বন্ধে অপপ্রচারের অনেকটা অবকাশ দিয়ে গেছেন।' আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে।

শরৎচন্দ্রের প্রেমজীবনের দ্বিতীয় নায়িকা গায়ত্রী। অপরূপ সুন্দরী।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল বাস করেছিলেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার; এই কারণে তিনি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি একটি গ্রন্থে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হলো গায়ত্রী-ঘটিত ব্যাপার। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরকম।

কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্রাহ্মণ-কন্যা গায়ত্রী। বাল্যে মাতৃহারা কৈশোর ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সে তার বিয়ে হয়। বিয়ের অল্পদিন পরেই সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। পিতা বৃদ্ধবয়সে বিয়ে করে তারই সমবয়সী বিমাতাকে গৃহে আনায় তার দুঃখের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। বিমাতার নির্যাতনে গায়ত্রীর জীবন-

১. ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র : গিরীন্দ্রনাথ সরকার।

ভার যখন দুর্বিসহ বোধ হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে এক প্রতিবেশী যুবকের প্ররোচনায় ভুলে সে গৃহত্যাগ করে তারই সঙ্গে। দুজনে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে একদিন রেঙ্গুনে এসে উপস্থিত হয়। গায়ত্রীর সিঁথিতে তখন নূতন সিঁদুরের চিহ্ন। দুজনে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে স্থানীয় বাঙালী সমাজের নেতা কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে; ব্রহ্মদেশে নবাগত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁর বাড়িতে আশ্রয়লাভ করত। এঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও অশেষ গুণসম্পন্না নারী ছিলেন। মৃণালিনী দেবীর কাছেই পলাতকা গায়ত্রী স্বীকার করে যে, তার সঙ্গের যুবকটি তার স্বামী নয়, প্রতিবেশী। তখন সেখানে তাদের আর স্থান হয় না. তখন শরৎচন্দ্রই তাদের জন্য নিজ পল্লীর কাছাকাছি একটা বাড়ি ভাড়া করে দেন। তাঁর ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর মানুষকে চিনবার অসামান্য ক্ষমতা। এদের দেখেই তিনি ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। সালংকারা ও সুবেশা গায়ত্রী তখন বিধবার বেশ ধারণ করেছে।

পরবর্তী ঘটনার সবিস্তার বর্ণনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। যে ভদ্রবেশী যুবক বিধবা গায়ত্রীকে বের করে এনেছিল তাকে রেঙ্গুন ত্যাগ করে চলে আসতে হয়। গায়ত্রী রেঙ্গুনেই থেকে গেল। তখন থেকেই গায়ত্রীর প্রতি সমাজ-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল যুবক শরৎচন্দ্রের আগেকার সেই আন্তরিক শ্রদ্ধাভাব ক্রমে অন্ধ ভালবাসায় পরিণত হতে থাকে। অতঃপর অনিন্দ্য-সুন্দরী গায়ত্রী শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ধনী কাঠের ব্যবসায়ীর দৃষ্টিপথে আসেন। তিনি তাকে আয়ত্ত করবার জন্য কৌশল-জাল বিস্তার করলেন। শরৎচন্দ্র সমস্ত ব্যাপার শুনে একটু দুশ্চিন্তিত হলেন—তাঁর অন্তরের আশা ও আনন্দ একেবারে নিভে যেতে বসল। তারপর গায়ত্রীকে উপলক্ষ করে শশাঙ্ক ও শরৎচন্দ্র ওসমান ও জগৎসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অবশেষে এই দুজন প্রণয়মুগ্ধের কবল থেকে উদ্ধার পাবার আশায় গায়ত্রী ফিরে আসে কুঞ্জবাবুর আশ্রয়ে। পরে তিনি মেয়েটিকে লক্ষ্ণৌতে তার মেসোমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। শরৎচন্দ্র তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন; বলেছিলেন, বিধবা-বিবাহে দোষ নেই।

পরবর্তীকালে গায়ত্রী-ঘটিত এই রোমাঞ্চকর ঘটনাটিকে তাঁর ভাগ্যের একটা বড় রকমের বিড়ম্বনা বলে উল্লেখ করতেন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের বিবাহিত জীবনে প্রথমারূপে যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম শান্তিদেবী।

রেঙ্গুনে ছন্নছাড়া এই উচ্ছৃঙ্খল মানুষটির জীবনে ইনি কতটা শান্তি আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তার কোন ইতিবৃত্ত নেই। না থাকাই সম্ভব, কারণ বিয়ের পর ইনি জীবিত ছিলেন মাত্র দু'বছর—ঐ দুটি বছরই শরৎচন্দ্র এই নবপরিণীতাকে নিয়ে প্রবাসে একটি শান্তি নীড় রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। শান্তিদেবী তাঁরই স্বজাতীয় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেন: এই বিয়ের প্রসঙ্গে তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধু লিখছেন:

'শরৎচন্দ্র স্বজাতীয় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনে তিনি বেশিদিন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। যৌবনে তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্বপ্নবিলাসী শরৎচন্দ্রের প্রাণে ছিল অপূর্ব প্রেমের ভাণ্ডার, তিনি তাঁহার সমস্ত খুলিয়া দান করিয়াছিলেন তাঁহার স্ত্রী শান্তিদেবীকে। কিন্তু ভবিষ্যতের বিধান অন্য প্রকার থাকায় ঘটনা অন্যরূপ হইল। বিধির বিপাকে বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্লেগ-রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন।'[১]

এই ঘটনা যখন ঘটে তখন স্ত্রীর চিকিৎসা অথবা মৃত্যুর পর তার সৎকারের জন্য স্থানীয় সৎকার সমিতির সাহায্য নিতে হয়েছিল। কারণ ঐ সময়ে তিনি সম্ভ্রান্ত সমাজের ত্রিসীমানা থেকে অতি সামান্য একটি কদর্য পল্লীতে বাস করতেন—সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না

১. ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র: গিরীন্দ্রনাথ সরকার

অথবা ভদ্রপল্লীর ভদ্রজনের সঙ্গে তাঁর মেলামেশাও ছিল না। কাজেই তাঁর এই বিয়ের খবরটা তাঁদের কেউই রাখতেন না। শরৎচন্দ্রের অপর একজন জীবনীকার তাঁর এই প্রথম বিবাহ সম্পর্কে এইরকম একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

'পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় এই সময় শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় ব্রহ্মদেশে একটি স্বজাতীয় কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি তখন রেঙ্গুনের যে বাড়িতে বাস করতেন, তার নীচের তলায় একজন মেকানিক বা কলকব্জার মিস্ত্রী ছিল। জাতিতে সে বাঙালী—চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, বিপত্নীক। সংসারে একটিমাত্র বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিল না। চক্রবর্তীর চরিত্রে ছিল অনেক দোষ। সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে ফিরে এসে বাড়িতে সে এক আড্ডা বসাতো। সেখানে জুটতো যত নেশাখোর মাতাল গেঁজেল কারিগর ও বদমাইসের দল। এরাই ছিল তার বন্ধু ও সঙ্গী। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলতো তাদের হুল্লোড়। মেয়েটিকে খাটতে হতো এইসব পাষণ্ডদের নানারকম ফাইফরমাস। বাবাকে রেঁধে খাওয়ানো, বাসন মাজা প্রভৃতি সংসারের যা কিছু কাজ সবই করতো এই মেয়েটি। কোন বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি হলেই চক্রবর্তী দিত মেয়েকে নির্মম প্রহার।'

নরেন্দ্রদেবের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, চক্রবর্তী ঘোষাল নামে তারই এক বন্ধুর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হয় ও তার কাছ থেকে এজন্য কিছু টাকাও নেয়। লোকটি মাতাল, দুশ্চরিত্র ও বয়সেও অনেক বড়। এই ভয়েই মেয়েটি এক সন্ধ্যায় পালিয়ে এসে শরৎচন্দ্রের ওপরের ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এই বস্তীতে তাঁকে সবাই দাদাঠাকুর বলে সমীহ করতো। সেদিন অনেক রাত্রে ফিরে এসে

১. শরৎচন্দ্র : নরেন্দ্র দেব। বিশিষ্ট কবি ও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ মহলের একজন। এঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবীরও কবি-খ্যাতি আছে। এই দেব-দম্পতিকে শরৎচন্দ্র খুবই স্নেহ করতেন।

দেখেন ঘর ভিতর থেকে বন্ধ, দরজায় অনেক ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চক্রবর্তীর মেয়ে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে তখনও, চোখ দুটি জলে পরিপূর্ণ। তার কাছে সব কথা শুনে শরৎচন্দ্র মেয়েটিকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভয় নেই, আমি এর বিহিত করব। তিনি পরের দিন চক্রবর্তীকে অনেক করে বোঝালেন, কিন্তু লোকটি সে পাত্রই নয়। অবশেষে লোকটি তাঁকে ধরে বসলো ও গরীবের মেয়েটিকে বিয়ে করে তার জাতকুল রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানালো।

'অগত্যা শরৎচন্দ্রকেই নিতে হয়েছিল সেই মেয়েটির ভার। তাকে নিয়ে তাঁর দিন সুখেই কাটছিল। একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও ফিরছিল তাঁর পাছে পাছে। প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিল—তাঁর পত্নী, পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। কোমল হৃদয় শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় অধীরভাবে কেঁদেছিলেন। গিরীন্দ্রবাবু এই বিপদে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।'

এই মৃত শিশুপুত্রের স্মৃতি শরৎচন্দ্রের মনে চিরকাল জাগরূক ছিল। তাঁর জীবনে নিয়তির পরিহাসের যেন শেষ ছিল না; ভাগ্য চিরকালই তাঁর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি করেছে। ভাগ্যক্রমে যদিবা একটি উত্তরাধিকারী লাভ করেছিলেন প্রথম বিবাহের ফল হিসেবে, তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্বল্পায়ু হলো। শিল্পীর জীবনের এই আঘাত ভাষায় বর্ণনা করবার নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার মত। তারপর তাঁর ভাগ্যে আর পুত্রলাভ ঘটে নি। তাইতো তাঁর দরদী হৃদয়ের সমস্ত দয়ামায়া মানবেতর প্রাণীর প্রতি অজস্রধারায় বর্ষিত হতো। তাঁর প্রিয়তম কুকুর ভেলি-ই তার একটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পীর জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল এই ভেলি। সেই-ই তাঁর অপত্যস্নেহের অধিকারী হয়েছিল। এর কথা পরে বলব।

শরৎচন্দ্রের জীবনে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীরূপে এলেন হিরণ্ময়ী দেবী।

তাঁর এই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করা নিয়ে নানাজনে নানা কথা এপর্যন্ত লিখেছেন ও বলেছেন। কেউ বলেন এটা নাকি আদৌ সামাজিক বিয়ে ছিল না; হিরণ্ময়ী দেবী ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী; আবার কেউ বলেন, না, ইনি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীই ছিলেন। কথিত আছে, শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে বাংলাদেশে এসে আত্মীয়স্বজন ও ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখাশুনা করে আবার ফিরে যেতেন রেঙ্গুনে। 'এমনি এক আসা-যাওয়ার মাঝে হিরণ্ময়ী দেবী নামে একটি অসহায়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীকে তিনি দ্বিতীয়বার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মেদিনীপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস অধিকারীর কন্যা।'

শরৎচন্দ্রের আত্মীয়দের মতে এই বিবাহ নাকি রেঙ্গুনেই হয়েছিল। তাঁদের বিবরণ অনুসারে 'হিরণ্ময়ী দেবীর বাপের বাড়ি মেদিনীপুর জেলায় শালবনীর কাছে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কৃষ্ণ চক্রবর্তী। হিরণ্ময়ী দেবীর অতি শৈশব অবস্থাতেই তাঁর মা মারা যান। কৃষ্ণবাবুর এক বন্ধু রেঙ্গুনে থাকতেন। সেই সূত্রেই স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে কৃষ্ণবাবু কন্যাকে নিয়ে রেঙ্গুনে যান। সেখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং এই পরিচয়ের ফলেই কৃষ্ণবাবু রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। তখন হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর।'

শরৎচন্দ্রের একজন বিশেষ স্নেহভাজন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'আমি নিজে বহুদিন পূর্বে একবার দাদাকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিল? তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মেদিনীপুরে তিনি যখন ছিলেন, তখন এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক অসুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করে তিনি ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করেছিলেন।...বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিল, রেঙ্গুনে না এখানে? তিনি বললেন যে, তিনি মেদিনীপুরের মেয়ে; দাদা তাঁকে সেখানেই বিবাহ করেছিলেন, তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি রেঙ্গুন যান। আরো বললেন, আমার বাবা

বড় গরীব ছিলেন, তোমার দাদা বিয়ের পর রেঙ্গুন থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে বাবাকে মনিঅর্ডার করে সাহায্য পাঠাতেন। আমি লেখাপড়া জানি না, বাবার হাতের সই-করা টাকা পাওয়ার রসিদ যখন ফিরে যেতো রেঙ্গুনে, তখনই জানতাম যে, বাবা আমার ভাল আছেন।...চৌদ্দ বছরের মেয়ে বিয়ে করে তোমার দাদা এনেছিলেন।'

দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্র তাঁকে দ্বিতীয়বার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি শুধু অসুন্দরী অরক্ষণীয়া ছিলেন না, অশিক্ষিতাও ছিলেন। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ শরৎচন্দ্রের পক্ষে সবই সম্ভব ছিল। রূপ তাঁর কাছে বড় জিনিস ছিল না, অন্তরের সৌন্দর্যকেই তিনি মূল্য দিতেন। তিনি নিজে ছিলেন যাকে বলে সমাজবহির্ভূত মানুষ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের তিনি বড় একটা ধার ধারতেন না। তাই তাঁর এই দ্বিতীয়বার বিবাহ সামাজিক হোক বা অসামাজিক হোক, এটা তাঁর কাছে সত্য ছিল। তথাপি তাঁর বিবাহিত জীবন নিয়ে লোকে যখন নানা রকমের আজগুবি কল্পনা প্রচার করতো, তখনও এই মানুষটিকে কেউ কখনো এর প্রতিবাদ করতে দেখে নি। যা মিথ্যা তার কোনও প্রতিবাদ না করাই ছিল যেন তাঁর একটা স্বভাব। এই স্বভাবের জন্যই তো শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্র।

তাঁদের দাম্পত্য-জীবন কেমন ছিল?

তাঁর এক জীবনীকারের মতে হিরণ্ময়ী দেবী 'একজন অত্যন্ত সরল স্বভাবা, নিষ্ঠাবতী ও ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনভর পূজা-পার্বণ ও জপতপ নিয়েই থাকতেন। অল্পবয়স থেকেই তাঁর জীবনে এই ধর্মভাব দেখা দেয়' শরৎচন্দ্র নিজেও বলেছেন: 'ইনি তো দিনরাত জপতপ পূজো-আর্চ্চা নিয়েই থাকেন।' সকলেই জানেন,

১. মণীন্দ্রনাথ রায়: হিরণ্ময়ী দেবী। মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৬১। ইনি বেহালায় জমিদার ছিলেন।

ব্রহ্মদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সাহিত্য-জগতে যখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, যখন নানা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে তিনি যোগদান করতেন, তখনও একটি দিনের জন্যও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঐসব সভাসমিতিতে যেতে তাঁকে দেখা যায় নি। অন্তঃপুরেই হিরণ্ময়ী দেবীর দিন কাটতো, লোকলোচনের সামনে তিনি বড় একটা আসতেন না। সম্ভবতঃ এই কারণে অনেকেরই মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, বাংলার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক বুঝি অকৃতদার। শরৎচন্দ্র এজন্য মনে মনে কৌতুক বোধ করতেন নিশ্চয়ই।

হিরণ্ময়ী দেবীকে তিনি বড়বৌ বলে ডাকতেন।

তিনিই তো সংসারের বড় ছেলে, তাই এই সম্বোধন যথার্থ ছিল।

'বিয়ের সময় পর্যন্ত হিরণ্ময়ী দেবী আদৌ লেখাপড়া জানতেন না। কথিত আছে, বিয়ের পর শরৎচন্দ্র নিজে তাঁর স্ত্রীকে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিনই প্রতিভাধর স্বামীর সাহিত্যকর্মে তাঁর কাজে আসেন নি। একথা শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন। হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর পরিচর্যায় যেমন একাগ্রচিত্ত ছিলেন, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন। এই ভালবাসার একটি সুন্দর ছবি দিয়েছেন মণীন্দ্রকুমার রায়। তিনি লিখছেন ঃ

'হঠাৎ একদিন দাদার একখানা চিঠি পেলাম। লিখেছেন, মণি, বড় বৌয়ের খুব অসুখ, এ যাত্রায় বাঁচবেন কিনা জানি না—পার তো একবার এসো। চিঠি পড়ে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। তখনই ছুটে গেলাম। দেউলটিতে নেমে সামতাবেড়ে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে। দেখলাম, বাড়ির একদিকের একতলার নীচের একটি লম্বা খোলা দালানে একখানি ইজিচেয়ারে দাদা শুয়ে আছেন—বাঁদিকের লম্বা হাতলে বাঁ পায়ের উপর ডান পা-টি দিয়ে। পাশেই গড়গড়াতে সাজা তামাক, হাতে নল, কিন্তু টানছেন না। বোধ হলো চোখ বুঁজেই আছেন···একটি হ্যারিকেন আলো খানিকটা দূরে টিমটিম করছে। পায়ের ধুলো নিতেই তাঁর

সস্মিত ফিরে এলো। পাশেই একটি ছোট বেতের মোড়া ছিল, বসলাম।...খুব করুণভাবেই বললেন, বড় বৌয়ের খুব বাড়াবাড়ি মণি, ডবল নিউমোনিয়া—বোধ করি এবার আর তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না।[১] এখানকার ডাক্তার দেখছেন। দেখলাম, দাদার দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে, কথাগুলিও যেন ভারি ভারি।'

এ চিত্র যে কোন শিল্পীর তুলিকায় আঁকবার মতো।

এমন বুকভরা দরদ ছিল বলেই না তিনি অমন একজন উঁচুদরের ঔপন্যাসিক হতে পেরেছিলেন। গৃহহারা, ছন্নছাড়া ও বিবাগী এই মানুষটিকে একজন অশিক্ষিতা, গ্রাম্য, সরলা নারী তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রেম দিয়ে কেমন করে সংসারে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন, কেমন করেই বা তিনি তাঁর আত্মভোলা স্বামীর জীবনে সাহিত্য-সাধনার পরিবেশকে মনোরম করে তুলেছিলেন সদা সতর্ক সেবা ও মমতা দিয়ে—সেই ইতিহাস তো নেপথ্যেই রয়ে গেল। এই নিঃশব্দ আত্মনিবেদনের ইতিহাস পতিভক্তি ও পতিপ্রেমের একনিষ্ঠ তপস্যার ইতিহাস যদি কোন সহৃদয় লেখক কোনদিন রচনা করতে পারেন তাহলেই বুঝতে পারা যাবে, অন্তরের কী সম্পদ নিয়েই না হিরণ্ময়ী দেবী বালিকা বয়সে তাঁর জীবনদেবতার জীবনে এসেছিলেন, আরো বুঝতে পারা যাবে, 'গৃহত্যাগী শ্মশানচারী শিবকে প্রমথ সঙ্গীদলের আবেষ্টন থেকে' কেমন করে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন এই সংসারে। কিন্তু সেই চিত্তস্পন্দী কাহিনী রচনা করতে আর একজন শরৎচন্দ্রের প্রয়োজন।

১. [illegible] আগে হিরণ্ময়ী দেবীর পেটে টিউমার হয়েছিল। অপারেশন করাতে গিয়ে পাছে হিরণ্ময়ী দেবীকে হারাতে হয়, এই ভয়ে শরৎচন্দ্র কিছুতেই অপারেশন করতে দেন নি।

॥ এগার ॥

১৯১৬, ১১ এপ্রিল।

শরৎচন্দ্রের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হলো।

শেষ হলো তাঁর সুদীর্ঘকালব্যাপী অজ্ঞাতবাস।

চিরকালের জন্য রেঙ্গুন থেকে বাংলায় ফিরলেন তিনি।

ইতিমধ্যেই তিনি একজন উদীয়মান কথাসাহিত্যিক হিসাবে স্বল্পবিস্তর খ্যাতিলাভ করেছেন। কর্মত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করবার কথা তিনি কিন্তু আরো দু'তিন বছর আগে থেকেই চিন্তা করছিলেন। বর্মায় তিনি যখন প্রথম আসেন তখন তাঁর সেই শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় অঘোরনাথবাবু শরৎচন্দ্রকে বার্মিজ ভাষা শিখে ওকালতি করবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। বলেছিলেন, এই মগের মুলুকে লুটেপুটে খেতে চাও তো এখানকার ভাষাটা একটু শিখে আইন পরীক্ষা দিয়ে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করে দাও। সেই চেষ্টা তিনি যে করেন নি তা নয়, তবে কৃতকার্য হতে পারেন নি। কৃতকার্য যদি হতেন, যদি তিনি অঘোরবাবুর কথামত স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করতেন তা হলে শরৎচন্দ্র অনতিকালের মধ্যেই যে রেঙ্গুন বারের একজন উদীয়মান ব্যবহারজীবী হতে পারতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সে প্রতিভা ছিল। আর ছিল বাক্-বৈদগ্ধ্য—যেটা এই পেশার আসল মূলধন।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম।

উকিল তিনি হন নি, এটাও বাঙালীর সৌভাগ্য মানতে হবে।

বাংলা সাহিত্যেরও। কারণ তাহলে কথা-সাহিত্যিক শর[illegible]কে আমরা হয়ত পেতাম না। পেতাম না গল্পের সেই নিপুণ ঐন্দ্রজালিককে যাঁর লেখনীতে ঝঙ্কৃত হয়েছে নির্যাতিত বঞ্চিত ও মানুষের ব্যথা ও বেদনা, নিখিল মানবাত্মার জয়গান। উকিল যেমন হতে পারেন নি, তেমনি স্থায়ী চাকরিও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। কারণ এ্যাকাউন্ট্যান্ট-

জেনারেল অফিসে Accountancy পরীক্ষায় পাস না করতে পারলে পদে স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। এটাও হয়তো বিধাতার অভিপ্রেত ছিল বলতে হবে। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র যদি স্থায়ী চাকরিতে বহাল হতেন তাহলে উত্তরোত্তর বেতনবৃদ্ধি ও পদোন্নতি সুনিশ্চিত ছিল এবং তাঁর জীবনে কোন আর্থিক উদ্বেগ থাকত না। চাকরির শেষে যথাসময়ে হয়তো পেনসন নিয়ে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করতেন। সাহিত্য-সংসারে তাঁর অভ্যুদয় হয়তো কোনকালেই ঘটত না।

কিন্তু মানুষটার জীবন ও চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে, গোড়া থেকেই তাঁর জীবনবিধাতা শরৎচন্দ্রকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই চালিত করেছেন—নইলে ভাগলপুর-জীবনে বাগান-খাতার সৃষ্টি হতো না। তারই সাহায্যে তিনি সাহিত্য-সংসারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ভারতী পত্রিকায় 'বড়দিদি' বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এই নবীন লেখকের আবির্ভাবের আগমনী বেজে উঠেছিল। এর অনতিকালের মধ্যে যমুনা, ভারতবর্ষ ও সাহিত্য পত্রিকায় এই নূতন প্রতিভার আভ্যুদয়িক শুরু হয়ে তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই পাঠক-সমাজে পরিচিত করে তুলল। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই শরৎচন্দ্র বাঙালীর প্রিয় লেখক হয়ে উঠলেন। বন্ধুরা তখন পরামর্শ দিলেন, আর কেন মগের মুলুকে পড়ে থাকা, এবার কলকাতায় এসে পুরোপুরি-ভাবে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করলেই তো হয়। কেউ বললেন, লেখাকেই এবার পেশা করুন। বাজারে আপনার গল্পের যেরকম চাহিদা তাতে করে জীবিকার জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হবে না।

তবু চিন্তা তিনি করেছিলেন।

চিন্তা তাঁকে করতেই হয়েছিল। তখন তিনি বিবাহ করেছেন, ঘরসংসার পেতেছেন। আগের মতো সেই ছন্নছাড়া জীবন নয়। এমন অবস্থায় মাসান্তে চাকরির নিশ্চিত আয়—তা সে যত সামান্যই হোক, দুটি প্রাণীর পক্ষে তো যথেষ্ট ছিল—ছেড়ে অনিশ্চিত পথে পদক্ষেপ করতে শরৎচন্দ্র যে তখন একটু ইতস্ততঃ করেন নি তা নয়।

সাহিত্য তাঁকে যে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল, অন্তরের মধ্যে সেটাও তিনি অনুভব করেন। চাকরির ওপরে নানা কারণেই তখন তাঁর মনে কেমন যেন একটা বীতশ্রদ্ধার ভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। ঐ সময়ের মধ্যে কলকাতায় বন্ধু প্রমথনাথকে লেখা কয়েকটি পত্রে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ১৯১৩ সালের ৩১ মে তারিখে একটি চিঠিতে তাঁর তখনকার চাকরি-জীবনের অবস্থা বর্ণনা করে শরৎচন্দ্র লিখছেন :

'আগে চাকরির ব্যাপারটা বলি। আমাদের বড় সাহেব মিস্টার নিউমার্চ। গোরাতে রবিবাবু বলিয়াছেন, 'আমি মাধব চাটুয্যে, নীলকরের গোমস্তা।' এর বেশি আর বলার আবশ্যক নেই। নিউমার্চও ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া সাঁইত্রিশজন কেরানীকে reduce করিয়াছেন। অপরাধ একজনের চিঠি despatch করিতে তিনদিন দেরি হয়—আর একজনের একখানা পনর দিনের পুরান চিঠি বের হয় এইরকম। এঁর দৌরাত্ম্যে D. A. G. চ্যাণ্টার সাহেব, D. A. G. শ্রীনিবাস আইয়ার Asst. Acctt.-General সুন্দরাম, এক মাসের মধ্যে medical certificate দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছে। আমাদের office hour, strictly with hardest labour from 10.30 to 6. 30. নিয়ম এই যে, যদি কারু কোনদিন কোন তরফ থেকে reminder আসে—ছ' মাসের জন্য দশ টাকা হিসেবে (জরিমানা) reduction. এই তো সুখের চাকরি।...দিন তিন-চার পূর্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা reminder আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারি না। আমিই সমস্ত দোষ নিলাম, Explanation দিলাম, আমারই oversight ; ইত্যবসরে resignation লিখে রাখলাম। ঠিক জানি দশ টাকা গেছেই। এ অপমান সহ্য করে যে চাকরি সে করে, আমি তো কিছুতেই পারব না, এ জেনেই লিখে রাখি। যা হোক কি জানি নিউমার্চ দয়া করে কোন কথাই বললেন না। দুর্ভাগ্য কি

সৌভাগ্য জানি না। আমার আর **resignation** দেওয়া হলো না। কিন্তু শরীরও আমার আর বয় না।'

এই সুখের চাকরিতে সত্যিই তাঁর মন বসছিল না।

তখন থেকেই শরৎচন্দ্র চেষ্টা করতে থাকেন যা হোক একটা চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে। আর একটা চিঠিতে লিখছেনঃ 'আমার কলকাতা যাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব পত্রে লিখেছি। তবে কি জানো ভাই, সাহিত্য অবলম্বন করতে আমার ভারি লজ্জা করে। ওটা যেন উঞ্ছবৃত্তির সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার **Govt. service** বলে একটুও মায়া নেই। এ শালার অফিস রাস্তার কুলিগিরির অধম। আমার ইচ্ছে করে, চাকরি করে পেটের ভাতের যোগাড় না করে সাহিত্য-সেবা করে যদি দু'পয়সা পাই তো বই কিনি। আমার বিস্তর বই পুড়ে যাবার পরে এই আকাঙ্ক্ষাটাই আমার প্রবল।'

১৯১৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখের পত্রে লিখছেনঃ 'আমার চাকরির চেষ্টা কচ্ছ শুনে খুশী হলাম। সাহিত্যচর্চা করে পেট ভরে না ভাই। তাছাড়া, ধর যদি এক মাস কিছু নাই লিখতে পারি, তাহলেই তো বিপদ। অত সংশয়ের পথে পা বাড়াতে ভাল বোধ হয় না।'

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সব সংশয় ঘুচিয়ে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ও সাহিত্যকর্মকেই জীবিকা করে শরৎচন্দ্র বাংলায় ফিরলেন ১৯১৬ সালের ১১ এপ্রিল। একুনে তিনি দশ-এগার বছরের বেশি চাকরি করেন নি। তিনি যখন ফিরলেন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর চলছে। সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আনতে পেরেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে না আনাই সম্ভব। কারণ তাঁর স্বভাবের মধ্যে সঞ্চয় করার অভ্যাস ছিল না। একে তো বই কেনার বাতিক ছিল, তার ওপর মানুষটি ছিলেন পরোপকারী। কারো বিপদের কথা শুনলে স্থির থাকতে পারতেন না। তবে বিপুল অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে যে তিনি দেশে ফিরেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে তাঁর

অনেকগুলি গল্প যমুনা ও ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে তাঁকে পাঠকসমাজে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স-এর স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি যা চান সে ব্যবস্থা তাঁরা করবেন অর্থাৎ মাসিক অন্ততঃ একশো টাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে, শরৎচন্দ্রকে চাকরি ছাড়িয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসার গৌরব হরিদাসবাবুরই প্রাপ্য। এ-কথার উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। শরৎচন্দ্রকে লেখক হিসেবে পেয়ে আর হরিদাসবাবুকে প্রকাশক হিসেবে পেয়ে এঁরা উভয়েই লাভবান হয়েছিলেন। এ ইতিহাস সুবিদিত। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে তাঁর যতগুলি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটির বাবদ তিনি উপযুক্ত দক্ষিণা রেঙ্গুনে বসেই পেয়েছেন। কাজেই আমাদের মনে হয় কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়েই শরৎচন্দ্র চাকরি ছেড়ে লেখার জগতে একান্তভাবে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন।

এইবার শুরু হবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার কাল—'যার গতি যশ-মান-অর্থের রাজপথ দিয়ে, দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের দ্যোতক সাহিত্য-সম্রাটের মুকুট শিরে বহন করে, মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বয়ে গেছে।' শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরলেন তখন তিনি জীবনের মধ্যবয়সে উপনীত হয়েছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সেই বয়সেই তিনি কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ বড়ো সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক ছিল না সেদিন। সেই বয়সেই তিনি বাঙালী পাঠকের চিত্ত জয় করে এমন চমকের সৃষ্টি করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যার কোন পূর্ব-নজীর মেলে না। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

'Already middle-aged when he first appeared on the literary scene, Saratchandra made a complete conquest of his countrymen in the first ten years,

gave himself another ten or so to enjoy the fruits of the conquest, and died rather suddenly just as a new critical awareness was beginning to evaluate his work...No other Bengali author, not Rabindranath himself, had Saratchandra's measure of immediate success. Like Dickens, he was the idol of the public...He was simply riddled with success. He leapt from utter obscurity to the position of the Chief Novelist of his day. He was applauded by men and women of all ages, ranks, opinions, of all degrees of education or the lack of it...In Bengal and therefore in the whole of India he was technically the first professional writer...Indeed, his earnings multiplied so fast that in a literary career spread out over merely twenty years or so, he was able to buy a small estate in the country and possess his own Ballygunge mansion.'[১]

রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে এসে পরিপূর্ণভাবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-কর্মে আত্মনিয়োগ করার এই ছিল ফলশ্রুতি। এইবার আমরা প্রতিভাধর এই সাহিত্যিকের জীবনের এই বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যবয়সেই, অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সের সময় থেকেই শরৎচন্দ্র শুরু করেছিলেন তাঁর সারস্বত সাধনার দ্বিতীয় যুগ এবং তাঁর সৃষ্টিকার্যের এটাই ছিল সর্বোত্তম যুগ। যে সময়টা তিনি ব্রহ্মদেশে জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন সেইটাকে বলা যেতে

১. **An Acre of Green Grass : Buddhadeva Bose.**

পারে প্রস্তুতির যুগ। এই সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেছেন বিস্তর, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন আরো বিস্তর। সেই একাগ্র অধ্যয়ন আর বহুবিধ অভিজ্ঞতা আহরণ দ্বারাই তো রচিত হয়েছিল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্বের ভিত্তি। চিন্তা ও লিপিকুশলতাও তখন যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। ইতিমধ্যে তাঁর যেসব গল্প ও উপন্যাসের জন্য সাহিত্য-সংসারে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন ও সেই সঙ্গে পাঠকসমাজে বিস্ময়কর খ্যাতি লাভ করেছিলেন, সেসব তো ছিল তাঁর অপরিণত প্রতিভার ফসল। তবু তাই দিয়ে তিনি আমাদের হৃদয়কে জয় করেছিলেন—মুগ্ধ করেছিলেন সকল পাঠককে।

রেঙ্গুন থেকে এসে তিনি হাওড়ায় বাজেশিবপুরে অবস্থান করেন এবং বছর তিন পরে পানিত্রাস, সামতাবেড়ে দিদি অনিলাদেবীর বাড়ির কাছে রূপনারায়ণের তীরে নিজস্ব একটি বাড়ি তৈরীর জন্য জমি কেনেন। ইতিমধ্যে লেখা থেকে তাঁর উপার্জন বেশ আশাপ্রদ হতে আরম্ভ করেছিল এবং পুস্তকাকারে কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এখন যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করতে লাগলেন। তখনকার সাহিত্যসমাজে যাঁরা নবাগত তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তিনি এই সময়ে পরিচিত হয়ে ওঠেন; আবার অনেকে তাঁর অকপট বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য হলেন। এঁদের সকলের তিনি হয়ে ওঠেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র—'শরৎদা'। ক্রমে এঁদেরই মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে ওঠে একটি শরৎ-গোষ্ঠী। প্রায় প্রতি শনি-রবিবার দিন এই গোষ্ঠীর কেউ-না-কেউ কলকাতা থেকে বাজেশিবপুরে এসে শরৎচন্দ্রের সান্ধ্য-বৈঠকে মিলিত হতেন। তাঁদের কাছে তিনি তাঁর বিগত জীবনের কত গল্পই না করতেন। কলমে যেমন, তেমনি মুখে মুখেও তাঁর গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এ-কথা তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়রা জানতেন।

পরিচিত হয়েছিলেন তিনি আরো একজনের সঙ্গে।

তিনি ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জন শুধু ভাবুক ও কবি নন, একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরসিক ছিলেন। যখন যমুনা, সাহিত্য

ও ভারতবর্ষ পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি একে একে প্রকাশিত হতে থাকে, যখন যমুনা পত্রিকায় 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিছুটা প্রকাশিত হয়ে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, তখন থেকেই চিত্তরঞ্জন গভীরভাবে আকৃষ্ট হন শরৎচন্দ্রের প্রতি এবং তিনি এই নবীন লেখকের প্রতিভার একজন গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন। চিত্তরঞ্জন শরৎচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ছ' বছরের বড় ছিলেন ; তথাপি তিনি তাঁকে 'শরৎবাবু' বলেই শ্রদ্ধা করতেন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে এই পরিচয়ই তো উত্তরকালে শরৎচন্দ্রকে রাজনীতির আসরে নিয়ে এসেছিল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে কাহিনী যথাস্থানে বলব।

১৯১৭ সালটি বাংলার ইতিহাসে দুটি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। তার একটি ছিল রাজনৈতিক, অপরটি সাংস্কৃতিক। প্রথমটির সঙ্গে সংযুক্ত আছে চিত্তরঞ্জনের নাম, দ্বিতীয়টির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ। ভাষণ দিলেন তিনি বাংলায়। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সভাপতির ভাষণ সেই প্রথম বাংলা ভাষায় দেওয়া হয়। ভাষণটির নাম ছিল 'বাংলার কথা'। কথিত আছে, চিত্তরঞ্জনের সেই ভাষণটির মুদ্রিত একটি কপি শরৎচন্দ্র সংগ্রহ করেন ও পাঠ করে যারপরনাই মুগ্ধ হন। বাঙালী চিত্তরঞ্জন বাংলার কথা বাংলা ভাষায় বলে রীতিমত চমকের সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন। 'বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটি স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, কর্তব্য আছে। বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে।' বাজেশিবপুরের বাসাবাড়িতে বসে শরৎচন্দ্র যখন বক্তৃতাটি পাঠ করলেন, আমরা অনুমান করতে পারি, তখন তিনি চিত্তরঞ্জনের মধ্যে একজন পল্লী-দরদী মানুষকে আবিষ্কার করে বিস্মিত হন। তখনই তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকবে যে, আগামী দিনের বাংলার নেতা এই চিত্তরঞ্জন। বাংলার কথা তিনিও ভেবেছেন, গল্পের ভেতর দিয়ে বাংলার ক্ষয়িষ্ণু পল্লীসমাজের কথা। কিন্তু বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে

এমন প্রাণবান উক্তি তিনি আর কখনও শোনেন নি। চিত্তরঞ্জন যখন 'নারায়ণ' পত্রিকা বের করেন তার বছরখানিক পরেই তিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন প্রধানতঃ একজন উদীয়মান লেখক হিসেবে। চিত্তরঞ্জন তাঁকে তাঁর কাগজে লিখবার জন্য অনুরোধও করেন। আমরা দেখতে পাব যে, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা থেকেই রাজনীতিকে উপলক্ষ করে শরৎচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের অন্তরঙ্গ স্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসের কথা।

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো।

এর কিছু অংশ ইতিপূর্বে যমুনা পত্রিকায় পাঠ করে পাঠকসমাজে ও সমালোচক মহলে যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল এখন তা যেন শতগুণ হয়ে দেখা দিল। 'চরিত্রহীন' আর শরৎচন্দ্র এই দুটি নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। নিন্দা ও প্রশংসার বান ডেকে গেল বইটিকে উপলক্ষ করে। যমুনার ফণীন্দ্রনাথ পাল যেমন এটি তাঁর পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি আজ এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স সমগ্র বইটি প্রকাশ করে অধিকতর দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুধীরকুমার সরকার লিখেছেন ঃ '১৩২৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর 'চরিত্রহীন'-এর যে কত চাহিদা, তা প্রথম দিনেই প্রকাশ পায়। প্রথম দিনই সাড়ে চারশো কপি বিক্রি হয়ে যায়।' ১৯১৭ সালের পাঠক-সংখ্যার কথা স্মরণ রেখে তিন টাকা দামের একখানি সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস প্রথম দিনেই চারশো কপি বিক্রি হওয়া সত্যিই একটি অভাবনীয় ব্যাপার ছিল।

শিবপুরে থাকেন, মাঝে মাঝে ভারতী কার্যালয়ে আসেন তিনি।

২০ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে (এখন কৈলাস বসু স্ট্রীট) ছিল এর দপ্তর আর নীচের তলায় কান্তিক প্রেস। সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল

গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার প্রমুখ তরুণ লেখকদের এখানে আনা-গোনা ছিল নিয়মিত। তখনকার দিনে উত্তর কলকাতায় এটাই ছিল সাহিত্যিকদের একটি প্রসিদ্ধ আড্ডা। অনুরূপ সাহিত্য-চক্র নারায়ণ পত্রিকার অফিসেও বসত। সেখানেও শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে যেতেন, তবে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল ভারতী। যমুনার সঙ্গে তখন তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। ভারতীর একটু দূরেই ছিল 'ভারতবর্ষ' কার্যালয়; সেখানে গিয়ে তিনি বন্ধু প্রমথনাথ, সম্পাদক জলধর সেন অথবা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গল্প-গুজব করতেন। তবে ভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল আলাদা ; এই কাগজেই তাঁর প্রথম লেখা 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়ে তাঁকে বাঙলার সুধীসমাজে পরিচিত করেছিল। সৌরীন্দ্রমোহন লিখছেন ঃ

'১৩২২ সালে বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি 'ভারতী'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করি। তখন শরৎচন্দ্র প্রায় আসতেন ভারতী অফিসে এবং সকলের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, তা যেমন অমায়িক তেমনি স্নেহশীল। সকলের প্রীতি-শ্রদ্ধা তিনি নিজের স্বভাবের গুণে পরিপূর্ণ ভোগ করতেন।···ভারতী সম্পাদনাকালে বারোজন লেখককে দিয়ে লিখিয়ে ভারতীতে আমরা বের করেছিলুম বারোয়ারি উপন্যাস। বারো মাসে বারোটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন বারোজন লেখক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, আমি এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।···এ লেখার জন্য কোন লেখকই ভারতী থেকে অর্থ গ্রহণ করেন নি।'

'নারায়ণ' পত্রিকার পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জন একটা গল্প চাইলেন।

—একটা বেশ ভালো গল্প দিন, শরৎবাবু।

—আপনার 'ডালিম' গল্পের মতো ?

—ওটা আবার গল্প হয়েছে নাকি। কবিতা আমার সহজেই আসে। কিন্তু আপনার মত গল্প লেখার আর্ট জানা নেই।

লিখলেন সেই বিখ্যাত গল্প 'স্বামী'। নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প।

১৯১৮ সালের নারায়ণ পত্রিকার একটি সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন তো সেটি পড়ে মুগ্ধ। যে পড়ল সে-ই মুগ্ধ হলো। গঠনকৌশলে অনবদ্য 'স্বামী' গল্পটিতে শ্রেষ্ঠ আর্টের পরিচয় পাওয়া যায়। 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পাদনার কাজে চিত্তরঞ্জনের যিনি দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, সেই খ্যাতনামা মনীষী ও চিন্তাশীল লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে, এই গল্পটির জন্য লেখককে কত দক্ষিণা দেওয়া যায়, এই কথা যখন চিত্তরঞ্জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তখন গিরিজাবাবু বলেছিলেন, একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিন। দানে চিরকাল মুক্তহস্ত চিত্তরঞ্জন তা-ই করেছিলেন। 'গল্পটা বেরুবার পর একদিন শরৎচন্দ্র এলেন। অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গুজব করলেন আমাদের সঙ্গে। প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল সেদিন আর ছিল উত্তম পানীয়। চলে আসবেন এমন সময়ে দাশ সাহেব তাঁর হাতে একটা চেক দিয়ে বললেন, আপনার দক্ষিণা। অঙ্কহীন চেক দেখে তিনি বিস্মিত; বলেন, কৈ, টাকার অঙ্কটা তো লেখেন নি। তখন দাশ সাহেব হেসে বললেন, টাকার অঙ্কটা আপনিই বসিয়ে নেবেন। পরে আমরা জেনেছিলাম যে তিনি ঐ গল্পটার পারিশ্রমিক বাবদ একশো টাকার বেশি গ্রহণ করেন নি। দাশ সাহেবের মত লোককে সেদিন আমি যারপরনাই বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখেছিলাম শরৎচন্দ্রের এই আচরণে। বলেছিলেন, অদ্ভুত লোক এই শরৎবাবু।'[১]

১৯১৯।

বৈশাখের নববর্ষের দিনে (১৩ এপ্রিল) ঘটলো জালিয়ানওয়ালা-বাগের সেই ডায়ারী নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এমন বেদনাদায়ক ঘটনা বুঝি পৌনে দুশো বছরের ইংরেজ শাসনকালে এদেশে আর কখনো ঘটে নি। পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হয়ে তার প্রতিবাদস্বরূপ

১. লেখকের ডায়েরী থেকে উৎকলিত।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন শাসকের দেওয়া মানের মুকুট[১] ছুঁড়ে ফেলে যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা শরৎচন্দ্রকে রীতিমত চমকিত করে দিয়েছিল এবং কবির এই নির্ভীক আচরণ কবিকে তাঁর কাছে কি রকম শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল তা জানা যায় একটি চিঠি থেকে। এটি তিনি লিখেছিলেন অমল হোমকে। ইনি তখন লাহোরে 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। চিঠিখানি এইরকম :

বাজেশিবপুর, হাওড়া
১৬-৮-১৯

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়াছে। ইংরেজের মারমূর্তির কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কত পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো। আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নূতন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন। 'নারায়ণে'র সময় সি. আর. দাশ একদিন আমায় বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইট্‌হুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

ইতি—আশীর্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মূল কাহিনী থেকে সরে গিয়ে এবার কিছুক্ষণের জন্য আমরা

১. ১৯১৫ সালে কবি 'নাইট্‌হুড' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ঐ সময়ে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি এই উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

একবার যাব বাজেশিবপুরে যেখানে রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপরিবারে বাসা বেঁধেছিলেন চির-যাযাবর শরৎচন্দ্র। এত জায়গা থাকতে এই স্থানটি তিনি নির্বাচন করেছিলেন কেন? তখন অনেকের মনেই এ বিষয়ে কৌতূহল জাগত। অবশ্য কাছেই তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি ছিল; সম্ভবতঃ সেই আকর্ষণেই এসে থাকবেন। মাথায় একরাশ চুল, চিবুকে অনতি দীর্ঘ দাড়ি—এই চেহারা নিয়ে যেদিন তিনি এখানে পদার্পণ করেছিলেন সেদিন স্থানীয় অধিবাসীদের কেউ কেউ তাঁকে নাকি মুসলমান বলে মনে করেছিলেন। এখানে তাঁর প্রথম আলাপ হয় শরৎচন্দ্র শেঠ নামে একজন মুদীর সঙ্গে তার দোকানে।

'কিন্তু আশ্চর্য এই, একজন মুদীর সঙ্গে যাঁহার আলাপ অত শীঘ্র ও সহজে জমিয়াছিল, পাড়ার লোকের সঙ্গেও তত শীঘ্র ও সহজে তাঁর আলাপ হয় নাই। শরৎচন্দ্রের চরিত্রে লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি ছিলেন কতকটা shy (লাজুক)। অনেক সময় চোখে চোখে কথা কহিতে পারিতেন না। প্রায়ই মুখ নীচু করিতেন বা অন্যদিকে চাহিয়া কথা বলিতেন। বাজেশিবপুরের গাঁ হইতে পল্লীগ্রামের গন্ধ তখনও যায় নাই, এখনও যে একেবারে গিয়াছে, তাহা নহে। কাজেই নামগোত্র-হীন এই ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাসকারী লোকটির সহিত মিশিবার আগ্রহ পাড়ার লোকের ততটা ছিল না। তাহার উপর তাঁহার সম্বন্ধে পাড়ায় কত গল্প-গুজবের সৃষ্টি হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রকে কোন বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু কোথাও আহার করিতেন না। শহরের লোকের হয়তো এই প্রথা হইতে পারে, কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকেরা ইহা পছন্দ করিত না।

'শরৎচন্দ্র যে বাসায় থাকিতেন, তাহার বৈঠকখানা ঘরটি ছোট, বাহিরের উঠানও খুব বড় নহে। প্রতিবেশী স্বর্গীয় হরিচরণ বা ভূতনাথ মিত্র মহাশয়ের বাহিরের বৈঠকখানার দালানটিতে তিনি প্রায়ই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। ঐ বাড়িতে পরিবার ছিল খুব কম এবং

বাড়িটিও ছিল নির্জন, ফাঁকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেই বৈঠকখানার দালানে একখানি বেঞ্চে বসিয়া বা অর্ধশায়িত হইয়া শরৎচন্দ্র গড়গড়া মুখে কখন বই পড়িতেন, কখনও বা বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ করিতেন। অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে হরিচরণবাবুর পরিচয় ছিল, শরৎবাবুর সম্পর্কে আসিয়া সেই পরিচয়ের পরিধি আরও বাড়িয়া যায়। অনেক আধুনিক continental নভেলও তাঁহার সংগ্রহে ছিল। এই সমস্ত কারণে উভয়ের মধ্যে প্রীতির ভাব জমিয়া উঠিয়াছিল।

'দেখিতে দেখিতে বাজেশিবপুরে তাঁর বাড়িটি সাহিত্যিকগণের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। একদিন বলিলেন, লোকের বাহির দেখিয়া ভিতরের বিচার করা উচিত নয়। আমি কী সঙ্গ যে করি নাই, তাহা বলিতে পারি না। সেই সমস্ত সঙ্গের ফলে আমি যে এখন দাঁড়াইয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য। বুঝিলাম লোকটি খাঁটি।'[১]

রেঙ্গুন থেকে চলে আসার তিন বছরের মধ্যেই শরৎচন্দ্র হয়ে উঠলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পকার এবং একজন বহু অন্বেষিত লেখক। তাঁর অজ্ঞাতবাসের সময় 'কিরূপে৷ মাসের পর মাস বঙ্গোপসাগর উত্তীর্ণ হয়ে বর্মা থেকে বঙ্গদেশে রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নারীর মূল্য প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ' এসে পাঠকসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, সে তো বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত ইতিহাস। কিন্তু ১৯১৯ সালের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ও তাঁর বইয়ের চাহিদা দেখে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শরৎ-সাহিত্য প্রচারে অগ্রণী হলেন। বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। তখন সুলভে সৎসাহিত্য প্রচারে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের গ্রন্থাবলী বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হতো। তাঁর দৃষ্টি পড়ল শরৎচন্দ্রের উপর। এলেন তিনি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাজেশিবপুরে। তাঁর সঙ্গে

১. শরৎ-কথা : সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের পরিচয় ইতিপুর্বেই হয়েছিল। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত একটি পূজা বার্ষিকীতে শরৎচন্দ্র একটি গল্প লিখেছিলেন, সতীশবাবুর অনুরোধক্রমে।

—আপনার গ্রন্থাবলী ছাপতে চাই।

—উত্তম প্রস্তাব। রয়্যালটি কত দেবে?

—যা সবাইকে দিয়ে থাকি। তবে আপনার ক্ষেত্রে একটু বেশি দিতে আপত্তি নেই।

শরৎচন্দ্র সম্মত হলেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ড বেরুলো ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে। পরে তাঁর জীবিতকালে আরো দুটি খণ্ড বেরিয়েছিল। পয়সাও তিনি পেয়েছিলেন প্রচুর। এ-কথা অস্বীকার করবার নয় যে শরৎ-সাহিত্য প্রচারে যেদিন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের দান ছিল অসামান্য।[১]

একদিনের একটি ঘটনা।

শরৎচন্দ্র চলেছেন ভারতীর আড্ডায়।

মহানগরীর পথের ধারে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। 'নায়ক'-পত্রিকার সম্পাদক তখন ইনি। ইনি একসময়ে ভাগলপুর জুবিলি স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন এবং শরৎচন্দ্র তখন এঁর ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন। দেখেই চিনতে পারলেন ও কাছে ডাকলেন। 'ডেকে বললেন, শরৎ, তোমার লেখা আমি পড়ি নি, কিন্তু লোকে বলে সেগুলি ভালই হচ্ছে। একদিন তোমাদের আমি পড়িয়েছি। আমার আদেশ রইল—যা সত্যই জানো না, তা কখনো লিখো না। যাকে উপলব্ধি করো নি বা সত্যানুভূতিতে যাকে আপন করে পাও নি, তা কখনো লিখো না, তাকে ঘটা করে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড় হতে চেয়ো না। আপন সীমানা

---

১. কথিত আছে, সতীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন। তিনি কবিকে এজন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়্যালটি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্মত হন নি।

লঙ্ঘন করাই আপন মর্যাদা লঙ্ঘন করা। এ ভুল যে করে না, আর যে দুর্গতিই হোক, তাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় না।'

বাঙালীর সৌভাগ্য, বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য শরৎচন্দ্র কখনো এই ভুল করেন নি।

॥ বারো ॥

উনিশ শো কুড়ি শেষ শুরু হলো উনিশ শো একুশ।

সেই ক্রান্তি-লগ্নে বাঙালী উপনীত হলো একটি বৃহৎ যুগ-সন্ধিক্ষণে। অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। নূতন চেতনার মধ্য দিয়ে আসে নব অরুণোদয়। সে অরুণচ্ছটায় বাঙালীর মনে সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব ভাবমণ্ডলের। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র নূতনের আহ্বান—'আসে নির্দয় নব-যৌবন ভাঙনের মহারথে।' ব্যক্তির ও জাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে তেমন আহ্বান নিয়ে নবযুগ এসে থাকে যখন একটা সর্বাত্মক জাগরণের আলোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে জাতির চিত্ত-লোক। এমনি একটি উদ্ভাসন দেখা গিয়েছিল সেই স্মরণীয় একুশ সালে চারটি যুগ-প্রবর্তক প্রতিভাকে আশ্রয় করে। বলা বাহুল্য, ইতিহাসে নিগূঢ় প্রয়োজনেই এটা সেদিন ঘটেছিল—ফলে তার জন্য যেন ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখেছিল।

চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, শিশিরকুমার ও নজরুল—এই চারজনই ছিলেন নূতন ভাবমণ্ডলের স্রষ্টা। রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। সুখ-বিলাস ও ভোগৈশ্বর্যে আকণ্ঠ-মগ্ন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ত্যাগের বিভূতি সর্বাঙ্গে মেখে একেবারে পথের ধূলায় এসে দাঁড়ালেন গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে। কথা-সাহিত্যে শরৎ-প্রতিভা তখন সৃষ্টি করে চলেছে নব নব বিস্ময়। নজরুলের কবিতায় খরবেগে প্রবাহিত হলো বিদ্রোহের অগ্নিস্রাবী সুর আর রঙ্গমঞ্চে নূতনের অভ্যুদয় ঘোষণা

করে আত্মপ্রকাশ করেছেন শিশিরকুমার ভাতুড়ী অধ্যাপকের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে। সকলের উপরে ছিলেন একেশ্বর সূর্যের মত রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রতিভা তখন মধ্যাহ্ন গগনে সহস্র কিরণে উজ্জ্বল আলো বিস্তার করে চলেছে। শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে এঁদের প্রত্যেকেরই হয়েছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—এঁদের প্রত্যেকেরই জীবনবৃত্তের মধ্যে তিনি এসে পড়েছিলেন। তাই এখন থেকে এঁদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখতে হবে তাঁর জীবনকে।

দেশবন্ধুর আহ্বানে শরৎচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। কথিত আছে, তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এতে নাকি প্রবল আপত্তি ছিল। তিনি ভাগিনেয়কে বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্য তোমার কাছ থেকে এখনো অনেক জিনিস আশা করে, শরৎ। তুমি কেন কলম ফেলে চরকা ধরবে? উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, দেশবন্ধু দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলেন, সেটা কি আমরা শুধু দূর থেকে দেখে বাহবা দেব? তাছাড়া মহাত্মা গান্ধী যে বিরাট আন্দোলনের সূচনা করেছেন আর দেশবন্ধু বাংলায় সেই আন্দোলনের আজ কর্ণধার হয়েছেন—এমন অবস্থায় দেশের সাহিত্যিকদেরও তো একটা কর্তব্য আছে।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখালেন।

কংগ্রেসের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে দিলেন।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য হয়েছিলেন। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর প্রভৃতির সঙ্গে কংগ্রেসে যোগদানের পর থেকেই তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। নিয়মিতভাবে তিনি চরকা কাটতেন, সেই চরকায় কাটা সূতো দিয়ে খদ্দর তৈরী করবার জন্য হাওড়ার বাসায় ছোট একটি তাঁতশালাও বসিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরকা কেটে ও খদ্দর পরিধান করে

দেশোদ্ধার কতটা সফল হবে সে বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় জেগেছিল। সংশয় জেগেছিল তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সমস্যা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে। একবার বরিশালের পথে স্টীমারে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গী ছিলেন। সেদিন অনেক রাত্রিতে স্টীমারের ডেকে দুজনে কিছুক্ষণ বসে নানা বিষয়ের আলাপ করেন।

'হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি চরকা বিশ্বাস করেন?

'বলিলাম, আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করেছেন, সে বিশ্বাস করি নে।

'কেন করেন না?

'বোধ হয় অনেকদিন চরকা কেটেছি বলেই।

'দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের পাঁচ কোটিও যদি সূতা কাটে ত ষাট কোটি টাকার সূতা হতে পারে।'

কথায় কথায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা উঠল।

'দেশবন্ধু বলিলেন, আপনি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি বিশ্বাস করেন?

'বলিলাম না।'

অসহযোগের কথা উঠল

'বহুক্ষণ স্থির থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন, আপনি আমাদের অহিংস অসহযোগ বিশ্বাস করেন ত?

'বলিলাম, না। সহিংস-অহিংস কোন অসহযোগেই আমার বিশ্বাস নেই। যতটুকু শক্তি আপনার কাজ করে দিই।'[১]

সেদিনকার বাংলার রাজনীতিতে দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান চুক্তি (pact) নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা শরৎচন্দ্র যে গভীরভাবেই চিন্তা করেছিলেন তা জানা যায় তাঁর এই প্রসিদ্ধ উক্তি থেকে।

১ স্মৃতিকথা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩২।

'বস্তুতঃ মুসলমান যদি কখনও বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে। বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সংকোচ মানে নাই। দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। আজ মনে হয় এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে।···মিলন হয় সমানে সমানে। হিন্দু-মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ। এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মবঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে, এদেশে তাহার চিত্ত নাই। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপট বিশ্বাস করিতে পারিবে না।···জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু।'[১]

মোট কথা, শরৎচন্দ্র এই হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টকে রাজনীতি-বিদ্‌দের উদ্ভাবিত একটি ফন্দি বলেই মনে করতেন—তার বেশি কিছু নয়। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে তাঁর সমালোচনার তীব্রতা সেদিন অনেকেরই মনঃপূত হয় নি। কারো মন রেখে কথা বলার মানুষ তিনি ছিলেন না কোনদিন। তিনি সর্বতোভাবেই ছিলেন একজন

১. হিন্দুসংঘ, ১৯ আশ্বিন, ১৩৩৩। এই সময়ে পাবনায় মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর বীভৎস অত্যাচার করেছিল। বাইরে থেকে মুসলমান মোল্লারা এসে স্থানীয় নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমানদের উত্তেজিত করার ফলেই এই দাঙ্গা ঘটেছিল। শরৎচন্দ্রের এই অভিমতটি ছিল এরই প্রতিবাদ।

স্বাধীন চিন্তাশীল লেখক। স্বাধীনচিত্ততাই তো তাঁর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যই এর অভ্রান্ত প্রমাণ বহন করে।

শরৎচন্দ্রই বোধ করি বাংলার একমাত্র সাহিত্যিক যিনি রাজনীতির সঙ্গে অমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। দেশের পরাধীনতার মর্মজ্বালা তিনি হৃদয়ে অনুভব করতেন বলেই না অসহযোগ আন্দোলনের সামিল হতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথকেও একদিন আমরা বাংলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনে চারণ-কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। অসহযোগ আন্দোলন থেকেও তিনি দূরে ছিলেন না সত্য, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত অমন সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে পারেন নি। অসহযোগের কর্ম-সূচীর মধ্যে একটা ছিল স্কুল-কলেজ বয়কট। যেসব ছাত্র স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল তাদের জন্য দেশবন্ধু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হলেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (এখনকার নাম সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) ফোরবেস ম্যানসনে স্থাপিত হলো গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন এর অধ্যক্ষ। এইভাবে জেলায় জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হয়।

গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে শরৎচন্দ্রের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল। এইখানেই—ফোরবেস ম্যানসনের এই পাঁচতলা বাড়িতে—বাংলার অসহযোগ-আন্দোলনের বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র। তাঁরই অনুরোধে তিনি প্রায়ই বিদ্যায়তনে এসে ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতেন ও নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন। ১৯২১ সালে এইখানে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুন্দর ভাষণ দিয়েছিলেন।[১] এটি তাঁর লিখিত ভাষণ ছিল। এই সুচিন্তিত ভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

'শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠন নয়,

১. প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ। কবি এই প্রবন্ধটি এ সময়েই (আশ্বিন ১৩২৮) লিখেছিলেন।

সে অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ চলেছে, এর কোনটাই মিথ্যে নয়। কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন্‌খানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়।—কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না, হবার জো-ই নেই। যে শিক্ষায় মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে, সে শিক্ষা য়ুরোপ আমাদের দেয় নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘ-কাল পশ্চিমের সংসর্গে আমরা কি হয়ে আছি, মাত্র সেইটুকু কি এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ববিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের 'পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে।···তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ, এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, যদি না দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, এর মূল যদি না জাতির অতীতের মর্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে থাকে।'[১]

১৯২১ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গী ছিলেন। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল—চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক গুরু। গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকেই। শরৎচন্দ্রের মুখে এই গ্রন্থের লেখক একবার তাঁর কলকাতার বাড়িতে শুনেছিলেন যে, বরিশাল কনফারেন্সে দেশবন্ধুর যে মূর্তি তিনি সন্দর্শন করেছিলেন তা তিনি কোনও দিনই বিস্মৃত হন নি। 'পাল সাহেব যখন তাঁর বক্তৃতায় বললেন স্বরাজ স্বরাজ বললেই ত হবে না, তার কাঠামো সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক, তখন তার জবাবে দেশবন্ধু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—swaraj is swaraj, তখন তাঁর চোখে

১. শিক্ষার বিরোধ: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নারায়ণ, ১৩২৮

মুখে আত্মপ্রত্যয়ের যে বিজলী ঝলক দেখেছিলাম, তা আজো যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।'

যেদিন শরৎচন্দ্রের কাছে সংবাদ এলো যে দেশবন্ধু ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন সেদিন তিনি জলস্পর্শ করেন নি—এমনি ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি। তারপর ১৯২২ সালের ৯ আগস্ট তিনি যেদিন কারামুক্ত হন সেদিন তিনিই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন। 'দেশবন্ধুর কারাভোগের সেই ছয়টা মাস যেন আমার বুকে গুরুভার পাষাণের মত বোধ হয়েছিল।' এই সহৃদয় উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি দেশবন্ধু সম্পর্কে কী অসীম শ্রদ্ধাই না তিনি পোষণ করতেন তাঁর মনের মধ্যে। সদ্য কারামুক্ত নেতাকে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী প্রকাশ্যে সংবর্ধিত করতে চাইলেন। এই স্মরণীয় সংবর্ধনা উপলক্ষে তাঁকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয় সেটি রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে রচিত সেই মানপত্রটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম:

'তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনি করিয়াই মানবজীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশু-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে।

'একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতি সর্বদেশে, সর্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।'[১]

---

১. সম্পূর্ণ মানপত্রটি লেখকের 'দেশবন্ধু' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১৯২২ সাল, ডিসেম্বর। গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গী ছিলেন এই কংগ্রেসে। তখন কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছে—প্রো-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জার। প্রথম দলকে বলা হতো স্বরাজী অর্থাৎ এঁরা পরিষদীয় কাজে আস্থাবান ছিলেন। দেশবন্ধু ছিলেন এই দলের দলপতি ও তাঁরই নেতৃত্বে গয়াতেই প্রতিষ্ঠিত হয় স্বরাজ্য দল। কলকাতায় ফিরে এসে স্বরাজ্য দলের সংগঠন কাজকর্মের সঙ্গেও শরৎচন্দ্র লিপ্ত হন। কাউন্সিল প্রবেশের প্রোগ্রাম নিয়ে দেশবন্ধু নির্বাচনে অবতীর্ণ হলেন ও স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে সাতান্নজন হিন্দু ও মুসলমান প্রার্থীকে মনোনীত করেন। এই সময়ে দেশবন্ধুকে বহু বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হতে হয়। গয়া কংগ্রেস থেকে ফিরে আসার পর একদিনের একটি ঘটনা শরৎচন্দ্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

'লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা, তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটা হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠলাম, গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে ওঠে তো থাক।

'মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ জানি নে, আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারি নে। বাঙালী ভাবুকের জাত, বাঙালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার যথাসর্বস্ব এনে আমার হাতে ঢেলে দেবে। এই সকল কথা বলিতে গেলেই উত্তেজনায় তাঁর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিত। এই বাংলাদেশ ও এই বাংলাদেশের মানুষকে তিনি কি ভালই বাসিতেন;

কি বিশ্বাসই করিতেন! কিছুতেই যেন আর তাহাদের ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতেন না।'[১]

স্বরাজ্য দলের নির্বাচনী অভিযানে দেশবন্ধুর সঙ্গী হিসেবে শরৎচন্দ্র নবদ্বীপে এলেন। সেইখানেই এই গ্রন্থের লেখক তাঁকে প্রথম দেখেন, যদিও এর ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯২২ সালে আমি তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হই তাঁরই লেখা 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসটির মাধ্যমে। সেটি আমি বাংলায় ব্যুৎপত্তির জন্য প্রাইজ পেয়েছিলাম। শরৎচন্দ্র আসবেন শুনে, আমি সে বইটি সঙ্গে করেই সভায় এসেছিলাম এবং শরৎচন্দ্রের কাছাকাছিই বসবার স্থান করে নিয়েছিলাম। আমি তখন স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র এবং স্থানীয় কংগ্রেসের একজন নগণ্য পদাতিক। সভা হয়েছিল বিকাল বেলায়; সভার স্থান ছিল নবদ্বীপের বড় আখড়া। দেখলাম বাংলার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিককে যাঁর 'শ্রীকান্ত' পাঠ করে সেই বয়সেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুলগুলি প্রায় সব সাদা ছিল কি সবে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে ঠিক মনে নেই—দুটি অন্তর্ভেদী চক্ষু আর খড়গ নাসিকা—যেমনটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। গায়ে তসর বা সিল্কের জামা, পরনে মিহি ধুতি আর হাতে ৫৫৫ স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেটের টিন। সভাস্থলে বসেই সিগারেট টানছিলেন। কাছে এসে প্রণাম করে খুব সঙ্কোচের সঙ্গেই বললাম, আপনার এই বইটা আমি প্রাইজ পেয়েছি। তিনি যেন কথাটা শুনে একটু বিস্মিত হলেন। বললেন, আমার বই তাহলে স্কুলে প্রাইজ দেওয়া হয়!—কি চাও? বললাম, দু'লাইন লিখে আপনার একটা স্বাক্ষর যদি দেন—। আমার কথা শেষ হবার আগেই তিনি আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে হলুদ রং-এর একটি পার্কার ফাউণ্টেন পেন দিয়ে আমার সেই প্রাইজ-পাওয়া 'নিষ্কৃতি' বইটির আখ্যাপত্রে মুক্তাক্ষরে লিখলেন: 'সত্যকে পাওয়াই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। কারো কৃপায় নয়, মানুষ বড় হয়ে ওঠে তার নিজেরই সত্য সাধনায়। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৪।৯।২৩।'

১. স্মৃতিকথা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাসিক বসুমতী, ১৩৩২ আষাঢ়।

সকলেই জানেন, শরৎচন্দ্রের ছিল প্রখর স্মরণশক্তি—একেবারে যাকে বলে photographic memory—ঠিক তাই। এই ঘটনার বহুকাল পরে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে আমাকে দেখেই তিনি চিনতে পেরেছিলেন এবং যদিও তখন আমি অতি আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পাণ্ডা ছিলাম ও শরৎ-বিরোধী দলের অগ্রগণ্যদের মধ্যে ছিলাম একজন, তথাপি তিনি প্রসন্নভাবেই সেদিন আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। বলেছিলেন, রাধুর ওখানেই তোমার 'ককটেল' লেখাটা নরেন আমাকে পড়ে শুনিয়েছে; অতি উপভোগ্য রচনা তাতে সন্দেহ নেই। সত্য কথা বলার এই সৎসাহসের তারিফ করি। পায়ের ধুলো নিয়ে সেদিন তাঁকে বলেছিলাম—এই উপদেশই তো আপনার কাছ থেকে আমি লাভ করেছিলাম আমার ছাত্র-জীবনে। এই দেখুন তার ডকুমেণ্ট—এই বলে আমার সেই প্রাইজ-পাওয়া ও তাঁর স্বাক্ষরিত 'নিষ্কৃতি' বইটির আখ্যাপত্র তাঁর চোখের সামনে খুলে ধরলাম। বইটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। কোন কথা বললেন না। তবে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল এক স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। শরৎচন্দ্রের এই মূর্তি আজো আমার স্মৃতিপটে আঁকা আছে।

১৯২৫, ১৬ জুন।

দার্জিলিং থেকে আচম্বিতে সংবাদ এলো—দেশবন্ধু আর নেই। শরৎচন্দ্র এই সংবাদে কতদূর ব্যথিত হয়েছিলেন তা জানা যায় তাঁর সেই 'স্মৃতিকথা' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করে যেটি তিনি দেশবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচনা করেছিলেন। তাঁর বহু বিখ্যাত রচনার মধ্যে এটি একটি। এর থেকে প্রারম্ভিক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃতি করে দিলাম:

'মনে হয়, পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়ের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশি

লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইল না, দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না। আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এত বড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।'

যাঁরাই শরৎচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন কি প্রাণস্পর্শী এই লেখা। পাঠ করলে অশ্রু সংবরণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ম্যান্‌ডেলে জেলে বসে এই প্রবন্ধটি পাঠ করে সুভাষচন্দ্র ও তার সহ-রাজবন্দীরা সকলেই যারপরনাই অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর তখনকার মনের ভাব ব্যক্ত করে শরৎচন্দ্রকে তিনি একটি সুন্দর চিঠিও লিখেছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের প্রতি গভীরভাবেই আকৃষ্ট হন ও কংগ্রেসের কাজে যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে সুভাষচন্দ্রের কথামত তিনি নির্দ্বিধায় তা করেছেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর কতখানি স্নেহের পাত্র ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি।

'শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভালবাসা প্রথম ক'বছর সবচেয়ে বেশি ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি এবং শেষের ক'বছর ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রতি। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি ভালবেসেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। তিনি বলতেন সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে পারি নে। শিবপুরে হাওড়া জেলা কর্মী সম্মেলন হল। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ও সহকর্মীরা এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। শরৎচন্দ্রকে যখন সম্মেলনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে কর্মীরা গেলেন তিনি বললেন, আমি যাব না। —কেন যাবেন না? হাওড়া জেলার কর্মী সম্মেলন, আপনি যাবেন না কি রকম?—ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয় নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারি নে। একজন খুব রেগে বলে উঠল, আপনার সুভাষ শিব নয়, ভূত।—ভূত নয়রে ভূত নয়, ভূতনাথ, তিনি বললেন। কয়েকজন বললেন, আমরা আপনার কেউ নই? তিনি সজল চোখে বললেন,

তোমরা আমার অনেকখানি। কতখানি যে তা মাপাও যায় না—কিন্তু তবু আমি যাব না। কর্মীরা বিষণ্ণচিত্তে বিদায় নিলেন, তিনি ততোধিক ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বিদায় দিলেন।'[১]

দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে শরৎচন্দ্রকে কি রকম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন সুভাষচন্দ্র তা জানা যায়, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রদত্ত এই অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকে: 'তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাংলার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জেলায় বিতরণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে তিনি সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে। একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন, কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্তব্য নহে। শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন, আমি কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।'[২]

কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের এই মূর্তি আজকের দিনের তরুণদের মধ্যে কয়জন জানেন? কয়জনই বা জানেন যে, দেশজননীর প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন চিরকাল। এই ক্ষেত্রে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের সগোত্র বললে অসঙ্গত হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন নি, তাঁর প্রয়োজন হয় নি, কারণ তখন কংগ্রেস সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর শরৎচন্দ্র অতি ঘনিষ্ঠভাবেই

১. শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন: শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়

২. ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩৪।

এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। কংগ্রেসের একাধিক মঞ্চ থেকে তিনি দেশের যৌবন-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে যেসব বক্তৃতা করতেন সেগুলি আজো তার মূল্য হারায় নি। তরুণ বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর কি রকম সহানুভূতি ছিল তারই অভ্রান্ত পরিচয় বহন করে 'তরুণের বিদ্রোহ' শীর্ষক তার সেই বিখ্যাত অভিভাষণটি।[১]

দেশের ছাত্র ও যৌবন-শক্তিকে তিনি বার বার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এটাই ছিল একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। বাংলার আর কোন সাহিত্যিক ঠিক এইভাবে তাদের ডাক দেন নি যেমনটি দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯২৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী মালিকান্দা (ঢাকা) অভয় আশ্রমে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সমাবেশে প্রদত্ত তাঁর 'সত্যাশ্রয়ী' শীর্ষক ভাষণটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

'সমস্ত ভারতবর্ষময় কোথাও আজ সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, এতদিন লোকে যা ভেবে এসেছে, তা ভুল, সত্য তাতে ছিল না বলেই বিধাতা বারংবার ব্যর্থতার কালিমা দেশের সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছেন। পলিটিক্স-এর গুরুভার বৃদ্ধদের জন্য নয়। এ ভার যৌবনের। তাইতো আজ স্কুল-কলেজে, নগরে-পল্লীতে ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে যৌবনের ডাক পড়েছে। ডাক বৃদ্ধরা দেন নি, দিয়েছেন বিধাতাপুরুষ নিজে। তাঁর আহ্বান কানের মধ্য দিয়ে এদের বুকে পৌঁছেছে যে, জননীর হাতে-পায়ে বাঁধা এই কঠিন শৃঙ্খল ভাঙবার শক্তি অতি প্রাজ্ঞ প্রবীণদের হিসেবী বুদ্ধির মধ্যে নেই, এই শক্তি আছে শুধু যৌবনের প্রাণ-চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে। এই নিঃসংশয় আত্মবিশ্বাসে আজ তাকে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে।'

এমনি করেই তিনি সেদিন দেশের তরুণ-চিত্ত উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

---

১. ১৯২৯ সালে রংপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্বে, বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন থেকে প্রদত্ত ভাষণ।

সুভাষচন্দ্রের মধ্যেই তিনি যৌবনশক্তির আদর্শ দেখে তাঁর প্রতি এমন-ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একথা ঠিক যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় বৃহৎ নেতৃত্বের ভূমিকা শরৎচন্দ্র কোনদিন গ্রহণ করেন নি; অনুরুদ্ধ হয়েও এবং সুনিশ্চিত জয়লাভের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা কামনা তাঁর বুকে অনির্বাণ আগুনের মতই জ্বলত—তাঁর কথাবার্তায়, লেখায় এর প্রকাশ দেখে তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়রা পর্যন্ত বিস্মিত হতেন। এমন কি বাংলার বিপ্লবীদেরও তিনি শ্রদ্ধা করতেন; ভালবাসতেন তাদের সর্বত্যাগী দেশপ্রেমকে। প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী নিকট সম্পর্কেই তাঁর মাতুল হতেন। সময়ে অসময়ে শরৎচন্দ্র নির্দ্বিধায় এঁকে গোপনে অর্থসাহায্য করতেন। যেসব রাজনৈতিক নেতা ভারতের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁরা দেবতা বলে গণ্য হতেন—এ কথা সর্বজনবিদিত। বিদ্রোহী কবি নজরুলকে তার আগুন-ঝরানো লেখার জন্যই অত ভালবাসতেন। হুগলী জেলে কবি যখন অনশন করেছিলেন, সেই সংবাদে শরৎচন্দ্র যারপরনাই উদ্বেগ বোধ করেন ও সেই অনশন ভাঙবার জন্য অনুরোধ করতে নিজে হুগলী জেলে গিয়ে নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'নজরুল একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।'

তাঁর দেশপ্রেমের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে আমরা এই আলোচনা শেষ করব। তখনকার দিনে 'বেণু' নামে একটি ছোট্ট মাসিক পত্রিকা ছিল। কয়েকজন দেশপ্রেমিক তরুণ এই পত্রিকা-খানি চালাতেন; তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি সামান্যই ছিল। 'বেণু'র সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। 'এই সামান্য পত্রিকাখানির তথা ইহার পরিচালকবর্গের প্রতি শরৎচন্দ্রের এরূপ স্নেহ ছিল যে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি তাঁহার 'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানি এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দেন। 'বেণু'-

সম্পাদককে যে পত্রখানি লেখেন (১৩৩৬, ১০ চৈত্র) তাহাতে সাহিত্যসেবায় উৎসাহ দানের সহিত আদর্শমণ্ডিত রাজনৈতিক চেতনাকে তিনি অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।'[১] মহাত্মা গান্ধীর যখন ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয়, তখন মুক্তি-সংগ্রামের এই মহান্ নেতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন: 'যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কিছু নাই, আর্তের জন্য পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে, যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল।[২]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হলেও শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের চরকা-আশ্রিত অহিংস মতবাদে খুব আস্থাবান ছিলেন না এবং এই রাজনীতিকে স্বাধীনতালাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলেও তিনি আর মনে করতেন না। তাঁর নিজস্ব একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছিল এবং নানা সভায়, নানা লেখায় তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করতে কখনো দ্বিধা করেন নি। মোটকথা, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মধ্যে দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রকে তাঁর স্বদেশবাসী যেন কোনদিন বিস্মৃত না হয়।

॥ তেরো ॥

১৯২২, আষাঢ় মাস।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

এই বৎসরে অকালে পরলোকগমন করেন লোককান্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য শোকসভার আয়োজন হয়েছিল কলকাতায়; একটি

১. শরৎ-চেতনা: শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২৯।

রামমোহন লাইব্রেরী হলে, অপরটি কলেজ স্কোয়ারের থিওজফিক্যাল্ সোসাইটির ভবনে। প্রথমটিতে সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর একান্ত স্নেহভাজন। এই সভায় প্রচুর লোক সমাগম হয়—তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। এই সভায় সেদিন মৃত কবির উদ্দেশে রচিত একটি সুদীর্ঘ এবং অপূর্ব কবিতা ব্যথা-বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে পাঠ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই শোকগাথার প্রারম্ভিক কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

'বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্র ভেরী। হে কবি দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় ;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে।'[১]

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মুখে শুনেছি, কবিকণ্ঠের এই আবৃত্তি সেদিনকার সেই শোকসভায় যে ভাব-গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল তার কোন তুলনাই হয় না। কবি তাঁর এই একান্ত স্নেহাস্পদ কবিকে কতখানি ভালবাসতেন এবং তার অকালমৃত্যুতে তিনি যে কতদূর ব্যথিত হয়েছিলেন তাই-ই প্রকাশ পেয়েছিল এই এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে।

কলেজ স্কোয়ারের সভায় সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। সরস্বতী ইনস্টিট্যুটের পক্ষ থেকে এই সভার আয়োজন হয়। এই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও 'বাতায়ন'-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। ইনিও পরে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। অবিনাশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁকে কবি সত্যেন্দ্রনাথের শোকসভায় সভাপতিত্ব করবার অনুরোধ জানাতে।...তিনি বললেন,

১. পূরবী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্র আমার বন্ধু ছিল, তাকে আমি খুবই ভালবাসতাম, তাই তার এই অকালমৃত্যুতে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু তাই বলে তার শোকসভায় সভাপতি হয়ে কতকগুলো বাজে কথা বলতে পারব না।...আমায় বাদ দিলে হয় না? আমি সভাপতি হয়েছি শুনে ভদ্রলোকেরা কেউ আসবেন না।'[১]

শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সম্মত হলেন। কোন সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করা তাঁর জীবনে এই প্রথম। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেদিন এই সভায় প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। শরৎচন্দ্রই ছিলেন এর প্রধান আকর্ষণ। অবিনাশচন্দ্র লিখছেন: 'অতি কষ্টে শরৎচন্দ্রকে ফটক থেকে উপরে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একে তো তিনি লাজুক মানুষ, তার উপর এই বিপুল জনতার ব্যূহ ভেদ করে দ্বিতলে এসে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সভার কার্য আরম্ভ হতে স্তব্ধতা বিরাজ করেছিল এবং সুশৃঙ্খলভাবে সভার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু তিনি যে ভাষণ দিলেন তা বড় কৌতুকপ্রদ। তিনি বললেন, আপনারা এখানে সত্যেন্দ্রর জন্য চোখের জল ফেললে কি হবে—তার বই পড়বেন তবেই তার স্মৃতি বজায় থাকবে। শরৎচন্দ্র জানতেন যে কবির জীবিতকালে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি বিশেষ বিক্রী হয় নি; তাই স্পষ্ট বক্তা শরৎচন্দ্রকে সেদিনকার শোকসভায় ঐরকম কঠিন মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র এখন খ্যাতিমান লেখক।

অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে আসার পর তাঁর প্রতিভার নব-নব সৃষ্টিতে নব-নব চমকের সৃষ্টি হয়েছে পাঠকসমাজে। তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে রেঙ্গুন থেকে চলে আসার পর 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' দিয়ে। ভারতবর্ষ পত্রিকাতেই এর প্রথম খণ্ড যখন 'শ্রীকান্ত শর্মা' এই নামে প্রকাশিত হয় তখন শরৎ-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি বাংলার সাহিত্য-গগনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

১. শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা: অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

সকলের দৃষ্টি এখন এই একজন লেখকের ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। হাটে-মাঠে ও স্কুল-কলেজে, শিক্ষিতদের বৈঠকখানায় ও সাহিত্যের মজলিসে—সর্বত্র তাঁরই কথা, তাঁরই গল্প-উপন্যাসের আলোচনা। সে-সব আলোচনার সবই যে প্রশংসাসূচক তা মনে করবার কারণ নেই। বরং বেশিরভাগই ছিল এর বিপরীত। তিনি বাংলা সাহিত্যে নোংরা জিনিসের আমদানি করেছেন—এটাই ছিল অধিকাংশের সোচ্চারিত অভিমত। তাঁর সাহিত্যে দুর্নীতির প্রাধান্য—নিষিদ্ধ প্রেমের ছড়াছড়ি, এই জাতীয় সব সমালোচনা যখন তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছত তখন শরৎচন্দ্রের মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিত তা অনুমান করা কঠিন নয়।

প্রতিভার সমাদর এইভাবেই হয়ে থাকে সর্বদেশে সর্বকালে। সকলেই জানেন বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর সময়ে একদল পণ্ডিত ভাল বলে নি, রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর কবি-জীবনের শুরু থেকেই বহু নিন্দাবাদ শুনতে হয়েছিল—বিরূপ সমালোচনার বান ডেকে গিয়েছিল তাঁর কবিতাকে উপলক্ষ করে। সে-সব কাহিনী আজ বিলীন হয়ে গেছে মহাকালের বিচারে। এত নিন্দার মধ্যেও তিনি নিজের সাধনায় অবিচল ছিলেন কেমন করে? তাঁর নিজের কথাতেই এর উত্তর দেওয়া যায়। তিনি বলেছেন: 'সাহিত্যের দিক দিয়ে কিছু করেছি বটে, কিন্তু যা করেছি তাতে জোচ্চোরি করি নাই—মানুষের কাছে বাহবা পাবার জন্য কিছু করি নাই। মনের মধ্যে আমার এই ভরসা ছিল যে, সত্যি জিনিসটা আমি ধরেছিলুম।'

শরৎ-প্রতিভার মধ্যাহ্নকালে প্রকাশিত হলো 'পথের দাবী'।

তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস।

'আনন্দমঠ'-এর পর, 'গৃহদাহ'-ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস।

'চরিত্রহীন' যেমন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ভারতবর্ষ ও সাহিত্য পত্রিকা থেকে, তেমনি 'পথের দাবী' ছাপবার সাহস কোন পত্রিকার হয় নি। সেই সাহস দেখিয়েছিলেন 'বাংলার বাঘ' আশু মুখুজ্যের

ছেলেরা। তাঁরা তখন 'বঙ্গবাণী' নাম দিয়ে একটি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। 'পথের দাবী' এই কাগজেই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সাল থেকে। তিন-চার বছর ধরে এটি চলেছিল। তারপর রাজদ্রোহের গন্ধ আছে বলে সেদিন কলকাতার কোন প্রকাশকই (এমন কি তাঁর একান্ত অনুরাগী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স পর্যন্ত নয়) এই বইটি প্রকাশ করতে সাহস পেল না। সাহস দেখালেন আশুতোষ-নন্দন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৩৩৩ সালে 'পথের দাবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো।

১৯২৬, আগস্ট। বাংলা ১৩৩৩, ভাদ্র মাস।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাদ প্রচারের অভিযোগে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার কর্তৃক এটি বাজেয়াপ্ত হয়। স্বাধীনতাকামী বাঙালীর কাছে পথের দাবী 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রে প্রকাশকালেই সুবিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং বাজেয়াপ্ত হবার পরও গোপনে এই গ্রন্থের ব্যাপক পঠন-পাঠন চলতে থাকে। সেই সঙ্গে লেখকের জনপ্রিয়তাও আবার তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ হওয়ায় পথের দাবী সম্পর্কে বিপ্লবী বাঙালীর আকর্ষণ অপ্রতিরোধনীয় হয়ে উঠল। রাতারাতি যেন শরৎচন্দ্র স্বদেশভক্ত নিগৃহীত পরাধীন দেশবাসীর প্রাতঃস্মরণীয় নাম হয়ে উঠলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হবার পর গ্রন্থটি মুক্তিকামী বাঙালীর কাছে প্রায় গীতার অনুরূপ মর্যাদা পেয়েছিল। আনন্দমঠ বা সীতারামের চেয়েও উগ্র এই রাজনৈতিক উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার স্বাক্ষর সবচেয়ে বেশি ফুটেছে বলে মনে হয়। ইংরেজ-বিদ্বেষের উজ্জ্বল অভিব্যক্তিই বইটিকে অমন জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এমন বই যে রাজরোষে পড়বে, এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না।

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

'শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া বলিলেন -এ সম্বন্ধে তাঁহাকে

প্রতিবাদ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একখানি বইও দিয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়িয়া শরৎচন্দ্রকে একখানি ঐতিহাসিক চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি তাঁহার মর্যাদা-বোধের স্মারক। ইহার মধ্যে বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কবিগুরুর প্রাজ্ঞ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথচ ইংরেজের জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ফুটিয়াছে। শরৎচন্দ্রের শক্তির প্রতিও শ্রদ্ধাভাব ফুটিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে শরৎচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষায় অক্ষমতা জানাইলেন। অভিমানের আবিলতা শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিল, তাঁহার স্থূল রাজনৈতিক চেতনা রবীন্দ্রনাথের এই অস্বীকৃতিতে অত্যন্ত আহত হইল। রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেন না, বড় করিয়া দেখিলেন আপন অহংবোধকে, তাঁহার যাচিয়া অনুরোধ করার ব্যর্থতাকে। তিনি রবীন্দ্রনাথের যুক্তিকে তলাইয়া দেখিলেন না, তাহার বহিরঙ্গ কাঠিন্যকে কটূক্তি মনে করিয়া এক কড়া প্রত্যুত্তর লিখিলেন।’[১]

অভিমান-ক্ষুব্ধ ঔপন্যাসিক কিন্তু এইখানেই নিরতি হন নি। তিনি তখন তাঁর মনের দুঃখ আর পাঁচজনকে জানাতে থাকেন। তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদা রাধারাণী দেবীকে একটা চিঠিতে লিখলেন: ‘ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে?’ শরৎচন্দ্র একটি বুদ্ধিমানের কাজ অবশ্য করেছিলেন। কবির এই চিঠি তিনি ইচ্ছা করলে তখনি স্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি ইংরেজী কাগজে ছাপাতে পারতেন। সেই সময় বিনাবিচারে অন্তরীণাবদ্ধ বাঙালী তরুণদের মুক্তির জন্য দেশে আন্দোলন হচ্ছিল; এই পত্র প্রকাশিত হলে সে-সব আন্দোলন নিষ্ফল হয়ে যেত। এই কথা চিন্তা করেই হোক, অথবা কবির প্রতি সম্মানবশতঃই হোক, শরৎচন্দ্র নিরস্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু শরৎ-শিবিরে সেদিন এই নিয়ে গুঞ্জন কম ওঠে নি।

---

১. শরৎ-চেতনা: শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্র দুটি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

শরৎ-অনুরাগীদের অনেকেই ছিলেন স্তাবকের দল। তাঁরাই তো এই দুই প্রতিভাধর ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কাজে তৎপর হয়েছিলেন। সে লজ্জাকর ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা নিরস্ত হলাম। রবীন্দ্রনাথ নাইট্‌হুড ত্যাগ করতে পারলেন আর আপনার বইটা বাজেয়াপ্ত হওয়ার জন্য প্রতিবাদ করতে পারলেন না?—এমন নির্বোধের যুক্তিও সেদিন শোনা গিয়েছিল। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শরৎচন্দ্রের ধ্যানের দেবতা; আজীবন তিনি তাঁকে সম্মান করে এসেছেন। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির অনুরাগ বড় কম ছিল না। তবু কেন যে তাঁর অনুরাগীবা মনে করতেন শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির বিমুখতার অবধি নেই—এ একটা রহস্য। তাই এই রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ আরো একটু আলোচনা করা দরকার।

'একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একজাতীয় অবচেতন ঈর্ষাবোধ ছিল। শরৎচন্দ্রের জীবৎকালে কবি কখনই তা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রও অভাবিত খ্যাতির স্বর্ণমুকুট পরে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার সিংহাসনে বসে বিশ্ববন্দিত মহাকবির প্রতিস্পর্ধার ভূমিকায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবতীর্ণ হয়েছেন একাধিকবার। ফলে সমকালীন এই দুই মহৎ সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বার বার বিড়ম্বিত বিঘ্নিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অতর্কিত আক্রমণ করে অনুতপ্ত হয়েছেন, তাঁর স্নেহ-প্রীতি লাভের জন্য একাধিকবার প্রার্থনার করপুট প্রসারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথও স্বভাব-সৌজন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার দুজনেই দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছেন। মৈত্রী বিরোধের এই নেপথ্য ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই।'[১]

আগেই বলেছি, ব্রহ্মদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় পৌঁছে শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি যখন যমুনা, সাহিত্য, ভারতবর্ষ

---

১. বাসিফুলের মালা: ডঃ অরুণ বসু। শারদীয় সত্যযুগ ১৩৮১।

ও ভারতী পত্রিকায় একে একে প্রকাশিত হতে থাকে তখন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাঠকচিত্ত জয় করে নিলেন। এক আগন্তুক কথাশিল্পী বাঙালী পাঠকের হৃদয়-সিংহাসনে গৌরবের আসন লাভ করলেন। ঠিক সেই সময়ে 'এদিকে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ধারা প্রায় অবসিত' হয়ে এসেছে। কবি তখন ব্যাপৃত হয়েছেন নানাবিধ কাজে। 'তারপর দীর্ঘ বিদেশবাস, প্রত্যাবর্তন, নোবেল পুরস্কার, দেশ-বিদেশে উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বলাকা কাব্যরচনা ইত্যাদি ঘটনাপরম্পরায় কবি ঠিক জনগণের কবি হয়ে উঠতে পারেন নি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলার সাহিত্য-জগতে নিঃশব্দে এক অঘটন ঘটে গেল। একদিকে রবীন্দ্রনাথ যখন ক্রমাগত হয়ে উঠছিলেন 'দূরবর্তী, সংকেতবাচী, বিদগ্ধের সূক্ষ্মতর অভিনিবেশের সামগ্রী, বুদ্ধিজীবীর অভিজ্ঞান, সমকালের অগ্রবর্তী,' অন্যদিকে তখনো পর্যন্ত একরকম অজ্ঞাত-পরিচয় লেখক 'শরৎচন্দ্র এরই মধ্যে অপরাজেয়তার যশোগৌরব হরণ করে বসে আছেন—যা ছিল একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের।' তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থগুলি এই সময়ের মধ্যেই (১৯১২-১৯১৬) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর অধিকাংশই ছিল তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা—তাঁর ভাগলপুর জীবনের সাহিত্য প্রয়াস। হোক অপরিণত, তথাপি 'নির্বিচার জনপ্রিয়তায় প্রবাসী শরৎচন্দ্র এগুলোরও আশাতীত মূল্য পেয়েছিলেন। এবং এইসব অপরিণত লেখার মধ্যেই শরৎ-সাহিত্যের যাবতীয় লক্ষণগুলি পাঠকদের চেনা হয়ে গিয়েছিল।

আমরা অনুমান করতে পারি, এই আগন্তুক সাহিত্যিক নিশ্চয় কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'বড়দিদি' পড়েই তো তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'বাংলাদেশে এর জোড়া লেখক পাবে না।' শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত রচনার সঙ্গেই কবি পরিচিত ছিলেন এবং সে-সব লেখার মধ্যে তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসের ছায়াপাত সত্ত্বেও 'শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রীতি মৌলিকতা-স্বকীয়তাকে স্বাগত' জানাতে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত

হন নি। রবীন্দ্র-শরৎ সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল ১৯১৬ সালের পর যখন শরৎচন্দ্র চাকরি ছেড়ে কলকাতা চলে এলেন এবং সাহিত্যকেই তাঁর জীবিকারূপে গ্রহণ করলেন। এই পরিচয় ঘটেছিল প্রমথ চৌধুরী ও অমল হোমের মাধ্যমে—এঁরা দুজনেই ছিলেন বিখ্যাত রবীন্দ্র অনুরাগী। তখন থেকে 'তিনি জোড়াসাঁকো বিচিত্রাভবনে যাতায়াত শুরু করে দেন। কলকাতার সাহিত্যিকমহল তাঁর নামে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত সংযত। এটা শরৎচন্দ্রের নজর এড়াবার কথা নয়।'

অতঃপর? শরৎচন্দ্র তখন পাঠকসমাজের idol হয়ে উঠেছেন, হয়ে উঠেছেন অন্তঃপুরিকাদের প্রিয়তম লেখক আর তরুণ ছাত্র-সমাজের জপের মালা। ফলে, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক আলোচনায় জনমত শরৎচন্দ্রের দিকেই হেলে পড়েছিল। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতার অনেক কাহিনীও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল।' অমল হোমের ভাষায়, 'দুই পক্ষেরই অনুরাগী অথবা স্তাবকবৃন্দ এ-পাড়ার কথা ও-পাড়ায় চালাচালি করতেন এবং এর ফলেই তো এই দুই প্রতিভাধরের মধ্যে একটা সাময়িক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল।' তার ওপর শরৎচন্দ্র তখন তৎকালীন কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন বলে তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ প্রীতিলাভ করেছিলেন। যে কয়টি পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেগুলি তো তখন রীতিমত রবীন্দ্র-বিরোধী শিবিরে পরিণত হয়েছিল। এইসব শিবিরে যাঁদের নিত্য আনাগোনা ছিল 'তাঁরাই শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্ধী এক সাহিত্যান্দোলনে নেতৃপদে বসালেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর একজন কথা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ঘোষণার সুস্পষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।' এখানে উল্লেখ্য যে, অনুরূপ বিড়ম্বনা কবির জীবনেও ঘটেছিল নজরুলকে নিয়ে। সে কাহিনী স্বতন্ত্র; এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সত্যিই কি শরৎচন্দ্র কবি সম্পর্কে অসহিষ্ণু ছিলেন?

অথবা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সম্পর্কে অনুদার?

মনে তো হয় না। কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব (১৯৩১) বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেদিন কবিকে যে মানপত্রটি তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল সেটি শরৎচন্দ্রেরই রচনা ছিল।[১] এ ছাড়া প্রথম দিনের উৎসবে টাউন হলে আয়োজিত রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। সেদিনকার ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন ঃ 'কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সরল, সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো। তুমি দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাংলার ভাষা ও ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েচো বড় করে।' তেমনি রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের পরের বছরে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের যে জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য কবি আসতে না পারায় তাঁর লিখিত আশীর্বাণী পাঠিয়ে দেন। কবি লিখেছিলেন ঃ 'কল্যাণীয়েষু শরৎচন্দ্র, তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত; তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয় নি।...দাঁড়ি টানার সময় তোমার নয়। এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব-নব রচনা-বিস্ময়ে নব-নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি হতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি। তুমি পাবে সমাদর।...তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেচি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি।'

এই বাণীটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রকে ঐদিন যে পত্রটি লিখেছিলেন সেটিও এখানে উল্লেখ্য ঃ

১. মানপত্রটি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

'তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেচ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার। তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্তবস্তুকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্যবেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ুসঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

কবির দেওয়া এই দান মাথায় করে নিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁকে একটি পত্রে (২৯ আশ্বিন, ১৩৩৯) লিখেছিলেন ঃ 'শ্রীচরণেষু, কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।'

এর পরেও কি রবীন্দ্র-শরৎ বিরোধ সম্পর্কে আর কোন কথা বলা চলে? শরৎচন্দ্র নিজেই রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের পর এই বিরোধের যবনিকা টেনে একটি পত্রে অমল হোমকে লিখেছিলেন ঃ 'কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি। রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত আর কেউ নেই, আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানে নি গুরু বলে,—আমার চাইতে বেশিবার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য পরম সত্য আমি জানি।'

এমন অকপট স্বীকারোক্তি একমাত্র শরৎচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব।

॥ চৌদ্দ ॥

রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড়।

শরৎচন্দ্রের প্রিয় বাসস্থান সামতা।

বছর দশেক শিবপুরে বাস করার পর শরৎচন্দ্র ১৯২৫ সালে এইখানে একটি বাড়ি তৈরী করে উঠে এলেন। কলকাতার নিজস্ব বাসভবনে উঠে আসার আগে পর্যন্ত তিনি এইখানেই বাস করতেন এবং সেই সময়ে সাহিত্যিকদের সমাগমে এটিও একটি সাহিত্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। বস্তুতঃ তখনকার দিনে সাহিত্যপ্রিয় বাঙালীর কাছে আকর্ষণের স্থান ছিল দুটি জোড়াসাঁকো আর সামতাবেড়; একটি স্থানের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের জন্য (অবশ্য কবি যখন শান্তিনিকেতন থেকে এসে এখানে অবস্থান করতেন তখন,) অপরটি শরৎচন্দ্রের জন্য। এখানে উল্লেখ্য, যে বছরে শরৎচন্দ্র সামতায় বাড়ি তৈরী করান তখন এখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল। তিনি মুক্তহস্তে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের অন্নদান করেছিলেন; তারা দু'হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করল। দরিদ্র ও নিরন্নদের সেই আশীর্বাদকে সম্বল করেই তিনি এইখানে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁর সামতা-জীবন তাই সুখ-শান্তিতে ভরে গিয়েছিল। আর সেই পরিবেশের মধ্যেই চলেছিল তাঁর সৃষ্টির কার্য।

ইতিমধ্যে তাঁর খ্যাতির পরিধি অনেকটা বর্ধিত হয়েছে।

অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের ইংরেজী অনুবাদ (১৯২২)। অনুবাদ করেছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই. সি. এস. ও অধ্যাপক টি. টমসন্ এবং এই অনুবাদের মাধ্যমেই ইংলণ্ডের পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সাধিত হয়। তখন য়ুরোপের কথাসাহিত্য জগতের প্রতিভাধর শিল্পী রোমাঁ রোল্যাঁ—ভারতপ্রেমী রোল্যাঁ। ইতালীয় ভাষায় তিনি শ্রীকান্তের অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হন ও এর লেখককে তিনি প্রথম

শ্রেণীর সাহিত্যিক বলে স্বীকৃতি দিলেন (১৯২৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বেই তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান করে শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (১৯২৩)।

দেশবন্ধুর 'পঞ্চপ্রধান'-এর অন্যতম নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—যাঁকে তখন বলা হতো 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' (ওয়েলিংটন স্ট্রীটে, যার বর্তমান নাম নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট, এঁর বাসভবন; সম্ভবতঃ সেজন্য লোকে তাঁকে ঐ নামে ডাকতো)—ছিলেন তখনকার দিনে কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী সমাজে একজন অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। আইনজীবী ছিলেন, কিন্তু শিল্পসাহিত্যগত প্রাণ ছিলেন। শরৎচন্দ্রের গুণমুগ্ধদের মধ্যে ইনিও একজন ছিলেন। 'আত্মশক্তি' ভিন্ন শহরে তখন ভাল সাপ্তাহিক পত্রিকা একটিও ছিল না। নির্মলচন্দ্র 'রূপ ও রঙ্গ' নাম দিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন (১৯২৪) এবং তাঁরই অনুরোধক্রমে শরৎচন্দ্র এই পত্রিকাটির সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন।

১৯২৫। এপ্রিল মাস।

ঢাকা মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বসল।

এই অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্বাচিত হলেন শরৎচন্দ্র।

এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। এই জাতীয় অনুষ্ঠানে সেই তাঁর প্রথম যোগদান। অবশ্য এর অল্পকাল আগে, শিবপুরে অবস্থানকালে, তিনি একবার স্থানীয় সাহিত্যসমিতির একটি অধিবেশনে সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।[1] তারপর কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন (১৩৩১)। শিবপুরের বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষণে আধুনিক সাহিত্যের একটি কৈফিয়ৎ রেখেছিলেন; তিনি সর্বাংশে এর যোগ্য ছিলেন, কারণ এর একমাত্র প্রবক্তা ও পুরোধা তো সেদিন

১. ১৩৩০ সালের ১৬ আষাঢ় শিবপুর ইনস্টিটিউটে এই সভাটি হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তিনিই ছিলেন। কৃষ্ণনগরের বক্তৃতায় তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল সাহিত্য ও নীতি। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি তখন নীতিবাগীশদের শিবির শরৎ-বিরোধী কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল ; রব উঠেছিল, শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছেন। এত বড় তুষ্কার্য তিনি কি করে করলেন, এই বক্তৃতায় সেইটাই ছিল তাঁর প্রধান বক্তব্য আধুনিক সাহিত্যের একজন সেবক হিসেবে। এই বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন :

'ভাল-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে—ভালকে ভাল মন্দকে মন্দ বলায় কোন art-ই কোনদিন আপত্তি করে না। কিন্তু তুনিয়ার যা কিছু সত্যই ঘটে নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হতে পারে কিন্তু সত্য সাহিত্য হয় না। অর্থাৎ যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্যবস্তু বলি নে, তেমনি যা ঘটে না অথচ সমাজ বা প্রচলিত দিক দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশি বিড়ম্বনা ঘটে।'

শরৎ-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে তখন চারদিকে সাহিত্যে আর্ট ও তুর্নীতি নিয়ে একটা প্রচণ্ড সোরগোল উঠেছিল। আজ এই দূর-কালের ব্যবধানে, আমরা যখন সেদিনকার বাংলা সাহিত্য-জগতের সেই বিতর্ক-বিক্ষুব্ধ পরিবেশের কথা চিন্তা করি তখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে হয় তথাকথিত সমাজ-নিন্দিত এই যুগসাহিত্যিক ধীর স্থিরভাবেই প্রত্যক্ষ করতেন তাঁর বিরুদ্ধদলের বিষোদ্গার। সেই বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করেই তো তিনি হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। মুন্সীগঞ্জের বক্তৃতায়—এটি অত্যন্ত যত্ন ও চিন্তার সঙ্গে রচিত তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা—শরৎচন্দ্র তাই সাহিত্যে আর্ট ও তুর্নীতির বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র যে একজন মননশীল প্রবন্ধকারও ছিলেন, তাঁর এই ভাষণটি তারই একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমার তো মনে হয় তাঁর এই রচনাটি আজো তার মূল্য হারায় নি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার

করার যোগ্য ব্যক্তি সেদিন আর কেই বা ছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই ভাষণটি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

ইংরাজীতে Idealistic ও Realistic বলে দুটো শব্দ আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না। অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন্ ধার ঘেঁষে চলবে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্বের মত রাজরাজরা জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপসোসের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে সমাজের নীচের স্তরে আরও নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'

পল্লীর আলো-ছায়া-ঘেরা জীবন শরৎচন্দ্রের সর্বপরিতৃপ্তির অন্যতম ছিল। তাইতো রূপনারায়ণের তীরে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সামতাকে। পল্লীপ্রীতি ছিল তাঁর মজ্জাগত। 'বাল্য এবং যৌবন-কালটায় অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি।'—এ শরৎচন্দ্রের নিজেরই কথা। সামতার বাড়িতে তাঁর সংসার বলতে তিনি, সহধর্মিণী হিরণ্ময়ী দেবী, কনিষ্ঠ সহোদর প্রকাশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের পুত্র-কন্যা মুকুলবালা ও অমলকুমার—এই ছয়জন। আরো দুজনের নাম করতে হয়—ভৃত্য ভোলা আর কুকুর ভেলি। তাঁর মাতুল পরিহাস করে বলতেন, ভেলি কুকুর নয়, সাহিত্য-সম্রাটের যুবরাজ। যুবরাজের মতই আদর-যত্ন পেত এই সারমেয়-নন্দনটি তার মনিবের কাছে। বলতেন, 'ভেলিকে আট আনা দিয়ে

বড়বৌ কেনে, এতটুকু বাচ্চা। তারপর আমাদের আদর-যত্নে এত বড়টি হয়। ও আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।' আরো বলতেন, 'মানুষের সবচেয়ে বড় শিক্ষাদীক্ষা জীবজন্তু থেকেই। এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।' সামতাবেড়ের বাড়ির অতন্দ্র প্রহরী ছিল ভেলি। তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়েরা জানতেন শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের কতখানি স্থান জুড়ে ছিল এই কুকুরটি।

বাড়িতে গৃহ-বিগ্রহও ছিল একটি।

রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এই যুগলমূর্তিটি ১৯২৪ সালের একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শরৎচন্দ্রের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। এই বিগ্রহের পূজা তিনি স্বয়ং প্রত্যহ করতেন। বাড়িতে একটি সুন্দর বাগানও ছিল। বাগানের সখ তাঁর চিরকাল। গ্লোব নার্সারি থেকে ভাল ভাল গোলাপ গাছ এনে পুঁতেছিলেন। সকলেই জানেন সামতাবেড় গ্রামটির জন্য শরৎচন্দ্র কত করেছেন—স্কুল, রাস্তা, কত কি! দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দেউলটি স্টেশনে নেমে একটু এগিয়ে গেলেই তাঁর বাড়ি। মাঠের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা আর বাঁধের ওপরকার ধূলিভরা উঁচুনীচু পথ পেরিয়ে, পাড়ার ভেতরকার দু'-একটা ভাঙা-ভাঙা জটিল রাস্তা শেষ করে তবে পৌঁছতে হয় সাহিত্য-সাধকের এই নিভৃত বাসস্থানে। বাড়িটা একেবারে রূপনারায়ণের ওপর। সামনেই স্বচ্ছ অবিক্ষুব্ধ নদ—রূপালি জলে পূর্ণ। পাশে একটি বারান্দায় শরৎচন্দ্রের বসবার আসন। বারান্দার সামনে নদীর দিকে একটি ছোট ঘর—লেখার সরঞ্জামে ভর্তি থাকত এই ঘরটি। বসবার আসনের ঠিক সামনে ছোট্ট একহারা একটি জানলা, তার ভেতর দিয়ে রূপনারায়ণ হঠাৎ এসে চোখে পড়ে। বাইরে থাকত শরৎচন্দ্রের নিজস্ব দু'-তিনটি আসন আর সুদৃশ্য বৃহদাকার গড়গড়া। নলটি মুখে লাগিয়ে লিখতেন একমনে। ধোঁয়া যখন আর বেরুত না তখন হাঁক দিয়ে উঠতেন, ভোলা, তামাক দিয়ে যা। মুহূর্তমধ্যে ভোলা এসে একটা মস্ত বড় কলকে গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে যেত। এই চিত্র আজো কল্পনা করতে ভাল লাগে।

একাদিক্রমে প্রায় দশ বছর শরৎচন্দ্র তাঁর এই নব-নির্মিত বাস-ভবনে বাস করে সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সাহিত্যকর্মের কি রকম উপযুক্ত পরিবেশ তিনি এখানে রচনা করেছিলেন তারই একটা সুন্দর চিত্র এখানে তুলে ধরছি।

'শরৎচন্দ্রের লেখাপড়ার ঘরটি ছিল একেবারে বাড়ির বাইরে। শুধু একটা বারান্দা দিয়ে যুক্ত ছিল সেটা বাড়ির সঙ্গে। ঘরটার পাশেই ছিল বাগানের একটা বিরাট অংশ। এই বাগানটা শরৎচন্দ্র নিজের হাতেই তৈরী করেছিলেন। সেই বাগানের সামনে একটা বড় জামগাছ ছিল। শরৎচন্দ্র ওই গাছটার একেবারে পাশেই মাধবী আর মালতী ফুলের দুটো গাছ পুঁতেছিলেন। তাই মাধবী ফুল ভরে থাকতো ওই জাম গাছটায়। আর ওই জাম গাছটার একটা ডালেই থাকতো মালতীর লতা। থোপা থোপা কুঁড়িতে ভরে থাকতো তখন ওই মালতী লতাটা। একটা বাতাবিলেবুরও গাছ ছিল সেখানে। সেটাতেও ফুল ফুটে থাকতো তখন। আর ওই ফুলের গন্ধ তখন ভেসে আসতো শরৎচন্দ্রের ওই লেখাপড়ার ঘরটাতে। সমস্ত বাগানটাকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র যে, একদিকে ছিল বকুল-কুন্দ-করবী, অন্যদিকে ছিল মালতী—মাধবী-বাতাবির সমারোহ।'[১]

সকলেই জানেন, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বাসভবনের পরিবেশও ছিল এমনি সুন্দর, এমনি রমণীয়। শরৎচন্দ্র কবি-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। তাইতো দেখি তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন রূপনারায়ণের তীরে তাঁর নির্জন পল্লীভবনের এই মনোরম পরিবেশ। সাহিত্য-সৃষ্টির উপযুক্ত সন্দেহ নেই। এই পরিবেশেই রচিত হয়েছিল দত্তা, শ্রীকান্ত, বিপ্রদাস আর শেষ প্রশ্ন।

সামতাবেড়ের বাসভবনে শরৎচন্দ্র শুধু তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়েই ছিলেন না। তাঁর হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে তিনি আকর্ষণ করেছিলেন

১. সাহিত্যের অন্তরালে শরৎচন্দ্র : ছবি মুখোপাধ্যায়

স্থানীয় অধিবাসীদের, হয়ে উঠেছিলেন তাদেরই আপনজন। এই দরিদ্র গ্রামটির উন্নতির জন্য তিনি চিন্তা করতেন, অর্থব্যয় করতেন। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র দেব লিখেছেন :

'সামতাবেড় দরিদ্র গ্রাম। একটা ডাক্তার পাওয়া যায় না সহজে। শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা যত্ন করে শিখেছিলেন দরিদ্রের সেবা করবার জন্য। গ্রামের যত চাষাভূষো দীন-দরিদ্র কুলি-মজুর সবার সঙ্গে তিনি ডেকে আলাপ করতেন। তাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন। ছেলেমেয়ের অসুখ করেছে শুনলে চিকিৎসা করতেন। বিনামূল্যে ওষুধ দিয়ে তাদের ভাল করে তুলতেন। কিন্তু রোগীর পথ্য দরিদ্র গ্রামবাসীরা দিতে পারত না। শরৎচন্দ্র নিজব্যয়ে তাদের পথ্যেরও ব্যবস্থা করতেন। এমনি করে তিনি সারা গ্রামের দাদাঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন।'

বাড়ি নয়, যেন একটি আশ্রমতুল্য স্থান হয়ে উঠেছিল সামতাবেড়ের এই আবাসভবন। তাঁরই আদর-যত্নে প্রতিপালিত কেঁদো বাঘের মতো প্রকাণ্ড সারমেয়-নন্দন ভেলী তো ছিলই; এছাড়া বেওয়ারিশ একটি কুকুরও ছিল। একদিন দুটি ছাগশিশুকে কসাইদের হাত থেকে বাঁচিয়ে, টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। সেই ছাগশিশু দুটিও তাঁর গৃহে অপত্যস্নেহে পালিত হয়েছিল ও কালক্রমে বড় হয়ে উঠে আশ্রম-মৃগের মত শরৎচন্দ্রের উদ্যান-প্রাঙ্গণে যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়াত। গৃহস্বামী যখন তাদের নাম ধরে ডাক দিতেন, অমনি তারা এক দৌড়ে তাঁর কাছে এসে হাজির হতো ও তাঁর হাত থেকে আম নিয়ে খেতো। ঔপন্যাসিকের জীবনের এদিকটাও যেন আমাদের আজো কল্পনা করতে ভাল লাগে।

এইবার মঞ্চে শরৎ-শিশির প্রতিভার সংযোগের কথা।

এ যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ ছিল।

শরৎচন্দ্র যেমন তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভেতর দিয়ে বাঙালীর হৃদয়ের

গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ও পাঠকসমাজে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলেন, তেমনি গিরিশোত্তর মৃতকল্প বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অলোকসামান্য প্রতিভা ঠিক তা-ই করেছিল —দর্শক সাধারণের রসানুভূতির মূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। মঞ্চে এই দুই শক্তিধর প্রতিভার মিলন প্রত্যাশিত ছিল, অনিবার্য ছিল। কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাব ও মঞ্চে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাব—বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এই ঘটনা দুটি নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে মঞ্চে শরৎ-শিশির প্রতিভার সংযোগের ইতিহাস। সেই ইতিহাসই আমরা বলছি। কারণ এর উল্লেখ ব্যতিরেকে শরৎচন্দ্রের জীবন কাহিনী অনেকখানি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

দ্বাদশ সূর্যের তেজে মধ্যাহ্ন গগন উদ্ভাসিত করে বাংলা পেশাদার থিয়েটার-জগতে একদা এই শতকের দ্বিতীয় দশকের সূচনাকালেই প্রবেশ করেছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯—১৯৫৯)। হিসেব মতো তিনি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা তেরো বছরের ছোট ছিলেন; সেই কারণে তিনি তাঁকে শরৎদা বলে ডাকতেন। তিনি শরৎচন্দ্রের ও তাঁর সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; শিশিরকুমার স্বয়ং ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও একজন বিদগ্ধ সাহিত্য-রসিক। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র-কাব্যের আবৃত্তি তখনকার কলকাতার শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথও শিশির-কুমারের অভিনয় প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক অভিনয়ে কবির অভিনয়-প্রতিভা ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখেই তো তরুণ শিশিরকুমার মঞ্চ-সংস্কারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

শরৎ-প্রতিভার মধ্যাহ্নকালে রচিত হয় তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'দেনা-পাওনা' (১৯২৩)। এর ঠিক এক বছর পরেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেন যুগপ্রবর্তক শিশিরকুমার। মনোমোহন থিয়েটারের মঞ্চে তিনি স্থাপন করেন তাঁর নিজস্ব রঙ্গালয় নাট্যমন্দির। এরই উদ্বোধন হয়েছিল ৬ আগস্ট, ১৯২৪ 'সীতা' নাটক দিয়ে।

'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্প লিখে শরৎচন্দ্র যেমন একদিনেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তেমনি 'সীতা' নাটকের অভিনয় ও উপস্থাপনা-কৌশল এক রাত্রেই এই নবীন নটের ললাটে এঁকে দিয়েছিল গৌরবের টীকা। তখন থেকেই 'শিশির ভাতুড়ী' নামটি থিয়েটার-জগতে এবং শিল্পরসিক-মহলে লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। বছর তুই পরে নাট্যমন্দিরের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে 'শ্রী' মঞ্চে। এইখানেই শিশিরকুমার নিজের প্রতিভাবৈচিত্র্য প্রদর্শনের চরম সুযোগ পেয়েছিলেন; এইখানেই তিনি নাট্যকলার নানা বিভাগে নানা রূপে দেখা দিয়েছিলেন। এই ছিল শিশির-প্রতিভার মধ্যাহ্নকাল। এইখানেই নাট্যামোদী দর্শক প্রথম দেখতে পেল রবীন্দ্র-শিশির প্রতিভার বিস্ময়কর সম্মেলন 'বিসর্জন' নাটকের মাধ্যমে। কি অভিনয়, কি প্রযোজনা সকল দিক দিয়েই এই নাটকের অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। 'সীতা' নাটকের অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন, 'বিসর্জন' দেখে তিনি আরো চমৎকৃত হলেন।

১৯২৭ সালে শিশির-প্রতিভার দিক্-পরিবর্তন সূচিত হলো শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকে। তখন 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিশিরকুমার বইটি পড়লেন ও ভাবলেন এর নাট্যরূপ দিলে কেমন হয়। তাঁর বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়কে তিনি জানালেন তাঁর মনের অভিলাষ। তারপর হেমেন্দ্রকুমার রায়কে সঙ্গে করে তিনি নিজেই একদিন সাক্ষাৎ করলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ও তাঁকে দেনা-পাওনা উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের ফলশ্রুতি শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটক। এই 'ষোড়শী' নাটকই মঞ্চে শরৎ-শিশির প্রতিভার সম্মেলনকে সার্থক করে তুলেছিল। এর 'জীবানন্দ' চরিত্রের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় ছিল তাঁর প্রতিভার একটি পরমাশ্চর্য সৃষ্টি যা দেখে শরৎচন্দ্র যারপরনাই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই তো তাঁর প্রথম জীবনে একজন বড়দরের অভিনেতা ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের দুই-একখানা বই-এর নাট্যরূপ পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়, এমন ইচ্ছা তাঁর অনুরাগী ও অন্তরঙ্গস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ করতেন। একজন প্রস্তাব করেন 'দেবদাস'-কে নাটক করতে। তিনি রাজী হন নি, বলেছিলেন, ওটা আমার ছেলেবেলার লেখা। আর একবার তিনি বলেছিলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান, নাটক লিখে হবে কি? অভিনয় করবে কে? যারা থিয়েটারের মালিক তারা যাতে দু'পয়সা পেয়ে থাকে এমনি নাটকই করবে। তাদের তো নাটকের ছক বাঁধা আছে। মরলেও তারা তার বাইরে যাবে না।

তখন শিশিরকুমারের কথা একজন বলেন। শরৎচন্দ্র বলেন, শিশিরের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ আছে। এর কিছুকাল পরেই জানা গেল শরৎচন্দ্র শিশিরকুমারের জন্য 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিতে আরম্ভ করেছেন। শহরের নাট্যামোদী-মহলে কথাটা জানাজানি হতেই দারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। শরৎচন্দ্র তখন থেকেই শিশিরকুমারের থিয়েটারে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতেন ও নাটক নিয়ে খুব আলোচনা করতেন। এমনি একদিনের আলোচনা-বৈঠকে এই লেখকের থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। শিশিরকুমারের নাট্যরসিক অনেক বন্ধু-বান্ধবকে সেদিনের বৈঠকে দেখা গিয়েছিল। নাটক লেখা সম্পূর্ণ হয়েছে, বাকী ছিল শুধু এর নামকরণ ও নাটকের শেষ দৃশ্যটি নিয়েও আলোচনা করার ছিল।

—শিশির, নামটা কি হবে ঠিক করলে?

—হ্যাঁ শরৎদা। আপনার এই নাটকের নাম হবে 'ষোড়শী'।

শরৎচন্দ্র আপত্তি করলেন না। বললেন, শেষ দৃশ্যটা তুমি নাকি বদলাতে চাও?

—হ্যাঁ শরৎদা। আপনার উপন্যাসে ঠিক যেরকমটি আছে, আমি ভেবে দেখলাম ওটা alter করে জীবানন্দের মৃত্যু দেখাতে হবে, নইলে নাট্যরস জমবে না, dramatic effect সৃষ্টি হবে না আর জীবানন্দ-চরিত্রের ট্র্যাজেডিও ফুটবে না।

শরৎচন্দ্রের প্রবল আপত্তি ছিল এই পরিবর্তনে। তাঁর যুক্তি ছিল—এ সংসারে যে কিছুই পেলে না, বা যার পাবার সব আশা ফুরিয়ে গেছে, এমন লোক বাঁচল কি মরল, উপন্যাস বা নাটকে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু শেষজীবনে জীবানন্দ যা পেয়েছে তা তার এতদিনকার বঞ্চিত জীবনকে শুধু ভরিয়েই তুলেছে তা নয়—তা তাকে মানুষের মত বাঁচবার একটা প্রেরণা দিয়েছে। তবে তাকে মেরে ফেলার সার্থকতা কি? শিশিরকুমার এ যুক্তি মানতে চাইলেন না।

নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল।

প্রাচীরপত্রে নাট্যমন্দিরের নূতন নাট্যপ্রয়াসের কথা বিঘোষিত হলো। এই পোস্টারেই শিশিরকুমার সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্র সম্পর্কে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' এই বিশেষণটি ব্যবহার করেন এবং তখন থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে এটি প্রযুক্ত হয়ে সাহিত্য-জগতে তাঁকে এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

১৩৩৪ (ইং ১৯২৭), ২১ শ্রাবণ, শনিবার।

নাট্যমন্দিরে 'ষোড়শী' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী।

ষোড়শীর বিজ্ঞাপনেও বেশ অভিনবত্ব ছিল—নাট্যমন্দিরের জয়যাত্রার শুরু থেকেই এই অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়েছিল নানাভাবে।[১] বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল: 'অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অপূর্ব প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—নূতন সামাজিক নাটক ষোড়শী। ষোড়শী ভৈরবী, গড়চণ্ডীর প্রধানা সেবিকা, সন্ন্যাসিনী। অফুটন্ত কোরকটির মত—সে যখন অতি ছোট মেয়ে, নারীর প্রাণের গোপন ক্ষুধার রহস্য তার হৃদয়ের দ্বারে কোন আঘাত দেয় নি—সেই সময়ে এক অর্ধরাত্রির স্তিমিত আলোকে তন্দ্রাতুরা চোখে সে

---

১. লেখকের 'শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ইহাই নাট্যাচার্যের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য জীবনী; তাঁর মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকীতেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাসহ

দেখেছিল শুভবিবাহের শুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার স্বামীকে—সে রাত প্রভাত হলো না—তার আগেই জীবনের খরস্রোতে কোথায় ভেসে গেল স্বামী আর কোথায় ভেসে গেল স্ত্রী। একজন তলিয়ে গেল জীবনের পঙ্কিলতার তলায়—আর একজন ভেসে উঠল পঙ্কের স্পর্শ থেকে উর্ধ্বের শুভ্র পঙ্কজের মত। দুজনে দেখা হলো। এই দেখার গতি ও পরিণতি নিয়েই ষোড়শী নাটক।'

শরৎচন্দ্র নাট্যমন্দিরের এই প্রচারপত্রটির লিপিকুশলতার খুব প্রশংসা করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, শিশিরকুমারের নির্দেশে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এটি রচনা করেছিলেন। ষোড়শীর প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম ছিলঃ জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী; প্রফুল্ল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়; এককড়ি—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য; তারাদাস—শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায়; জনার্দন—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী; সাগর—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা। বিপুল দর্শক সমাগমের মধ্যে নাট্যমন্দিরে ষোড়শীর উদ্বোধন এবং একবাক্যে তার প্রশংসা একদিকে ...বাংলা থিয়েটারে সামাজিক নাটকের অভিনয় ও উপস্থাপনায় যেমন একটা দিক্‌-পরিবর্তনের সূচনা করে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি স্বাগত জানিয়েছিল নাট্যকার শরৎচন্দ্রকে—নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবে অনেকেরই মন পুলকিত হয়ে উঠেছিল।

শরৎচন্দ্রের নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করবার সৌভাগ্য ছিল শিশিরকুমারের। তাঁর আগে শরৎচন্দ্রের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করার কথা কেউ চিন্তা করেন নি, বা চিন্তা করবার সাহস পান নি। শরৎচন্দ্র যুগস্রষ্টা ঔপন্যাসিক, বাঙালীর প্রিয়তম লেখক। শিশিরকুমারও যুগস্রষ্টা নট। তাইতো তিনি মনে করলেন, মঞ্চের ওপর যদি শরৎ-প্রতিভার প্রভাব পড়ে তা'হলে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সুনিশ্চিত। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশিরকুমারের এই ধারণা খুবই দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। শরৎ-শিশির প্রতিভার সম্মেলন বিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারের পক্ষে

যথার্থই শুভ হয়েছিল। নাট্যমন্দিরে 'ষোড়শী' নাটক অভিনয় হবার পরবর্তী এক যুগ তো বাংলা থিয়েটারে শরৎ-নাটকের যুগ। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি শিশিরকুমারই মঞ্চস্থ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের নাটকের উপস্থাপনায় ও অভিনয়ে তিনিই সেদিন ছিলেন অদ্বিতীয়। শিশিরকুমার সর্বসমেত ছয়খানি শরৎ-নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন, যথা— ষোড়শী, রমা, বিজয়া, বিরাজবৌ, বিপ্রদাস ও অচলা। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনখানি ছিল শরৎচন্দ্রের লেখা, বিরাজবৌর নাট্যরূপ ছিল শিশিরকুমারের, অচলার মাত্র দুটি অঙ্ক শরৎচন্দ্রের লেখা। রমা ছিল পল্লীসমাজের নাট্যরূপ। বিজয়া 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ আর অচলা ছিল গৃহদাহের নাট্যরূপ। ১৯৩৪ সালের বড়দিনে নব-নাট্যমন্দিরে বিজয়া মঞ্চস্থ হয়। রাসবিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন শিশিরকুমার। বিজয়া যদিও দত্তা থেকে নেওয়া কিন্তু শরৎচন্দ্র অনেক কিছু বদলে, একরকম একখানি নূতন নাটকই লিখে দিয়েছিলেন। 'বিপ্রদাস' যখন মঞ্চস্থ হয় তখন শরৎচন্দ্র জীবিত ছিলেন না; শিশিরকুমারের নির্দেশে এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। শরৎচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পর বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি প্রভৃতি গল্পগুলিও অন্যান্য মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। গৃহদাহের নাট্যরূপ অচলা মঞ্চে খুব বেশি সফলতা লাভ করতে পারে নি। এইভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা থিয়েটারে শরৎচন্দ্রের নাটক সগৌরবে অভিনীত হয়েছিল। রূপালী পর্দাও বাদ যায় নি—তাঁর একাধিক উপন্যাস ও গল্পের চিত্ররূপ চলচ্চিত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছিল ও বাংলা চলচ্চিত্রকে কাহিনীর দৈন্য থেকে রক্ষা করেছিল। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অদ্বিতীয় পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' চলচ্চিত্রটি তো সেদিন রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এইভাবেই সাহিত্যে, মঞ্চে ও পর্দায় শরৎ-প্রতিভার উদ্ভাসনে যে বিচিত্র ভাব-মণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন তা এক কথায় তুলনাহীন। এ ছিল যেন বিজয়-শ্রীমণ্ডিত একটি সুমহৎ প্রতিভার আলোকোৎসার।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ্য। ষোড়শী নাটক লিখে নাট্যকার

হিসেবে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রন্থাকারে নাটকটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে তিনি তাঁর মতামত প্রার্থনা করেন। প্রত্যাশিত প্রশংসার বদলে শরৎচন্দ্র পেলেন কিছু সমালোচনা, কিছু স্তুতি, সব মিলিয়ে একটি মিশ্র মনোভাব।' নাট্যকার তখন ক্ষুণ্ণমনেই কবিকে একটি পত্র লিখলেন। কালের বিচারে তাঁর সাহিত্য চিরস্থায়ী হবে কিনা—এমনি একটা সংশয়ের সুর ছিল তাঁর এই চিঠির মধ্যে।[১]

॥ পনেরো ॥

১৯৩১।

বাঙালী পাঠককে শরৎচন্দ্র উপহার দিলেন 'শেষ প্রশ্ন'।

বিতর্কের ঝড় উঠলো তাঁর লেখা এই নূতন উপন্যাসটিকে উপলক্ষ করে, যেমনটি উঠেছিল 'চরিত্রহীন'কে নিয়ে। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন পঞ্চান্ন বৎসর। এই উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক উন্মোচিত হতে দেখে সবাই বিস্মিত হলো। হৃদয়াবেগ নয়, বুদ্ধির দীপ্তি, যুক্তির দীপ্তি ঠিকরে পড়েছে এর প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকে। আবার কেউ বললে, এটা উপন্যাসই হয় নি—শুধু বিতর্কমূলক মতবাদে ঠাসা। তত্ত্ব আছে, শিল্প নেই। এঁর ঠিক দু'বছর আগে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে এমনি বিতর্ক উঠেছিল। অন্যত্র আমরা এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, আপাততঃ তাঁর জীবনের কাহিনীকে অনুসরণ করে, 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে এইসব বিরুদ্ধ সমালোচনায় তাঁর মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই কথাই বলব।

১. রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের এই পত্র দুটি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদককে একটি পত্রে (৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮) শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটি যে তোমার এতখানি ভাল লেগেছে, এতে ভারি আনন্দ পেলাম। এর ভেতর সামাজিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা আছে, কিন্তু সমাধানের ভার তোমাদের হাতে। ভবিষ্যতের এই সুকঠিন দায়িত্বের সম্ভাবনাই হয়তো তোমাদের এত বড় আনন্দ দিয়েছে। অথচ, আমার ধারণা এই বহু লোককেই নিরাশ করবে, তারা কোন আনন্দই পাবে না। একে তো গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পড়তে হয়, হুহু করে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মত নিশ্চিন্ত আরামে অর্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলে না। এ ভাল লাগবার কথা নয়। তবুও লিখেছিলাম এই ভেবে যে, কেউ কেউ তো বুঝবে, আমার তাতেই চলে যাবে। সকল প্রকার রস সকলের জন্যে নয়। অধিকারী ভেদটা আমি মানি।'

রাধারাণী দেবীকে একটি চিঠিতে লিখছেন ঃ 'শেষ প্রশ্ন' তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগার মানুষ বাংলাদেশে হয়ত পাবো না, শুধু গালিগালাজই অদৃষ্টে জুটবে; দেখচি কিন্তু ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়।…একটি মেয়ে লিখচেন তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এ বইটা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মত বিবতরণ করতেন।…অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটু ইঙ্গিত; বুড়ো হয়ে এসেচি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি; এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম।…মনের মধ্যে বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেল—সময় হলো না দিয়ে যাবার—তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা শেষ প্রশ্নে করেচি।'

অনুরূপ চিঠি তিনি দিলীপকুমার রায়কেও লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র স্বয়ং এই উপন্যাসটিকে তাঁর বিশেষ সৃষ্টি বলেছেন। বলেছেন, অতি আধুনিক সাহিত্যের দিকটায় একটা ইশারা রেখে গেলেন তিনি

এখানে। বাংলা-সাহিত্যে এই অতি আধুনিকতা দেখা দিয়েছিল কল্লোল-গোষ্ঠীর আবির্ভাবে। এই গোষ্ঠীর তরুণ লেখকরা 'শেষের কবিতা' পড়ে উচ্ছ্বসিত হলো, কিন্তু বিরূপ সমালোচনা করলো 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে। তাদের বক্তব্য : শরৎ-প্রতিভা এখন নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, তাদের ভাষায়, 'তিনি ফুরিয়ে গেছেন'। অতএব তাঁর লেখনী এখন যা প্রসব করবে তা তো অসার্থক রচনাই হবে। তাঁর কাছে আমাদের আর কিছু আশা করবার নেই। ইত্যাদি ধরনের বিরূপ মন্তব্য, বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি প্রকাশ্যেই কল্লোল-গোষ্ঠীর বিরোধিতায় নামলেন। তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন : 'রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হলে যে মানুষ আনন্দবোধ করে, মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এসব চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার।'

১৯৩২।

'রসচক্র' নাম দিয়ে কবি কালিদাস রায় একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতর অন্তরঙ্গস্থানীয়দের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন। রসচক্রের সঙ্গে তাই শরৎচন্দ্রের নিবিড় সম্পর্ক বরাবরই বিদ্যমান ছিল। এই বছর রসচক্রের পক্ষ থেকে সমকালীন বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে একটি সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে কালিদাস রায়কে একটি পত্রে (৫ ভাদ্র, ১৩৩৮) শরৎচন্দ্র লিখলেন : 'ভাই কালিদাস, অনেকেই জানে না যে যতীনকে আমি সত্যই ভালবাসি। আমি তার কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের লেখা পাই, বার বার করে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে কানে যেন কত কি বলতে থাকে। শুধু কেবল কবি বলে নয়, যতীনের ভেতরে এমনি একটি স্নেহ-সরস, বন্ধুবৎসল, ভদ্র মন আছে যে তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।...

আমি যেতে পারলাম না ; যতীনকে বোলো শরৎদা তাঁকে এই চিঠির মারফত স্নেহাশীর্বাদ পাঠিয়েছেন।'

সাহিত্যসেবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের যে কি আন্তরিক ভালবাসা ছিল তারই নিদর্শন এই পত্রখানি। এমনি দৃষ্টান্ত আরো আছে।

বাংলা-সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় ও অজাতশত্রু 'দাদা' ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনের সংবর্ধনা এই বছরের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই সংবর্ধনার আয়োজন করেন সারা বাংলার সাহিত্যসেবীবৃন্দ নিখিল বঙ্গ জলধর-সংবর্ধনা নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই 'মুসাফির' সাহিত্যিক-অগ্রজের সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ—সে শুধু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নয়, সহজ, সরল, নিরভিমান একটি মানুষ হিসেবেই। কতদিন তিনি চুরুটটি মুখে দিয়ে শরৎচন্দ্রের শিবপুর অথবা সামতাবেড়ের বাড়িতে গিয়ে লেখার জন্য ধরনা দিতেন। তাই সকলের অনুরোধক্রমেই সংবর্ধনা কমিটির সভাপতি শরৎচন্দ্রকেই হতে হলো—রবীন্দ্রনাথ সে সময় দেশে ছিলেন না। রামমোহন লাইব্রেরী হলে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। সভায় প্রবীণ-নবীন বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। সেই স্মরণীয় সংবর্ধনা সভায় স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে জলধর সেনকে একটি রৌপ্যাধারে করে যে মানপত্র প্রদান করা হয়েছিল সেটি শরৎচন্দ্রই রচনা করেন ও তাঁরই নামে মুদ্রিত হয়। সুন্দর ভাবসমৃদ্ধ ও অনুপম ভাষায় রচিত সেই মানপত্রটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

'হে বরেণ্য অগ্রজ! তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের মানসলোকে তুমি পরমাত্মীয়ের স্থান লাভ করিয়াছ। বাণীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, দুর্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন, শঙ্কাকুল কত আগন্তুকজনই না সাহিত্য-পূজার বেদীমূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে। সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ

বিতরণ করিতে, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতোই সে সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ, সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই ব্যথিত যে-জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।'

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে তিনি নিজের খরচে নিজের হাতে অভিনন্দন দিয়েছিলেন। এ ঘটনা ১৯৩৭ সালের অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের লোকান্তর গমনের মাত্র এক বছর আগের কথা। সাহিত্যিকদের তিনি কি রকম প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, এই ঘটনাটি তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অসমঞ্জবাবুর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে একদিন তাঁর বাড়িতে বসে তাঁর নিজের মুখে এই অভিনন্দন-সভার যে কাহিনী এই গ্রন্থের লেখক শুনেছিলেন তারই সারাংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

'শরৎদা একদিন আমাকে বললেন, জীবনে অনেক জায়গা থেকে অনেক অভিনন্দন আমি পেয়েছি, অর্থাৎ আমি খালি নিয়েছি, কারুকে কিছু দিই নি। সেইজন্যে অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে, আমি একজনকে অভিনন্দন দিয়ে যাব। এই কথা শুনে মনে মনে ভাবতে লাগলাম, শরৎচন্দ্র নিজের হাতে অভিনন্দন দেবেন যাঁকে, সেই ভাগ্যবান সাহিত্যিকটি কে হতে পারেন? তখন অশীতিপর বয়স্ক জলধরদার নামটাই প্রথমে মনে হয়েছিল। শরৎদাকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, না। আরো দুজনের নাম করলাম এবং সেই একই উত্তর পেলাম। দারুণ কৌতূহল জাগল আমার মনের মধ্যে। এমন সময়ে একদিন কবিশেখর কালিদাস রায় আমাকে জানালেন যে, শরৎচন্দ্র আমাকে অভিনন্দন দেবেন। তিনি নাকি কবিশেখরকে বলেছেন, তোমার রসচক্রের একটা বড় অধিবেশনের মাধ্যমে অসমঞ্জকে একটা অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা কর। আমি নিজেই ওকে অভিনন্দিত করব। জ্যৈষ্ঠ মাসের দোসরা তারিখ রবিবার এই অভিনন্দন আমি লাভ করি তাঁর হাতে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার

তিনিই বহন করেছিলেন। মানপত্রের সঙ্গে পেয়েছিলাম মুর্শিদাবাদী গরদের জোড়, রূপোর চন্দন-বাটি ও ট্রে-সমেত একটি সুন্দর টি-সেট। প্রত্যেকটি দ্রব্যই উৎকৃষ্ট ছিল। বেলগাছিয়ার দ্বারকা-কানন নামক একটি দ্বিতল বাগানবাড়িতে দুপুরবেলায় এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। অসুস্থ দেহে, জ্যৈষ্ঠের সেই প্রখর রোদে শরৎচন্দ্র এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুসারেই শাস্ত্রীয়বিধি অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। বহু কবি ও সাহিত্যিকের সমাগমে দোতলার বড় হলঘরটি পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নিজের হাতে আমাকে ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, কপালে চন্দনের টিপ দিলেন। আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে নীচের প্রশস্ত দালানে শুরু হয় ভোজনপর্ব। আহার্য দ্রব্যের আয়োজন সত্যই রাজকীয় ছিল—পরিপাটি, প্রচুর ও ত্রুটিহীন। দৈহিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে শরৎচন্দ্র সেদিন মনের আনন্দে সকলের সঙ্গে আহারে বসেছিলেন এবং পেটভরে সবকিছুই খেয়েছিলেন। প্রায় এক হাজার টাকার মতো তিনি খরচ করেছিলেন আমাকে অভিনন্দন দেবার ব্যাপারে। তাইতো আজ ভাবি, তিনি যত বড় লেখক ছিলেন, তার চেয়েও মানুষ হিসেবে শরৎচন্দ্র ছিলেন শতগুণে বড়—বড় ও মহৎ।'

১৯৩২ সালে স্বাস্থ্যের অজুহাতে য়ুরোপে নির্বাসিত হলেন সুভাষ-চন্দ্র। শরৎচন্দ্র যারপরনাই ব্যথিতচিত্তে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন—ফিরে এলেন আবার তাঁর সাহিত্যিক জীবনে। রূপনারায়ণের শান্ত তীরে আর তাঁর মন বসে না। কলকাতায় বালীগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডে একটি দোতলা বাড়ি তৈরী করে এখানে চলে আসেন তিনি ১৯৩৪ সালে—জীবনের শেষ কয়টা বছর তিনি এইখানেই অতিবাহিত করেন। এই সময় থেকেই তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্য দুই-ই ভেঙে পড়েছিল। ১৯২৮ সাল থেকেই দেশে শুরু হয় শরৎ-বন্দনা, তাঁর জন্মদিনটিকে (১১ ভাদ্র) উপলক্ষ করে। তখন থেকে

তাঁর মৃত্যুর আগের বছর পর্যন্ত তিনি নয়-দশবার সংবর্ধিত হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটি সংবর্ধনা সভায় তিনি যেসব অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে যেমন শরৎ-মানসের অনেকখানি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, তেমনি তাঁর জীবনোপলব্ধিও আভাসিত হয়েছে সেখানে। এর দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই।

৫৩তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ১৩৩৫ সালের ৩১ ভাদ্র ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে। দেশবাসী-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেনঃ 'যে কাল আজও আসে নি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্তমানের সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে তখন পথ তাকে তো ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায় সে শুধু এইজন্যেই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে।'

৫৫তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনা সভায়[১] বললেনঃ 'আধুনিক সাহিত্য-বিচারেও এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য রচনায় আর যাই হোক না কেন শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্ররুচি ও মার্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বার বার আঘাত করতে থাকলে বাংলা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক না কেন, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশি।' শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিনের উৎসবটাই হয়েছিল সমারোহপূর্ণ—এইটাই ছিল প্রকৃত শরৎ-জয়ন্তী। দুটি অনুষ্ঠান হয় এই উপলক্ষে যথা, একটি টাউন-হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা, অপরটি সেনেট হলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা। নাগরিক সংবর্ধনায় কবি তাঁর

১. এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সমিতির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশীর্বাণী প্রেরণ করেছিলেন, এ-কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন ঃ

'মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন ছলেই স্বীকার করো না; সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ যদি পরম দুঃখের পথও হয়, তাহলে দুঃখবরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করো। দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করচে, সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না; তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে।'

শেষের দিকে একাধিক সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত মানপত্রে যখন সেই একই কথার পুনরুক্তি করে বলা হতো, 'আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি' তখন একবার শরৎচন্দ্র বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি সাহিত্যিকের মতো হয়ে এই বাংলাদেশকে আরো কিছু দিতে পারি, সে শক্তি ভগবান যদি রাখেন এবং তার সঙ্গে যদি দীর্ঘজীবন দেন আপত্তি নেই, কিন্তু সে যদি না থাকে, যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে সেই জীবন কারুরই কাম্য নয়, বিশেষ করে সাহিত্যিকের তো নয়ই।'

সুখের বিষয়, ভগবান তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত করে পঙ্গু করে দীর্ঘজীবন প্রদান করেন নি; তাঁর প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে আসার পূর্বেই সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত থেকেই শরৎচন্দ্র জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

তাঁর সমকালীন গুণীজনদের প্রতি শরৎচন্দ্রের কি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৩৪ সালে কবি ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যুতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে টাউন-হলে যে শোকসভার অনুষ্ঠান হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি। সভাপতির ভাষণে তিনি লোকান্তরিত সুরকারের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেছিলেন ঃ 'গানের ভেতর দিয়ে, কাব্যের ভেতর দিয়ে অতুলপ্রসাদ বাংলাভাষার অনেক উন্নতি করেছেন। তাঁর গানের মত ছিল তাঁর জীবন। এমনি

করে এই ধারা ধরে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা বড় করেছেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদের মধ্য একজন—বিশিষ্ট একজন।'

১৯৩৫ সালে পাঠকসমাজকে তিনি উপহার দিলেন 'বিপ্রদাস' — তাঁর প্রতিভার শেষ উদ্ভাসন।

১৯৩৬ সালটি তাঁর জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির প্রিয়তম ঔপন্যাসিককে 'জগত্তারিণী' পদক দিয়ে সম্মানিত করেছে, এইবার পদ্মার ওপার থেকে সম্মানের ডালি এলো—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে সম্মানিত 'ডি লিট.' (সাহিত্যাচার্য) উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই বছরের জুলাই মাসে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তিনজন কৃতী বাঙালী সন্তানকে একই সঙ্গে এইভাবে সম্মানিত করেছিলেন। তাঁরা হলেন—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য যদুনাথ সরকার ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; এঁরা তিনজনেই তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার অবদানে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন জাতির মানসলোক। এই সম্মান নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রাপ্য ছিল।

শরৎচন্দ্র যখন তাঁর কলকাতার নব-নির্মিত স্থানে বাস করছিলেন তখন একদিন তাঁর কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উপাচার্যের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র এলো। সেই পত্রে তাঁকে এই উপাধি প্রদানের কথা জানিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল যে তিনি যেন এটা গ্রহণ করতে অসম্মত না হন। শরৎচন্দ্র, শুনেছি, এই চিঠি পেয়ে খুব বিব্রতবোধ করেছিলেন। তাঁর এক অনুরাগীকে বলেছিলেন, আমি তো আর পাস-টাস করি নি, তবে কেন আমাকে এই উপাধি দেওয়া? এ ব্যাপারটায় আমার তেমন মন উঠছে না। যখন তাঁকে বোঝানো হলো যে, এর সঙ্গে পাসের কোন সম্পর্ক নেই, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা জিনিসটা ভেবে দেখতে চাইছ না কেন? হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডি. লিট. দিতে উদ্যোগী হলো কেন? আমি যে এই বিষয়ে কোন তদ্বির করি নি—এটা কি আমার দেশের

কাগজওয়ালারা বিশ্বাস করবে? শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনেক বুঝিয়ে এই উপাধি গ্রহণে সম্মত করান হয়েছিল।[১]

আসল কথা, তখন বাংলার বুকে চলেছে এণ্ডার্সনীয় শাসনের স্টীম-রোলার। স্যারজন এণ্ডার্সন ছিলেন তখন এই প্রদেশের গভর্ণর। স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে তখন তিনি কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন—সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে তিনি সেই সময়ে বাংলায় শাসনের নামে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন তা নাকি তাঁর পূর্বতন রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[২] তাঁরই সময়ে বক্সার জেলে, হিজলী ও দেউলির বন্দীশিবিরে হাজার হাজার বাঙালী তরুণদের বিনাবিচারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ইনিই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'পথের দাবী' গ্রন্থের লেখকের পক্ষে তাই সহসা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রস্তাবে বিব্রতবোধ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেমের এটাও ছিল একটা বড় নিদর্শন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পাঞ্জাবে সেই ডায়ারী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যখন 'নাইট্‌হুড' ('স্যার' উপাধি) ত্যাগ করেন তখন দেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে কবির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে না দেখে শরৎচন্দ্র যারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, চাঁদে কলঙ্ক রয়ে গেল।

যথাসময়ে শরৎচন্দ্র ঢাকা এলেন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করলেন। তখন এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই উত্তপ্ত ছিল। ঢাকার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি নাকি বলেছেন এবার তিনি মুসলিম সমাজ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন। দুঃখের বিষয়, এই সংবাদটির সত্যাসত্য বিচার না করেই কলকাতার কাগজে সেদিন তাঁকে উপলক্ষ করে গালিগালাজের যে

১. শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা: অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল।

২. বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে আসার পূর্বে ইনি আয়ার্ল্যাণ্ডের গভর্ণর ছিলেন ও সেই সময়ে সেখানকার জাতীয় আন্দোলন দমন করবার জন্ম কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

বন্যা বয়ে গিয়েছিল তা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল বললেই হয়। তখন শরৎচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থনে যে উক্তি করেছিলেন তা বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। বলেছিলেন: 'সাহিত্যের কোন জাত নেই। আমি যে মুসলমান সমাজের মানুষ নিয়ে উপন্যাস লিখব বলেছি সে কি প্রোপাগাণ্ডা করবার জন্যে? তা নয়। মানুষের কথা নিয়েই তো সাহিত্য—তা সে যে সমাজেরই হোক না কেন? লিখতে জানলে সব সমাজের মানুষ নিয়েই লেখা যায়।'

এ মানব-দরদী লেখক শরৎচন্দ্রেরই উপযুক্ত কথা।

শরৎচন্দ্র যখন ঢাকায় এসে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সম্মান গ্রহণ করেন তখন ঢাকা কলেজে বাংলার অধ্যাপনা করতেন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। উভয়ে উভয়ের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাই সেই সময় মোহিতলাল একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক তাঁকে বললেন, মোহিত, আমি এখন মৃত্যু কামনা করি।

—নিজের মৃত্যুকামনা করা ও আত্মহত্যা করা একই কাজ—আপনার মুখে এমন কথা বের হওয়া উচিত নয়।

—না, তোমার বয়সে তুমি এ বুঝবে না। মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সুখ-দুঃখ সকল চেতনাই মন থেকে মুছে যায় এবং জীবনকে আর তিলার্ধ সহ্য করতে পারে না। আমার তাই হয়েছে। আমি দুঃখ বা সুখের কথা ভাবছি না—আমি জীবন থেকে অব্যাহতি চাই মাত্র।

জীবনের পূজারী শরৎচন্দ্রের মুখে তাঁর জীবন-সন্ধ্যায় এই কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন মোহিতলাল। জীবনের ওপর শেষ যবনিকা-পতনের তখনো দু'বছর বিলম্ব ছিল, তথাপি তার আগে থেকেই জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের এই যে বীতরাগের ভাব, এর রহস্য কি?

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মোহিতলালের এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে আরো একটু আছে। সকলেই জানেন, মোহিতলাল ছিলেন ষোল আনা বঙ্কিমভাবের ভাবুক; তাঁর 'বঙ্কিম-বরণ' বইটিই তার অভ্রান্ত নিদর্শন

বহন করে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অনুদার মনোভাব প্রসিদ্ধ ছিল। তাই সেদিন তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠলো তখন শরৎচন্দ্র বলেছিলেন: 'দেখ, লোকে বলে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী নই—আমার যেন তাঁর প্রতি একটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে। দেখ, জীবনের সত্যকে, যত বড় কবিই হোক, লঙ্ঘন করতে পারে না। নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের সমাজে সংস্কারের মত বদ্ধমূল হয়েছে, তা যে কত মিথ্যা, তা আমি জানি বলেই কারো লেখার দায়িত্বহীন কল্পনার অবিচার আমি সহ্য করতে পারি না। ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট করে দেখতে হবে—নারীর জীবনের যেটা সবচেয়ে ট্র্যাজেডি, তাকেই একটা কুৎসিত কলঙ্করূপে প্রকাশ করতে হবে—এর মধ্যে কবিপ্রাণের মহত্ত্ব বা কবিকল্পনার গৌরব কোথায়। আমাদের সমাজে যে নিদারুণ অবিচার প্রতিনিয়ত ঘটছে, সাহিত্যে যদি তারই পুনরাবৃত্তি দেখি, তবে মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য স্বীকার করা সম্বন্ধে হতাশ হতে হয়। বঙ্কিম-চন্দ্রের হাতে রোহিণীর দুর্গতির কথা যখন ভাবি, তখন আমার মনে বার বার এই কথাই জাগে—মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে, আমরা এমন করিয়াই তার অপমান করি। রোহিণীর কলঙ্ক ও তার শাস্তি এই পর্যায়ের, এমন একটা নারী-চরিত্রের কি দুর্গতিই বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন।'

বঙ্কিম-শরৎ প্রসঙ্গ আমরা যথাস্থানে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। আপাততঃ আমরা তাঁর জীবন-কাহিনী অনুসরণ করব। ঢাকায় অবস্থানকালে স্থানীয় মুসলিম ছাত্রসমাজ শরৎচন্দ্রকে এক সাহিত্য-সভায় কিছু বলার জন্য নিমন্ত্রণ করে।[১]

তিনি তাদের সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, পদ্মার ওদিকের মুসলিম পাঠকগণ শরৎচন্দ্রের অনুরাগী ছিল—'মহেশ'

১. ঢাকা মুসলিম ছাত্রসমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। এই নির্বাচন সর্ববাদীসম্মত ভাবেই হয়েছিল এবং এর থেকেই সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল মুসলিম পাঠকসমাজে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা।

গল্পটি তাদের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। অতঃপর তিনি মুসলমান সমাজের নর-নারীদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন, এই কথা জানার পর শরৎচন্দ্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঢাকায় এসে তিনি মনে-প্রাণে অনুভব করলেন যে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ এদেশের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁকে যতখানি শ্রদ্ধা করে, আর কাউকে এত শ্রদ্ধা করে না। সেই সাহিত্য-সভায় তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'জেনো আমার শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে তোমাদের সমাজ নিয়ে আমি নিশ্চয়ই লিখব। আমার ভবিষ্যৎ উপন্যাসে প্রাধান্য দেব তোমাদের সমাজ-জীবনের।'

কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পালনের অবসর তিনি ইহজীবনে আর পান নি, কারণ এর পর তিনি মাত্র দু'বছর বেঁচেছিলেন রোগজীর্ণ শরীর নিয়ে। ঢাকায় অবস্থান কালেই শরৎচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঢাকা থেকে অসুস্থ শরীর নিয়েই ফিরলেন। কিছুদিন পরে চিকিৎসকের উপদেশানুসারে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি দেওঘরে চলে যান। কিন্তু সে অসুখ থেকে তিনি আর কোনদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি।

১৯৩৭।

বাঙালীর প্রিয়তম ঔপন্যাসিক একষট্টি বছরে পদার্পণ করলেন।

রবিবাসরের উদ্যোগে 'উদয়ন' সম্পাদক অনিলকুমার দে'র বেলিয়াঘাটাস্থ 'প্রফুল্ল-কানন' নামক উদ্যানবাটিতে শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হলো। ইহকালে তাঁর জীবনে এটাই ছিল শেষ জন্মতিথি উৎসব পালন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ। তিনি স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত থেকে সেদিন এক লিখিত অভিভাষণে শরৎচন্দ্রকে জানালেন অভিনন্দন। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানটি কবির সুবিধা মত ৩১ ভাদ্রের পরিবর্তে হয়েছিল ২৫ আশ্বিন। কবি

তাঁর ভাষণে শেষবারের মত শরৎ-প্রতিভার মূল্যায়ন করে বললেন ঃ 'কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র, তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছো। বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয় নি ; তোমার সাহিত্যরস-সত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে দেশের লোক তোমার দ্বারে।'

সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অঞ্জলিপুটে সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে শরৎচন্দ্র বললেন ঃ 'জীবনে যা সত্য বলে উপলব্ধি করেছি, আমার সাহিত্য-সাধনায় তাই-ই স্থান পেয়েছে। অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েচি।' তারপরে ভাষণের শেষে বললেন, 'আবার যদি জন্মদিন ফিরে আসে দেখা হবে, নইলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায়।' হায়, সেদিন কে জানতো, তাঁর মুখের উচ্চারিত এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে! তাঁর জীবনে ৩১ ভাদ্র আর ফিরে আসে নি।

১৯৩৮।

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ বৎসর।

তিনি কোনদিনই স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারী ছিলেন না। শেষের তিন-চার বছর অসুখে অসুখে তাঁর শরীর জীর্ণ হয়ে যায়। সাহিত্যিক ও অনুরাগীজন কেউ দেখা করতে এলে বলতেন—'যাবার সময় হলো বিহঙ্গের।' রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। শরৎচন্দ্রের অন্তিমযাত্রার কাহিনী সত্যিই বেদনাদায়ক। গল্পে ও উপন্যাসে যিনি অসংখ্য জীবন-মৃত্যুর নিপুণ চিত্র এঁকেছেন, সেই শিল্পীর জীবনের শেষ অধ্যায়টি ছিল যেন একটি পরিপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক। মানুষের জীবন যে চিরস্থায়ী নয়, এ কথা তিনি ভাল করেই

জানতেন। সেজন্য তাঁর মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। যাঁরাই শেষের দিকে তাঁর কুশল কামনা করতে ২৪ নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে অথবা সামতায় তাঁর পল্লীভবনে যেতেন তাঁরাই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, স্নিগ্ধ ভাবময় দৃষ্টিতে তাঁর শীর্ণ মুখখানি সর্বদাই অপরূপ হয়ে থাকতো। ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস শুরু হয়েছে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তা আর তিনি শেষ করতে পারেন নি। কলকাতায় বাড়ি করেছিলেন বটে, কিন্তু সর্বক্ষণ তাঁর মন পড়ে থাকত রূপনারায়ণের তীরে তাঁর সামতার বাড়িতে। এইখানে নদীর ধারে মেজ ভাই প্রভাসচন্দ্রের[১] সমাধির ওপর তিনি সাদা পাথরের একটি বেদী তৈরী করিয়েছিলেন। শিবপুরে বাসার গৃহ-সংলগ্ন অঙ্গনে ছিল তাঁর প্রিয় কুকুর ভেলির সমাধি; এর ওপর একটি স্তম্ভও নির্মাণ করিয়েছিলেন। সামতার নির্জন ও রমণীয় পরিবেশের মধ্যে থাকতে তার এত ভাল লাগত। এইখান থেকেই তিনি শেষ যাত্রা করেছিলেন কলকাতায় অস্ত্রোপচারের জন্য, ঠিক যেমনটি আমরা ঘটতে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের জীবনে। শান্তিনিকেতন থেকে তিনিও একদিন কলকাতায় এসেছিলেন অস্ত্রোপচারের জন্য। শরৎচন্দ্র আর সামতায় ফিরে যাননি, রবীন্দ্রনাথও ফিরে যান নি তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতনে।

'বাত-অর্শ-ম্যালেরিয়া-অজীর্ণ। প্রায় কোন রোগই বাকী নেই। কলকাতায় মাঝে মাঝে এসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে দেখিয়ে যান। কোথাও তাঁর একনাগাড়ে বেশিদিন থাকতে ভাল লাগে না। পড়াশুনো, লেখালেখি একরকম বন্ধ। শরীর ক্রমেই নেতিয়ে আসছে। শরৎচন্দ্রের মনে আর সেরকম জোরও নেই। সামতাবেড়ের গ্রামের বাড়িতে একদিন তিনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন, এবার বুঝি তোমাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে হয়, সুরেন মামা।

---

১. ইনি সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে এঁর নাম ছিল স্বামী বেদানন্দ। এঁকে নিয়ে চাটুয্যে বংশে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হওয়া চলেছিল।

—কি যে বলো, অসুখ কি আর মানুষের হয় না?

—হয়। তবে মনে হচ্ছে, এবার বোধ হয় আমাকে কালে ধরেছে। আমি আর বাঁচব না, সুরেন।

—এটা তো ঠিক তোমার মতো মানুষের কথা হলো না? কত শক্ত, কত দৃঢ় ছিল তোমার মন। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এখন দেখছি ফলিত জ্যোতিষে গিয়ে ঠেকেছ। কোথায় গেল তোমার সেই চিরদিনের দুর্জয় সাহস?

—ভুগে ভুগে খুঁটি আমার আলগা হয়ে গেছে যে। শরীর আমার বরাবরের মতোই ভেঙেছে। এখন বাঁচা শুধু বিড়ম্বনা।

শূন্য দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র চেয়ে রইলেন। প্রাণপণে চোখের জল রুদ্ধ করে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, শরৎ, অন্ততঃ দিন কয়েকের জন্যে তুমি কলকাতায় চলো। খানিকটা হাওয়া বদল করলে মন আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

—গ্রাম ছেড়ে যেতে মন চাইছে না যে। বাড়ি ফেলে—

—বা রে, সেখানেও তো তোমার বাড়ি! বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-শুনোও হবে। তাছাড়া এক্স-রে করিয়ে জানা দরকার রোগটা কি।

—রোগ জানবে আর কি। বিধানবাবু দেখে হয়তো বলবেন ম্যালেরিয়া, নয়তো সাংঘাতিক একটা রোগ—

—সাংঘাতিক কিছু হলে তার চিকিৎসাও তো আছে। ধন্বন্তরীর হাতে সে ভার না হয় তখন ছেড়ে দিও।

চোখ দুটো বন্ধ করে শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কয়েকদিন টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়া সাব্যস্ত হলো। হিরণ্ময়ী দেবী সঙ্গে যেতে চাইলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে অনেক করে বোঝালেন।

—ভয় কি, বড়বৌ? যাব আর দেখিয়েই চলে আসব। তুমি ভেবো না। খোকা রইল, দেখাশুনা করবে তোমাদের।

ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রেরই আদরের নাম খোকা। প্রকাশচন্দ্র ছলছল চোখে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলতে নেই বড়বৌ।

হিরণ্ময়ী দেবী তাড়াতাড়ি চোখ মুছলেন। শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেলেন গোবিন্দজীকে প্রণাম করতে। দেশবন্ধুর সেই গোবিন্দজী। পালকির পাশে দাঁড়িয়েছে সকলে। গ্রামের লোক ভিড় করে এসেছে। সকলেরই চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ম্লান ছায়া। শরৎচন্দ্রের শুকনো পাণ্ডুর মুখ। অবিন্যস্ত সাদা চুল গুচ্ছ-গুচ্ছ কপালে এসে পড়েছে। পায়ে দামী কাজ-করা মোজা, বার্নিশ-করা জুতো। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে তারপর তাড়াতাড়ি পালকিতে উঠে বসলেন। গ্রামের রাস্তা দিয়ে পালকি চলেছে। শরৎচন্দ্র অনুভব করতে লাগলেন জীবন যেন অনন্ত যাত্রায় চলেছে।

অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ি। শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে শুয়ে। তাঁর অসুস্থতার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চেনা-অচেনা, আত্মীয়-বন্ধু-ভক্তের দল মুহুর্মুহুঃ খবর নিতে আসছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় নিয়েছেন তাঁর চিকিৎসার ভার। শরৎচন্দ্র কখনো আশা অনুভব করেন, কখনো ম্রিয়মাণ হন। এত লোকের এত ভালবাসা তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। এই তো জগৎ, এই তো মানুষ, এই তো জীবন!

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পরীক্ষা করলেন। দুরারোগ্য অন্ত্রের ব্যাধি—লিভারে ক্যান্সার। এক্স-রে করা হলো। যকৃৎ পচে গেছে। অস্ত্রোপচার দরকার। খবর পেয়ে প্রকাশচন্দ্র সামতাবেড় থেকে হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গে করে চলে এসেছেন। একটি ইউরোপীয় নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু জায়গাটা তাঁর পছন্দ হলো না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার সুশীল চ্যাটার্জীর পার্ক নার্সিং হোমে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হলো। ডাক্তার ললিত বাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে অস্ত্রোপচার করার কথা বললেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র। অস্ত্রোপচারে শরৎচন্দ্রের সম্মতি পাওয়া গেল। দুর্বলতার দরুণ শরীরে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হলো। প্রকাশচন্দ্র নিজের শরীর থেকে রক্ত দিলেন।

অস্ত্রোপচার-পর্ব ভালোভাবেই সমাধা হলো। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় দুজনেই উপস্থিত ছিলেন অপারেশন থিয়েটারে। কড়া নির্দেশ দেওয়া হলো, শরৎচন্দ্রকে যেন মুখ দিয়ে কিছু খাওয়ানো না হয়। বমির দমকে পেটের সেলাই ছিঁড়ে গেলে কিছুতেই তখন আর রোগীকে প্রাণে বাঁচানো যাবে না।'[১]

১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮। ২রা মাঘ ১৩৪৪।

রাত্রির দ্বিপ্রহরে নার্সিং হোমে নির্বাপিত হলো শরৎচন্দ্রের জীবনদীপ।

নিস্পন্দ হয়ে গেল সেই দুঃখ-বেদনার রহস্যবিদের জীবন-স্পন্দন।

অনন্তলোকে যাত্রা করলেন বাংলার বর্তমান সমাজচিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

অন্তিম মুহূর্তে তাঁর মুখের উচ্চারিত শেষ কথা ছিল: 'আরও দাও, আমাকে আরও দাও'। শেষের পরিচয় আর শেষ হলো না। রোগজীর্ণ সেই পাণ্ডুর মুখখানি যেন আত্মার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। বাংলা সাহিত্যকে প্রাণের আলোয় প্রদীপ্ত করে দিয়ে, চিরবিদায় নিলেন বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

॥ ষোলো ॥

শরৎচন্দ্রের জীবন-পরিক্রমা শেষ হলো।

সমাপ্ত হলো তাঁর জীবনের কাহিনী।

এই জীবন-শিল্পীর জীবন ও মৃত্যু দুই-ই ছিল ঠিক যেন তাঁরই প্রতিভার সৃষ্টি একটি নিটোল ও বর্ণাঢ্য উপন্যাস যার পাতায় পাতায়

১. অনন্তযাত্রা : নন্দদুলাল চক্রবর্তী

আছে দুঃখ-বেদনা, হাসি-অশ্রুব্যথা ও আনন্দ। আছে বঞ্চিত-স্নেহ আর উপেক্ষিত প্রেমের করুণ কাহিনী। সুনিবিড় অনুভূতি-সমৃদ্ধ ছিল সেই জীবন—ছিল সত্যের সাধনায় অতন্দ্র। এইবার আমরা সেই জীবন থেকে আমাদের দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে তাকে প্রসারিত করব তাঁর চরিত্রের ওপর। মানুষের সত্যিকার পরিচয় যতটা তার কর্মে, তার চেয়ে বেশি তার চরিত্রে।

শরৎ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য অকপটতা।

শেষ বয়সে যখন তাঁর সৃষ্টির উৎস মন্দীভূত হয়ে আসতে থাকে, তখন সেই সময়কার মানসিকতা রাধারাণী দেবীকে একটি পত্রে লিখে জানাচ্ছেন তিনি এইভাবে: 'লোকে লিখতে বলে—না লিখলেও দেখি চলে না, কিন্তু এই প্রাচীনকালে আগেকার দিনের অর্থাৎ যৌবনের সে শক্তি পাবো কোথায়? তাই এখন এই শেষ বয়সের জোর করে লেখার শতেক ত্রুটি শতেক অভাব লোকের চোখে পড়ে। লেখার দৈন্য এখন নিজেই অনুভব করি। ভাষার সে শ্রীও নেই, বাঁধুনিও গেছে। সব যেন এলোমেলো শিথিল হয়ে দেখা দিচ্ছে—না? দেবার কথাও। আসলে আমি তো সাহিত্যিক নই দিদি। এ যেন এম. এস-সি. পাস করে ওকালতি পেশা ধরা। সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাই নে, যেমন পাই বিজ্ঞানের মধ্যে। এইজন্যই হয়তো আমি তৈরী হয়েছিলাম, কিন্তু গ্রহের ফেরে হয়ে গেল ঠিক উল্‌টো। ভাবি, আবার যদি কখনো জন্ম হয়, সেবার যেন এত বড় ভুল না ঘটে।'

একজন শিল্পীর জীবনের প্রধানতঃ কাম্য থাকে চারটি জিনিস—যশ বা খ্যাতি, বিত্ত, প্রেম ও প্রভাব। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনে প্রথম তিনটি পরিপূর্ণভাবেই লাভ করেছিলেন আর চতুর্থটি অংশত। সাহিত্যের ওপর তাঁর প্রভাব নিঃসন্দেহে পড়েছিল, কিন্তু বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তিনি ঠিক সেইরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি ঠিক যেমনটি পেরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। এর কারণ, তিনি নিজেই বলেছেন, সজ্জন-সমাজে তিনি ছিলেন অপাঙক্তেয়। এজন্য

অবশ্য শরৎচন্দ্রের মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে নানা রকম জনশ্রুতি প্রচারিত ছিল এবং সেইসব জনশ্রুতির মূলে আদৌ কোন সত্য ছিল কি না, তা যাচাই না করেই তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর যাঁরা তাঁরা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে চিরকালই বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। সামতাবেড় গ্রামের সমাজে তাঁকে একঘরে হয়েই বাস করতে হয়েছিল।

সমাজপতিরা তাঁকে নানাভাবেই জব্দ করবার চেষ্টা করতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে একবার একটা সরকারী বাঁধ কেটে দেওয়ার মিথ্যা মামলা পর্যন্ত করা হয়েছিল। এই মিথ্যা মামলায় শরৎচন্দ্র খুব বিব্রত হয়ে পড়েন। বিখ্যাত ব্যবহারজীবী বরদাপ্রসন্ন পাইন এই মামলায় তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। পরে অবশ্য তাঁর ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে সালিসী মারফত বিষয়টি মিটিয়ে দেন। সালিসীতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ইচ্ছা করলে শরৎচন্দ্র অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনতে পারতেন অথবা অন্য কোনরকম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু হৃদয়ের অসীম ঔদার্যবশতঃ তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন। এই ছিলেন মানুষ শরৎচন্দ্র। তাঁর শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল, তথাপি তিনি কোনদিন মনুষ্যত্ব হারান নি বলেই তাঁর চরিত্র অমন ঋজু ও কঠোর ছিল। সে চরিত্র কোনদিন ঐশ্বর্য দ্বারা বিড়ম্বিত হয় নি।

এই প্রসঙ্গে তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গস্থানীয় অথচ দরিদ্র বন্ধুর একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি লিখেছেন ঃ 'শরৎচন্দ্র ছিলেন দরিদ্র—খাঁটি, শাশ্বত। ইহজীবনে তাঁর গর্ব করবার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল দারিদ্র্যের অনুভূতি—সাহিত্যের রাজমুকুট নয়। তাই তাঁর অন্তরাত্মা ভালবাসতো যে দরিদ্র তাকে। পার্থিব যশ, খ্যাতি বা অর্থ-স্বাচ্ছল্যের সুমেরু পর্বতে উঠেও তাঁর আসল, সত্য মানুষটিকে একদিনও বিস্মৃত হন নি। ঐশ্বর্যের মহলে যখনই তাঁকে দেখেছি তখনই স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি, তিনি সেখানে কত না বিব্রত।

তাঁর নব-নির্মিত কলকাতার বাড়িতে যতবার তাঁকে দেখেছি ততবারই লক্ষ্য করেছি—ও বাড়িখানা যেন তাঁর নয়, যেন বা কোন দৈবদুর্বিপাকে হঠাৎ সে তাঁকে নিমিত্তের ভাগী করে কবে কোনদিন রাতারাতি গড়ে উঠেছে—সে অপরাধ তাঁর নয়। কয়েকদিন অবস্থার বিপর্যয়ে ধনীর ঐশ্বর্য তিনি ভোগ করেছিলেন বটে, কিন্তু আকণ্ঠ উপভোগ করে গেছেন দারিদ্র্যের এক অপূর্ব অনুভূতিকে।'[১]

তিনি নিজে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন বলেই না উত্তরকালে শরৎচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন একজন পরোপকারী ব্যক্তি। তাঁর রেঙ্গুন-জীবনে কত লোক যে তাঁর কাছে কতভাবে উপকৃত হয়েছিল শুধু সেই কাহিনীগুলিই সংগ্রহ করতে পারলে একখানা বিরাট বই হতে পারত। নিন্দুকেরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শিথিল দিকটাই দেখল, দেখল না মানুষটির হৃদয়ের ছবি। চরিত্রাংশে তিনি যে আদৌ শিথিল ছিলেন না সে কথা শরৎচন্দ্র নিজেই ব্যক্ত করেছেন। একদিন একজনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন এবং বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন: 'বাস্তবিকই তাদের ধারণা মিথ্যা। নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে-সব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনো লালসা হয় নি। তার কারণ এ নয় যে, আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে।'

এমনি কঠিন চরিত্রের মানুষ ছিলেন শরৎচন্দ্র।

তিনি চিরদিনই বেপরোয়া।

কোন দ্বিধা তাকে কখনো বাধা দিতে পারত না।

ছেলেবেলা থেকে তিনি ভয় কাউকে করতেন না। ন্যায় অন্যায়ের

[১] দরদী শরৎচন্দ্র : চরণদাস ঘোষ।

বাধাও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারত না। জীবনের এই নির্ভীকতা তাঁরই সৃষ্ট সাহিত্যে অতি সুস্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। নিয়ম বা শৃঙ্খলা এসব প্রকৃতির মানুষের জন্য নয়। উত্তর জীবনে তিনি যে সামাজিক সমস্ত নিয়ম-কানুন না মানার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তার আসল রহস্যটা তো এইখানে—এই নির্ভীকতার মধ্যে। এরই সঙ্গে মিশেছিল তাঁর মানুষকে অসাধারণ ভালবাসার ক্ষমতা। তার এই ভালবাসার পরিচয়লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরাই এই সাক্ষ্য দেবেন যে, শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মন্থন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর অনুপম সাহিত্য। এ-কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, 'শরৎচন্দ্রের জীবন-দেবতা তাঁর জীবনকে নিঙড়িয়ে রস বের করে ছেড়ে দিয়েছিলেন।' জীবনের প্রথম থেকেই তিনি আরম্ভ করেছিলেন আত্মজীবন-সমুদ্র-মন্থন—তাতে যে অমৃতের পরিবর্তে বিষই বেশি উঠবার সম্ভাবনা, সেজন্য তাঁর মনে কোনরকম দুশ্চিন্তা ছিল বলে মনে হয় না। এমন বেপরোয়া ভাবের মানুষ যারা তারাই সংসারে অপযশের ভাগী হয়ে থাকে। কিন্তু সেই অপযশ তাদের মনুষ্যত্বকে বা চারিত্রশক্তিকে বিন্দুমাত্র গ্লানিমণ্ডিত করতে পারে না।

ভালবাসা-সর্বস্ব মানুষ ছিলেন শরৎচন্দ্র।

তাঁকে যে একটু ভালবেসেছে তার কাছে তাঁর কোন কিছুই ঢাকা থাকত না। হৃদয়ের সবটাই তার কাছে যেন নির্দ্বিধায় মেলে ধরতেন—ময়ূর যেমন করে পেখম মেলে ধরে বর্ষার নব মেঘ দেখে। তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়দের সবাই এক বাক্যে বলেছেন, 'এই স্নেহময় প্রাণটার সমস্তটুকুই ছিল একেবারে খোলা। দোষ বল, গুণ বল—সমস্তই ছিল উদার, উন্মুক্ত। যেমন ছিল তাঁর খিলখিল তরল হাসি, তেমনি ছিল তাঁর তরল স্বচ্ছ ব্যবহার। এ তরল সরস প্রাণটি যেমন আঘাত-অসহিষ্ণু ছিল। তেমনি ছিল পরের বেদনায় দরদী।'[১]

১. শরৎদা : বিভূতিভূষণ ভট্ট

ভালবাসার কাঙাল ছিলেন বলেই না বাল্যাবধি শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন উদাসী কবি-স্বভাবের মানুষ। কবি ছিলেন বলেই কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ের কোমলতা ও কারুণ্য মানুষকে অতিক্রম করে মনুষ্যেতর প্রাণীকেও অনুরাগে আলিঙ্গন জানিয়েছে, ভেলু বা ভেলিই তো তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ভেলুর প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: 'ঐ ভেলু কুকুরকে অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেত না, কারণ তাঁর চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল না, বরং অনেক মানুষের চেয়ে ভেলুকে তিনি বড় বলেই মনে করতেন। আর ভেলুও বোধ করি সেটা জানতো।...হোটেল থেকে ভেলুর জন্য আসতো বড় বড় ঘৃতপক্ব চপ্, ফাউল কাটলেট। ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের যে শোকাকুল অশ্রুস্নাত দৃষ্টি দেখেছিলুম, এ-জীবনে তা আর ভুলবো মনে হয় না।'

জলধর সেনের লেখনীতে ঔপন্যাসিকের এই প্রিয় কুকুরটির চিত্র এইভাবে পাই: 'শরৎচন্দ্রের একটা কুকুর ছিল—তিনি বিলাতী নহেন, খাঁটি দেশী। তার নাম ছিল ভেলু। কুকুরটি দেখতে ছিল কদাকার, আর তার আচরণ ছিল অতি অভদ্র, যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করতো। শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্য থেকে যেই বলতেন, এই ভেলু! আর অমনি মেষশাবকের মত দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চড়ে বসতো। তিনি তাঁর এই কুকুরটিকে যে কি ভালবাসতেন, তা আর বলতে পারি নে।

'সেই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল, বাড়িতে যত রকমের চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করলেন। দুহাতে অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন, শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগাছিয়া পশু-চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন—পাঠিয়ে দিলেন না। ভেলু যে কয়দিন সেখানে বেঁচেছিল, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বসতেন। সারাদিন স্নান-আহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে থাকতেন। রাত্রিতে যদি সেখানে

থাকতে দেওয়ার আদেশ থাকত, তাহলে শরৎচন্দ্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর ভেলুর পিঞ্জর পার্শ্বেই বসে থাকতেন। কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না।' ভেলুর মৃত্যুসংবাদ শুনে জলধরবাবু দেখা করতে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিলেন—দাদা, আমার ভেলু আর নেই। তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় নি।

এই মহাপ্রাণতার কি কোন ব্যাখ্যা চলে?

এ শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিস।

এই মহাপ্রাণতাই ছিল সেই প্রতিভাধর ঔপন্যাসিকের সকল সৃষ্টির উৎস।

শরৎ-চরিত্র ও শরৎ-প্রতিভা—দুই-ই সার্থক হয়েছে এই একটি গুণে।

তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরা অনিলা দেবীর বাড়ির কাছেই তিনি তাঁর সামতার বাড়িটা তৈরী করিয়েছিলেন। একবার দিদির গ্রামের ও তার চার পাশের গ্রামের গরীব-দুঃখীদের দুর্দশার সংবাদ শুনে শরৎচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারেন নি। তাদের দুর্দশা দূর করবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন—তাদের মধ্যে কাপড় ও পয়সা বিতরণ করেছিলেন। সাহায্যের এই দ্রব্যগুলি সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজে ঐখানে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন, দিদির গাঁয়ের গরীব-দুঃখীদের যে কি দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সেদিন তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

এই মানুষ শরৎচন্দ্র।

এখানে তিনি যেন বিদ্যাসাগরের সগোত্র।

হৃদয়ের যে কোমল বৃত্তি মানুষকে যথার্থ মনুষ্যত্ব প্রদান করে এবং সচরাচর যেটি সকলের মধ্যে দেখা যায় না, শরৎ-চরিত্র যেন সেই কোমলতার আধার ছিল। লোকে বলতো তিনি নাস্তিক ছিলেন, ভগবান বিশ্বাস করতেন না। এমন অপবাদ বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও ছিল। এই নাস্তিকের হাতেই তো দেশবন্ধু তাঁর গৃহ-বিগ্রহটি অর্পণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের অন্তরটা কোমল ছিল বলেই না তিনি অমন

মহাপ্রাণ হতে পেরেছিলেন। তাঁর মহাপ্রাণতার আর একটা দৃষ্টান্ত দিই।

১৯২৭।

মান্দালয় জেল থেকে মুক্তিলাভ করলেন সুভাষচন্দ্র!

মুক্তিলাভ করলেন অন্যান্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ আর সেই সঙ্গে রেগুলেশন আইন ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত শত শত তরুণ রাজবন্দী। মুক্তজীবনে ফিরে এসে এঁরা দেখলেন যে দেশবাসীর কাছে তাঁরা যেন কেমন অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছেন—সবাই তাঁদের একঘরে করতে উদ্যত। ঘরে স্থান নেই, স্থান নেই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, এমন কি 'রাজবন্দী' এই পরিচয় শুনলে মেস-বোর্ডিং-এ পর্যন্ত তাদের স্থান হতো না। তারা তখন তাকালো কংগ্রেসের দিকে, স্বরাজ্য দলের পানে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য তাদের যে, না কংগ্রেস, না স্বরাজ্য দল এই সদ্যোমুক্ত রাজবন্দীদের সমাজে পুনর্বাসনের কথা চিন্তাই করল না। বাংলার সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের সে এক দারুণ লজ্জাকর অধ্যায়। বিপ্লবীরা অপাঙক্তের হয়ে রইলেন।

শরৎচন্দ্রের কাছে যখন এই সংবাদ এলো, তখন তিনি এইসব 'একঘরে' বিপ্লবী তরুণদের জন্য যারপরনাই বিচলিত বোধ করলেন। মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করার মানুষ ছিলেন না তিনি। এগিয়ে এলেন। তিনি তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। 'সাঙ্গোপাঙ্গদের ডাক দিয়ে বললেন, তোমরা মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরিক সংবর্ধনার ব্যবস্থা করো। শুধু তাই নয়। এমন জমকালো করতে হবে, যাতে দেশের moral impression-টা রীতিমত একটা দানা বেঁধে ওঠে। ওরা দেশের জন্যে রক্ত দিয়েছে, জেল খেটেছে, তাদের বি. পি. সি. সি. বরণ না করতে পারে, কিন্তু বরণ আমাদের করতেই হবে। তোমরা আয়োজন কর। অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হলো। শরৎচন্দ্র হলেন চেয়ারম্যান্। তাঁর সমস্ত সংকোচ, লজ্জা, কুণ্ঠা ধুয়ে মুছে গেল। সেই স্বল্পবাক্ শরৎচন্দ্র মুখর হয়ে উঠলেন। নিরীহ, অলস শরৎচন্দ্র হলেন

কর্মঠ ও বেগবান। নিজে তাদের সংবধনাপত্র পাঠ করলেন। …শরৎচন্দ্র যা চেয়েছিলেন ঠিক তাই হলো। হাওড়া টাউন-হলে এই সংবর্ধনা সভার পর বাংলার যুব-চিত্ত সজাগ হয়ে উঠলো। জেলায় জেলায় আরম্ভ হলো রাজবন্দী সংবর্ধনা।'[১]

শরৎচন্দ্রের এই যে মহাপ্রাণতা, এর কি কোন তুলনা আছে? এর মূলে ছিল তাঁর মনের স্বতঃস্ফূর্ত দেশাত্মবোধ। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা। ভারতের পরাধীনতা মোচনের উগ্র আকাঙ্ক্ষা পোষণের জন্য তিনি অত্যাচারী ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত ছিলেন। তাইতো দেশের বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির সীমা-পরিসীমা ছিল না। মহাপ্রাণতার সঙ্গে দেশপ্রেম মিশে শরৎ-চরিত্রকে দিয়েছিল একটা স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা। একটা স্বতন্ত্র গৌরব।

যাঁরাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন, মানুষটি যথার্থই দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। সহৃদয়তা ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকত তাঁর হৃদয়। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট তাঁকে রীতিমত বিচলিত করতো। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। অশ্বিনীকুমার বর্মণ দেশের কাজ করে জেলে গিয়েছিলেন। কারামুক্তি লাভের পর তিনি ছোট্ট একটি বইয়ের দোকান খুলেছিলেন—নাটক-নভেল নয়, দেশপ্রেমমূলক বই প্রকাশ করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু নিতান্ত সঙ্গতিহীন ছিলেন তিনি। তখনো পর্যন্ত বাজারে শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক প্রবন্ধের বই কিছু বেরোয় নি, অথচ ঐ জাতীয় বেশ কিছু সংখ্যক রচনা তাঁর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তখন খ্যাতিমান লেখক, প্রকাশকরা তাঁর দরজায় তখন ধরনা দেয়। অশ্বিনীবাবুকে তিনি চিনতেন ; জানতেন তিনি মানুষটি খাঁটি দেশ-প্রেমিক, দেশের কাজ করতে গিয়ে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করেছেন।

১. শরৎচন্দ্র: কানাইলাল ঘোষ।

শরৎচন্দ্রের একটা বই প্রকাশ করতে পারলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতে পারেন—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি একজনের মারফত শরৎচন্দ্রকে জানালেন তাঁর মনের কথা। শরৎচন্দ্র তখনি তাঁকে বললেন, অশ্বিনীবাবু, আপনি আমার প্রবন্ধগুলো যোগাড় করে একখানা বই করুন।

—কিন্তু আমার তো মূলধন নেই, আপনার রয়্যালটি—

—সেজন্য চিন্তিত হবেন না ; এর সর্বস্বত্ব আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি।

—এতই যদি অনুগ্রহ করবেন তাহলে বইটির একটা নামকরণ করে দিলে উপকার হয়।

—নাম দেবেন 'স্বদেশ ও সাহিত্য।'

এমন উদারতা বাংলার আর কোন লেখক দেখাতে পেরেছেন ?

সাহিত্যিক হিসেবে সুবিপুল জনপ্রিয়তার গর্ব তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি কখনো।

নিঃসন্দেহে একটা বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন শরৎচন্দ্র।

তিনি লোকের বাহির দেখে তার ভিতরের বিচার করতেন না।

তা যদি করতেন, তাহলে তাঁর লেখনী থেকে 'বিন্দুর ছেলে' বা 'রামের সুমতি'র মতো গল্প সৃষ্টি হতে পারতো না। তাই এই অপ্রতিরথ ঔপন্যাসিকের হৃদয়বত্তার পরিচয় না নিলে তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে জানা হয় না। যাঁরাই এই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষটির জীবন-বৃত্তের মধ্যে কখনো এসেছেন তাঁরাই এই সাক্ষ্য দেবেন যে হৃদয়রাগে অনুরঞ্জিত তাঁর অনুপম সাহিত্য, সেই হৃদয়রাগ ফুটে উঠতো তাঁর প্রতিটি কথায়। তাঁর স্নেহের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছে তাঁরাই বলেছেন মানুষ শরৎচন্দ্রের জীবনে উদারতা ও অনুকম্পার যেন অবধি ছিল না। তাইতো তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে মানুষকে কখনো নির্জলা মন্দ করে আঁকতে পারতেন না। এই

অনুকম্পাই তো পথের একটা ঘেয়ো কুকুরকে ডেকে আদর করে লুচি খাওয়াতো। তাঁর একান্ত স্নেহভাজন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সুকণ্ঠ গায়ক ও সুরকার দিলীপকুমার রায় মিথ্যা বলেন নি—'কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতনই প্রেম ও দরদ ছিল শরৎচন্দ্রের সহজাত।'

নানা ঘটনায় তাঁর হৃদয়বত্তার যে পরিচয় লোককে বিস্মিত করতো তারই মধ্যে বিচ্ছুরিত হতো এই মানুষটির অন্তরাত্মার আলো। এক-জন যথার্থ শিল্পী, কবি অথবা লেখকের মধ্যে তার অন্তরাত্মাই হলো তার একমাত্র পরিচয়। শরৎচন্দ্রের মধ্যে আমরা দেখেছি মানবাত্মার এরই মহিমান্বিত ও রূপোজ্জ্বল মূর্তি। তাঁর হৃদয়বত্তার একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করেছেন নরেন্দ্র দেব ঃ

'একদিন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে চলেছি গড়িয়াহাট বাজারের দিকে। তাঁর কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনবার দরকার ছিল। শীতকাল। বৃষ্টির সময় নয়। কিন্তু সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমার ছাতা ছিল সঙ্গে। দুজনেই সেই ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছি। গড়িয়াহাটার মোড়ের কাছে আসতে একটি বৃদ্ধা ভিখারিনী আমাদের সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো। পরিধানে ছিন্নবস্ত্র। বৃষ্টিতে ভিজে লেপটে আছে গায়। শীতে বুড়ী কাঁপছিল। শরৎচন্দ্র তার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে তাঁর মনিব্যাগ বের করে তার মধ্যে যা ছিল সব উপুড় করে বুড়ীর হাতে ঢেলে দিলেন। আন্দাজে মনে হলো সে নেহাৎ কম হবে না। গোটা পনেরো কুড়ি টাকা তো বটেই। আমি তো দেখে অবাক। বুড়ী ভিখারিনীও অবাক! সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অতগুলো টাকা নিতে সাহস হচ্ছিল না তার।...শরৎচন্দ্র ভিখারিনীকে বললেন, মা, এ টাকায় তোমার যে ক'দিন চলে সে ক'দিন আর ভিক্ষায় বেরিও না। আমি রোজ এদিকে বেড়াতে আসি। টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে আবার তুমি এসে দাঁড়িও এই মোড়ে, আমি আবার কিছু দেব।'

একেই বলে যথার্থ দরদী মানুষ।

এমন মানুষের লেখনীই তো অমন হৃদয়স্পর্শী সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম।

মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে উদার শ্রদ্ধাবোধ শরৎ-চরিত্রের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

'জীবনকে তিনি অবাধ মুক্তির মধ্য দিয়েই চালনা করে নিয়ে এসেছেন। কখনও কোন বন্ধন জীবনে গ্রহণ করেন নি বা মানেন নি। সংসারে একটিমাত্র বন্ধনকে তিনি স্বীকার করতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তা মেনে গিয়েছেন—সে বন্ধন অকৃত্রিম ভালবাসার।······আপনার জীবনে গভীরতর দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। সে দুঃখ তাঁর হৃদয়কে খাঁটি সোনা করে তুলেছিল। অন্তর-বেদনার এমন নিগূঢ়তর পরম অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এরূপ গভীর রসসৃষ্টি করা তার পক্ষে ঘটে উঠত না।'[১] এই স্নেহস্নিগ্ধ অন্তরের অধিকারী মানুষ শরৎচন্দ্র শিল্পী শরৎচন্দ্রের চেয়েও অনেক—অনেক বড়, অনেক মহৎ ছিলেন। এমন মানুষের মৃত্যু নেই। সহানুভূতি ও সমবেদনার মাধুর্যমণ্ডিত এই মানুষকে তাঁর স্বদেশবাসী কোনদিনই বিস্মৃত হবে না।

শরৎচন্দ্র কি নাস্তিক ছিলেন?

ব্যক্তিগত জীবনে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানে তাঁর স্পৃহা বা আগ্রহ ছিল না সত্য, কিন্তু স্ত্রীর বারব্রত বা পূজা-পার্বণে তিনি কোনদিনই বাধা তো দেনই নি, বরং তার সকল ব্যবস্থা সানন্দে করতেন। এমন কি হিরণ্ময়ী দেবীকে কাশীতে নিয়ে গিয়ে তীর্থধর্ম করিয়ে এনেছেন। সকল সময়েই সহধর্মিণীর এইসব কাজের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই তিনি নিজের সময় ও অর্থ দুই-ই ব্যয় করতেন। এজন্য তিনি আদৌ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। স্ত্রীর ঐসব বারব্রতের ব্যয় ছাড়া, ব্রতের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ব্রাহ্মণ-ভোজন করানোর ব্যাপারেও তাঁর কম

১. শরৎ-সুষমা : রাধারাণী দেবী।

উৎসাহ ছিল না। এ ছাড়া সামতায় বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপারে স্ত্রীকে কখনও বাধা দিতেন না—অম্লানবদনে অর্থব্যয় করতেন। তবু কি আমরা তাঁকে নাস্তিক বলব?

দেশবন্ধু যখন তাঁর হাতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ অর্পণ করেন, কথিত আছে, শরৎচন্দ্র তখন তাঁকে বলেছিলেন, জানেন তো আমার দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই, আমি নাস্তিক। এই কথা শুনে দেশবন্ধু বলেছিলেন, নাস্তিক হলেও আপনি অন্তরে একজন ভক্ত ও বৈরাগী মানুষ। তাইতো এই ভার আপনাকে দিতে চাই।

—কোন চিন্তা নেই আপনার; এই দেবতার ভার আমিই নিলাম।

দেশবন্ধু মানুষ চিনতেন। শরৎচন্দ্র যে মনে-প্রাণে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী তা তিনি বুঝেছিলেন।

সকলেই জানেন শেষ বয়সে শরৎচন্দ্র এই বিগ্রহের সেবা এবং পূজা নিজের হাতে করতেন; কণ্ঠীধারণ করে পরম বৈষ্ণব হয়েছিলেন। লোক-দেখানো ধর্মের ভড়ং তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না কোনদিনই, কিন্তু অনেকের বিবেচনায় তিনি অন্তরে একজন যথার্থ ধার্মিক ও বৈরাগ্যবান মানুষ ছিলেন। ঐশ্বর্যের দম্ভ তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি। সংস্কারমুক্ত মন ছিল তাঁর, অথচ ব্রাহ্মণের গর্বটা চিরকালই বোধ করতেন এবং ব্রাহ্মণের চিহ্ন উপবীত তিনি গর্বের সঙ্গেই চিরকাল ধারণ করে এসেছেন। ব্রাহ্মণের পৈতা ধারণ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভিমত স্মর্তব্য। তিনি গলায় সবসময় উপবীত রাখতেন। ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপবীত ধারণ কর্তব্য বলেই তিনি মনে করতেন। পৈতা গলায় রাখার উপকারিতা আলোচনা না করেও তিনি হিন্দুর ধর্মসংস্কারবশতঃ এই প্রথা অকল্যাণকর নয় ভেবেই বামুনের ছেলের পৈতা রাখার ওপর জোর দিতেন। ভারতীর আসরে একদিন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় পৈতা নাই দেখে তিনি খাপ্পা হয়ে উঠলেন, 'ও কি হে চারু, তোমার পৈতে নেই?' চারুবাবু হেসে বলেন, 'শরৎ, পৈতের ওপর ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না।' শরৎচন্দ্র

আহতকণ্ঠেই বললেন, 'না না, বামুন হয়ে পৈতে ফেলা অন্যায়।'[১] তেমনি আর একবার অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের গলায় পৈতা না দেখে বিরক্ত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'জানো, যজ্ঞোপবীত ধারণ না করলে পিতৃপুরুষের অপমান করা হয়।'

শরৎচন্দ্রের লেখায়, অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, ধর্মের শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানের দিকটি বার বার নিন্দিত হয়েছে এবং ভগবানের মহিমা নিয়ে তিনি কমই লিখেছেন। তাঁর লেখায় ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বহু মন্তব্য আছে। এইসব দেখে অনেকের মনে হতে পারে যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু সে কথা একেবারেই সত্য নয়। শরৎচন্দ্র ধার্মিক ছিলেন—ছিলেন ভগবৎ-বিশ্বাসী। শ্রীকান্ত চতুর্থপর্বের শেষ দৃশ্যটি আমরা যখন স্মরণ করি তখনই বুঝতে পারি মানুষটির ভগবদ্বিশ্বাস কি রকম দৃঢ় ছিল। আসল কথা, শরৎচন্দ্রের কাছে ধর্ম সাম্প্রদায়িক রূপে নয়, আচার-অনুষ্ঠানে নয়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়—মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বা বিকাশক যে বৃত্তি-আচরণ, ঔপন্যাসিকের কাছে তাই-ই মূলতঃ ধর্মের স্বরূপ। মানবতাবাদী সাহিত্যিক হিসেবে শরৎচন্দ্রের পক্ষে এটাই ছিল সঙ্গত ও স্বাভাবিক। সুতরাং 'কেবল আমিই হলাম ঘোরতর নাস্তিক'— শরৎচন্দ্রের এই সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তিনি আমাদের কাছে ঠিক ঐভাবে প্রতীয়মান হন না। আশ্রমবাসীদের ওপর তাঁর মন যে কখনও সুপ্রসন্ন ছিল না—সে কথা তিনি অকপটে একাধিক পত্রে দিলীপকুমারকে লিখে জানিয়েছেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তিনি গভীর শ্রদ্ধা চিরকাল পোষণ করতেন।

'এই করেছ নিঠুর তুমি এই করেছ ভালো।'
'পথের পথিক করেছ আমারে।'

১. সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র : হেমেন্দ্রকুমার রায়।

রবীন্দ্রনাথের এই গান দুটি শরৎচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। সবাই জানেন বেশ মিষ্ট গলা ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর তো কণ্ঠস্থ ছিল বললেই হয়। রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতায় অভিসিঞ্চিত ছিল শরৎচন্দ্রের মানসলোক। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, তিনি ডিকেন্সেরও ভক্তশিষ্য ছিলেন। পড়েছেন বিস্তর এবং এটা তাঁর চরিত্রগঠনের পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল বলা চলে। 'বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার ইহজীবনের দুঃখকষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়'—শরৎচন্দ্রের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তাঁর বই পড়ার অভ্যাসটা কি রকম ছিল। এবং এই অভ্যাসের ফলে তাঁর মনের প্রসারতা, দৃষ্টির প্রসারতা সবই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সামতাবেড়ের দোতলার ঘরটি ছিল গৃহস্বামিনীর ঠাকুরঘর।

এই ঘরেই একটি রূপার সিংহাসনে দেশবন্ধুর দেওয়া বিগ্রহটি শরৎচন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। একদিনের ঘটনা। 'গুটি গুটি দোতলায় উঠিলাম। একখানি ঘরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে শরৎচন্দ্রকে ধ্যানস্থ দেখিলাম। পূজার উপকরণ নাই, অর্থাৎ ফুল নাই, গঙ্গাজল নাই, কোশা-কুশী নাই—আছেন মাত্র পূজারী শরৎচন্দ্র ও তাঁহার দেবতা,—বিগ্রহের মূর্তি ধরিয়া। শরৎচন্দ্রের ধ্যানরত মূর্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিয়াছিলাম, কি কঠোর তপস্যা, কি একাগ্রতা ও কি একনিষ্ঠতা। সেদিন বুঝিয়াছিলাম, শরৎচন্দ্র কত বড় আস্তিক; নাস্তিকতা তাঁহার স্বেচ্ছাবরণ, তাহার আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেন।'[১]

ঐশ্বর্যের মধ্যে কঠোর বৈরাগ্যসাধন—প্রকৃতির চিরখেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্রের জীবনের ইহাই ফলশ্রুতি।

১. শরৎ-স্মৃতি : বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

সাহিত্য

ভাল-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে—ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলায় কোন art-ই কোনদিন আপত্তি করে না। কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয় না।

—শরৎচন্দ্র

॥ সতেরো ॥

'সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি এক দিনেই নাম করে বসলাম। বাংলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।'

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির সুস্পষ্ট সমর্থন রবীন্দ্রনাথের এই কথার মধ্যেই পাওয়া যায়ঃ 'বলা-কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্যমণ্ডলীতে! অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হতে দেরি হলো না। চেনা-শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করে নি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্ত-পরিচয় এবং লেখকের আত্মপরিচয় অব্যবধানে একসঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়—পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।'

কিন্তু সত্যিই কি তাই ঘটেছিল?

তিনি মগের মুলুক থেকে হঠাৎ এসে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্র কি একদিনে দখল করেছিলেন? শরৎ-সাহিত্য আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই এই প্রশ্নটি আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। ওদেশে বহু-নিন্দিত এবং বহু-প্রশংসিত কবি লর্ড বায়রনের কবি-খ্যাতি লাভ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ('একদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি একজন কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছি।'—বায়রন।), তার মূলে যে কিছুটা সত্য না ছিল তা নয়, তেমনি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বে নবাগত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ সম্পর্কেও কিছু জনশ্রুতি বিদ্যমান আছে এবং সে-সব জনশ্রুতিও একেবারে অমূলক নয়। তবে প্রকৃত কথাটি হলো এই যে, বাংলার সাহিত্যক্ষেত্র একদিন দখল করবার আগে শরৎচন্দ্রকে নির্জনে অনেক সাধনা করতে হয়েছিল। দেবদত্ত প্রতিভা

তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, তবু নিরলস অভ্যাসযোগের প্রয়োজনটা ষোল আনাই ছিল। নইলে ছেলেবেলা যাঁর কেটেছে ঘুড়ি উড়িয়ে, লাট্টু খেলে, যৌবনটা গাঁজাগুলি খেয়ে, তারপর মগের মুলুকে গিয়ে যিনি কেরানীগিরি করেছেন দীর্ঘকাল, সেই ভবঘুরে বাউণ্ডেলে মানুষটি যে কোনদিন হবেন বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী, জয় করবেন বাঙালীর চিত্তলোক—এ-কথা কেউ ভাবতে পেরেছিল সেদিন ?

শরৎ-সাহিত্য আলোচনার পূর্বে তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। এই দুইজনকেই শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-জীবনের গুরুতুল্য মনে করতেন, যদিও বঙ্কিমের তিনি একজন কঠিন সমালোচক ছিলেন। আগে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলি।

প্রতিভা আপন সৃষ্ট নব-নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব-নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম দৃষ্টান্ত মধুসূদন, দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র। রোমান্সের এক নূতন রূপ নিয়ে তিনি দেখা দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ যখন শেষ হয়ে এলো, তখন দেখা গেল বাংলা গদ্য অনেকখানি জড়তামুক্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালীর বুদ্ধি মার্জিত ও রসবোধ তীক্ষ্ণ হয়েছে। এই পটভূমিতেই বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা একে আরম্ভের কালেই একটা অত্যন্ত উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে তিনি এক দুর্লভ সাহিত্যিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে গল্প বলতে ছিল 'বিজয়বসন্ত' বা 'গোলেবকাওলি।' তখনকার গল্প সাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ। বঙ্কিমচন্দ্র সেই মুখোশ অপসারণ করে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই বাংলা উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা। কথা-সাহিত্যের নূতন রূপ-প্রবর্তক। হিন্দুত্বের আড়ম্বর বঙ্কিম-সাহিত্যে যতই থাকুক তাঁর সত্যকার প্রতিপাদ্য কিন্তু হিন্দুত্ব নয়, মানবতা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিই এর অভ্রান্ত

নিদর্শন বহন করে। মানব-চরিত্র-জ্ঞানের, মানুষের সঙ্গে সহজ আত্মীয়তার, কত গভীর পরিচয় এসবের মধ্যে রয়েছে। মনুষ্যত্বের পূজারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, আবার তাঁরই মধ্যে দেখা গিয়েছিল স্বাজাত্যবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ যা তিনি তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে (বিশেষ করে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি) বাঙালীর মনে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসে যেন এক যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে বস্তুতন্ত্রতার ভিত্তির উপর এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্যলোক রচিত হয়েছে যেখান থেকে নিত্য ঝঙ্কৃত হয় 'ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী।'

উপন্যাসের চরম কৃতিত্ব মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের সমস্যা-সংঘাতগুলিকে মহান ও গৌরবময় প্রতিপন্ন করা, মানুষের জীবনের জটিল দুর্জ্ঞেয়তাকে এর পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রামের তীব্রতাকে ফুটিয়ে তোলা। এবিষয়ে পূর্ববর্তীদের তুলনায় বঙ্কিমের কৃতিত্ব স্বতঃই প্রতিভাত হবে। তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসই আমাদের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত মানব-জীবনের উপর এক অপরূপ অর্থগৌরব ও ভাব-মাহাত্ম্য আরোপ করেছে। উপন্যাসের এই উচ্চতর পর্যায়ে উন্নয়নই বঙ্কিমের সর্বপ্রধান কীর্তি—তাঁর হাতে উপন্যাস অখ্যাত জীবনযাত্রার বিকৃতি থেকে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতা লাভ করেছে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কল্পনার ইন্দ্রজালে দেশবাসীকে অভিভূতই করেন নি, দেশের যে জীবনধারা, তার অন্তর্নিহিত মনোহারিত্বেরও অনেকখানি সন্ধান তিনি তাদের দিয়েছিলেন। তিনি তাই একাধারে ঔপন্যাসিক ও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী।

বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাসের স্রষ্টা।

এ-কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

প্রথম কলাবিদ্ ঔপন্যাসিক ; আবার তিনিই বোধ হয় বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসে কাহিনী আছে, চরিত্রসৃষ্টি আছে—মানবহৃদয়ের গোপন রহস্যের সন্ধানও দিয়েছেন তিনি। ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র—

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে আমরা সবই পেয়েছি। কল্পনার ঐশ্বর্যই তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য—তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসই অতিশয় কল্পনা-সমৃদ্ধ। তিনি প্রধানতঃ রোমান্স-রচয়িতা। কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি উপন্যাসে আখ্যায়িকা, চরিত্রসৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গী সবই শ্রেষ্ঠ রোমান্সের পরিচায়ক। তিনি যেসব চরিত্র এঁকেছেন তাদের মধ্যে রোমান্সের অসাধারণত্বের ছাপ সুপরিস্ফুট।

'প্রথমেই মনে হইবে প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলা ও রহস্যময়ী মনোরমার কথা। ইহারা রক্ত-মাংসে-গড়া রমণী, রমণীজনোচিত প্রবৃত্তি ইহাদের মধ্যে আছে। তবুও মনে হয় ধরণীর ধূলি হইতে ইহারা অনেক দূরে, দৈনন্দিন জীবনে ইহারা অপরের চিত্তে বিভ্রমের সঞ্চার করিতে পারে, কিন্তু ইহারা কখনও প্রাত্যহিকের সম্পত্তি হইয়া থাকিবে না। প্রফুল্ল, সত্যানন্দ, জয়ন্তী—ইহাদের প্রকৃতির সংযম কম, ইহারা রহস্যাবৃতও নহে, কিন্তু ইহারাও সাধারণ নরনারীর ক্ষেত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত; সাধারণ মনুষ্যের জীবনকে ইহারা নিজেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চায়, কিন্তু ইহারা নিজেরা সংসারে নিমগ্ন হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ করে না। ইহাদের ব্যক্তিত্ব মানবের কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। মাধবাচার্য, চন্দ্রচূড়, ভবানী পাঠক, রাজসিংহ—ইহারা সত্যানন্দ বা দেবীচৌধুরাণী অপেক্ষা হীনপ্রভ, কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিত্বও অনন্যসাধারণ ও অভিমানবোচিত। ইহারা একটা বিরাট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং সেই আদর্শের কাছে অন্য সকল কামনা বিসর্জন দিয়াছেন।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এলেন রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ করেছে।

১. শরৎচন্দ্র : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

প্রধানতঃ কবি হলেও তিনি ঔপন্যাসিকও বটে।

তিনিও এক নূতন ধরনের রোমান্স-স্রষ্টা।

বাংলা সাহিত্য আজ পর্যন্ত যত মনীষীর দানে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের দান তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বৈচিত্র্য-মণ্ডিত। বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য বলতে যা-কিছু বোঝায় তার সর্বোত্তম বিকাশ আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রত্যক্ষ করি। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তিনিই উন্নীত করেছেন। শরৎচন্দ্র মিথ্যা বলেন নি—'তাঁর মত অত বড় প্রতিভা পৃথিবীতে আর জন্মাবে কিনা সন্দেহ।' তিনি একাধারে মনীষী, কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক, নাট্যকার, সঙ্গীত-রচয়িতা, সুখকর নিবন্ধকার—সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই যা রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে সমৃদ্ধ হয় নি।

রবীন্দ্র-প্রতিভা অতুলনীয়, কারণ এ প্রতিভা বিধাতার সৃষ্টি—এ-কথা বঙ্কিমচন্দ্রের। রবীন্দ্র-প্রতিভা কাব্য ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই চরম সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আমাদের চমৎকৃত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে উপন্যাসের যে ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে এক সম্পূর্ণ অভিনব পথে চালনা করেছেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসকে প্রথম আর্টের গৌরব ও কলাসৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে বাস্তব আলোচনা-পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া ইহার নূতন পরিণতির পথ নির্দেশ করিয়াছেন ও বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংযোগ ঘটাইয়া ইহার সম্মুখে অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা হইলেও রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রবর্তক।'

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' শুধু যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তা নয়; বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসটিই যুগান্তর এনেছিল। 'আমি "গোরা" বিশবার পড়েছি'—এই কথা বলেছেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। 'চোখের বালি'ও তিনি যত্ন করে পড়েছেন। এই উপন্যাসে সাধারণ মানুষের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, অথচ নরনারীর চরিত্রের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

দেওয়া হয়েছে যে, তাতে সাধারণ জীবনের আখ্যায়িকা অসামান্যত্ব লাভ করেছে। তেমনি চরিত্রসৃষ্টির নিপুণতায় ও আখ্যানের রসঘন নিবিড়তায় 'নৌকাডুবি'র প্রথমাংশ রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ যতগুলি উপন্যাস রচনা করেছেন (তাঁর রচিত উপন্যাসের মোট সংখ্যা এগারো), তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহদায়তন হলো 'গোরা'। গদ্যে মহাকাব্য আর মহাকাব্যোচিত শক্তি, তেজ, প্রতিভা সকল গুণেরই সমাবেশ ঘটেছে এই উপন্যাসের 'গোরা' চরিত্রটির মধ্যে। বহু সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তর্কের আলোচনা উত্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রধান গৌরব কিন্তু ছোট গল্পের স্রষ্টা হিসেবে। এই ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-প্রতিভা অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম ছোট গল্প রচনা করে, বাঙালী পাঠককে বিস্মিত করেন। তাঁর ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য শুধু ঘটনার পরিণতিসাধনে নয়, ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে তিনি মানব-হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি জাগিয়েছেন, তিনি তাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাঁর ছোট গল্পের সংখ্যাও কম নয় এবং এর মধ্যে এমন কয়েকটি গল্প আছে যেগুলি বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভ করেছে, যথা—'ডাকঘর', 'কাবুলিওয়ালা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গল্প রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বৈচিত্র্য অসাধারণ। এই বৈচিত্র্য তাঁর ছোট গল্পের ক্ষেত্রে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, এমন আর অন্য কোথাও নয়। মোটকথা, তাঁর ছোট গল্প-গুলির মধ্যে অনবদ্য কলাশিল্প ও গঠন-কৌশল, আশ্চর্য বৈচিত্র্য ও প্রসার এবং কাব্যসৌন্দর্য ও ঔপন্যাসিক চিত্ত-বিশ্লেষণের অদ্ভুত সমন্বয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প কিছুতেই কল্পনাবিলাসের ফানুস নয় ; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অপরোক্ষ অনুভূতির অপূর্ব সমবায়ে কবির মানসে যে

গভীরতর সত্যসৃষ্টির সুধারস সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারই এক প্রকাশ এই ছোট গল্পগুলিতে।……ইহার পিছনে এমন একটা কিছু আছে যাহার জন্য গল্পগুলিতে অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে চোখে দেখা মানুষের সুখ-দুঃখময় যে জীবনখণ্ড আবহমান প্রাণপ্রবাহের ভঙ্গ-তরঙ্গমাত্র, তাহারই গভীর আনন্দস্রোতে মানবজীবনের ক্ষণিক ভালবাসা—ভাল লাগা ও আপাত তুচ্ছতা-ব্যর্থতা-বেদনা সবই একটি যেন অলৌকিক সাথকতায় পৌঁছিয়াছে।'

কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে একজন সমালোচক লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা প্রকট হইয়াছে চরিত্রসৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গীতে। তিনি মহামানবের কথা লিখেন নাই, সাধারণ মানুষের সাধারণ কাহিনী নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাদের কথা লিখিতে যাইয়া তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন ও তথায় নানা প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ও লুকোচুরি দেখিতে পাইয়াছেন; কাহাকেও একটি প্রবৃত্তির প্রতীকমাত্র মনে করেন নাই। প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন নাই, কিন্তু তাহার জয়গানও করেন নাই। মানুষকে তিনি মানুষ হিসাবে দেখিয়াছেন; প্রচলিত ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় একদিন 'বলাকওয়া নেই', কোথা থেকে এসে উপস্থিত হলেন শরৎচন্দ্র। 'যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি'—এই রকম একটা বিদ্রোহী মনোভাব নিয়েই তিনি যেন প্রবেশ করেছিলেন বাংলা সাহিত্য-সংসারে। প্রবেশ করেছিলেন তিনি আপন প্রতিভার ছাড়পত্র নিয়েই। তাইতো দেখি, আগন্তুক বলে তাঁকে দূরে ঠেলে রাখা সম্ভব হয় নি সেদিন। এর আর একটা বড় কারণ এই ছিল যে, তাঁর নিজের কথায়, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিলেন তিনি।

১ শরৎচন্দ্র : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন শরৎচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের অভিমত উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন ঃ 'শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা খুব সাধারণ লোক; তিনি তাহাদের জীবন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও তাহাদের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁহার রচনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মানবহৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে সংস্কার ও অনুভূতির যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিতেছে তিনি তাহার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অনুভূতির গভীরতায় ও বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় তাঁহার রচনা অনন্যসাধারণ। তারপর, প্রচলিত ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ থাকেন নাই; তিনি ইহাকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু ইহাকে কল্যাণকর বলিয়া শিরোধার্য করেন নাই। তাঁহার রচনায় বিদ্রোহের সুর রহিয়াছে; তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে ধর্ম মানুষের হৃদয়ের প্রতি অবিচার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল্য কোথায়?'

অতঃপর আমরা শরৎ-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। দেখব, তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা আর অপরোক্ষ অনুভূতি—এই দুইয়ের সমন্বয়ে বাংলা কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র কেমন করে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করলেন। গল্পের মিষ্টতায় বা হৃদয়গ্রাহিতায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়ে, তিনি আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা আজও সমানভাবেই রয়ে গেছে। সত্যিই **'A heartcharmer he has been, a heartcharmer he will always be.'**—শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর এই অভিমত বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

॥ আঠারো ॥

হৃদয়ের প্রেরণা ছাড়া সাহিত্য অসম্ভব।

শরৎচন্দ্র এই কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন; শুধু বিশ্বাস করা নয়, সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারে তিনি সবসময় এইভাবেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর সমস্ত সাহিত্য-সেবাটাই ছিল এই ধরনের। তাইতো তিনি বলতেন, 'যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।'

সমগ্র শরৎ-সাহিত্যকে আমরা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে দেখতে পারি, যথা—১। শ্রীকান্ত-পূর্ববর্তী পর্ব; ২। শ্রীকান্ত-পরবর্তী পর্ব। তাঁর বড়দিদি, বিন্দুর ছেলে, বিরাজবৌ, পণ্ডিত মশাই, পল্লী-সমাজ—এইগুলিকে আমরা প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, আর শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস—এইগুলিকে দ্বিতীয় পর্বের সৃষ্টি বলতে পারি। প্রথম পর্বের শরৎচন্দ্র নিপুণ শিল্পী বটে, কিন্তু নূতন ভাবুক নন; কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি গ্রন্থে, তিনি নিপুণ শিল্পীও বটে, নূতন ভাবুকও বটে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সুখ-দুঃখের যে অনুভূতি একদা বাঙালীর গৃহ ও জীবনকে সুন্দর করে তুলেছিল, বঙ্কিম-সাহিত্যে যার সূচনা আর রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও উপন্যাসে যার উজ্জ্বল আলেখ্য আমরা দেখতে পাই, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অংশে সেই ধারারই অনুসরণ করেছেন। সে অনুসরণে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বাঙালী সমাজ ও পারিবারিক জীবনের মাধুর্য আরো কাছে থেকে দেখে আরো চমকপ্রদ করে অঙ্কিত করেছেন।

শরৎ-সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে শরৎ-মানসের প্রতি আমাদের একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। বিভিন্ন চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এই মানসে, যথা—১। সমাজ-চেতনা, ২। ধর্ম-চেতনা, ৩। রাজনৈতিক-চেতনা ও ৪। শিল্প-চেতনা। শরৎচন্দ্রকে

বলা হয় বাংলার বর্তমান সমাজচিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তিনি দুই চোখ দিয়ে যা-কিছু দেখেছেন, তার উপর রসের আলোক ফেলে, দৃষ্টের সঙ্গে অদৃষ্টের মাখামাখি করিয়ে চিত্র সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের পারিবারিক জীবনকে, সমাজ-জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছে। রোমান্সের সুদূরতা নয়, প্রত্যক্ষগোচর অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত বলে এই দৃষ্টি যেমন বাস্তবপন্থী, তেমনি এর মধ্যে আমরা পাই তিল তিল বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয়। এ দৃষ্টি সর্বতোভাবেই সংস্কারমুক্ত। এই রকম দুর্লভ দৃষ্টির অধিকারী তিনি ছিলেন বলেই না শরৎচন্দ্র মানুষের হৃদয়দৌর্বল্য সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বেছে নিলেন অভিজাত শ্রেণীর মানুষ, আর রবীন্দ্রনাথ নিলেন তাদের যাদের আমরা বলে থাকি মার্জিত রুচির মানুষ। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঐ পথে একেবারেই গেলেন না। মধ্যবিত্ত ও সমাজের তলার শ্রেণীর মানুষ—এদেরই তিনি মনে করলেন সমাজের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাইতো তিনি চরিত্র সৃষ্টিতে সমাজের নীচের স্তরের সাধারণ মানসিকতাসম্পন্ন সাধারণ মানুষদেরই বেছে নিলেন। এদেরই মনের কথা স্থান পেল তাঁর সাহিত্যে। সেই যে জীবানন্দ প্রফুল্লকে একবার বলেছিল, 'আশ্চর্য এই পৃথিবী এবং তার চেয়েও আশ্চর্য এই মানুষের মন',—সে তো শরৎচন্দ্রেরই কথা। কারণ এই বিচিত্র মানবমন নিয়েই গড়ে উঠেছে শরৎ-সাহিত্য ও শরৎ-মানস। এই মানসের দর্পণে যাদের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই, তারা বাস্তব থেকেই জন্ম নিয়েছে, লেখকের কল্পনা-প্রসূত নয়।

উপন্যাস জীবনের ছবি। জীবনের কথাই উপন্যাসে বলিতে হইবে। জীবনের বাস্তব পটভূমিকে অস্বীকার করিয়া যে উপন্যাসে কল্পনার ফানুস উড়ানো হয়, খেয়াল-খুশির আবেগে সত্যকার জীবনের সম্পর্কহীন চিত্র যে উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়, তাহা উপন্যাস পদবাচ্য নয়। ঔপন্যাসিক জীবনকে যদি স্বীকার না করেন তাহা হইলে তিনি আর ঔপন্যাসিক থাকেন না।...ঔপন্যাসিক যে বিষয়বস্তু লইয়া লিখিবেন, তাহার সহিত তাঁহার নিজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা

চাই। (শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনধর্মী ঔপন্যাসিক, চরিত্র ফুটাইতে পারিপার্শ্বিকের সহিত মানবমনের সংঘাত এবং মনের বিভিন্ন বৃত্তির সংঘর্ষ তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে।) তিনি যে সমাজচিত্র রূপায়িত করিয়াছেন, তাহার বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাকে সচেতন থাকিতে হইয়াছে। এইজন্যই তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচিত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাঙালী সমাজ, বিশেষ করিয়া বাংলার পল্লীসমাজের অভিজ্ঞতা লইয়া এই সমাজের সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাকে চিন্তা করিতে ও লিখিতে হইয়াছে।'[১]

এবং তিনি যেভাবে চিন্তা করেছেন আর তাঁর সেই চিন্তাকে তিনি যে ভাষায় রূপ দিয়েছেন তারই মধ্যে আছে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী মনের পরিচয়। শরৎ-সাহিত্যের অন্তরঙ্গ পাঠকমাত্রেই জানেন, শরৎচন্দ্রের দেশ, তাঁর সমাজ তাই অতি সাধারণ মানুষের দেশ, তুচ্ছ মানুষের সমাজ। এই সমাজ থেকেই তিনি তাঁর সাহিত্যের প্রাণরস গ্রহণ করেছেন এবং এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে যে মানুষ তাকে তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেন নি, প্রাণ দিয়ে দেখেছেন অর্থাৎ ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনার এইটাই হলো মূল কথা। এই যে দেখা, এইটাই তো শিল্পীর দেখা। এর ফলে সেই রসস্রষ্টা শিল্পী যেসব চরিত্র সৃষ্টি করলেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি প্রাণস্পর্শী। সেখানে বেজে উঠেছে জীবনের একটিমাত্র সুর নয়, একাধিক সুর। এটা অনিবার্য, কারণ জীবন একতারা যন্ত্র নয়, সপ্তস্বরা বীণা। শরৎ-সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে সপ্তস্বরা বীণা—সেখানে জীবনের প্রত্যেকটি সুরই রচিত হয়। তাইতো আমরা দেখি বেণী, রমেশ, জ্যাঠাইমা, বৃন্দাবন, কুসুম, দেবদাস, শ্রীকান্ত, অন্নদাদিদি, ভারতী, অপূর্ব সবাই হলো বাস্তব; যেহেতু তারা জীবনের সত্য অংশ—একেবারে আমাদের সমাজের জীবন্ত অংশ। আর এই মানুষগুলি সত্যকে সকল অবস্থায় সত্য বলে গ্রহণ করবার সাহস দেখিয়েছে।

১. শরৎ-চেতনা: শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রসঙ্গে তাঁর চরিত্রহীন উপন্যাসের সেই সংস্কারমুক্ত নারী কিরণময়ীর সেই কথাগুলি আমাদের মনে পড়ছে। দিবাকরকে উপদেশ দিচ্ছেন কিরণময়ীঃ 'যা সত্য তাকে সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যে হোক আর শাস্ত্রই মিথ্যে হয়ে থাক। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়। সত্যের তুলনায় এঁদের কোন মূল্য নেই। জিদের বশে হোক, মমতায় হোক, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কার হোক চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই···এই কথাটা সবসময়ে মনে রাখা উচিত যে মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে সত্য প্রচার হয় না। সত্যকে সত্যের মত করেই বলতে হয়। তবেই মানুষ যে যার বুদ্ধির পরিমাণ বুঝতে পারে। আজ না পারে তো কাল পারবে।' মনে পড়ছে আলোকময়ী কমলের কথা। সত্যের সঙ্গে অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ নিয়ে আশুবাবুর সঙ্গে তর্ক করতে করতে সে বলছেঃ 'সত্য যাবে ডুবে আর যে অনুষ্ঠান আমি মানি নে তারই দড়ি দিয়ে ওকে রাখব বেঁধে?'

আচার-অনুষ্ঠানের ঘুণ-ধরা ভিতের উপর নয়, সত্যের গ্রানিট পাথরের বেদীর উপরই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্র বিদগ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন না সত্য, তবু তাঁর মত সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন লেখকের চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও সমাজচেতনা যেভাবে রূপ পেয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। এর একটা কারণ আছে। যে পটভূমিতে তিনি যেভাবে সমাজকে দেখবার ও দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন তা তাঁর আগে আর কোন কথা-সাহিত্যিক পান নি। বিষয়টি একটু খুলেই বলি। আমরা দেখেছি, এই শতাব্দীর সূচনায় ভারতীতে তাঁর উপন্যাস 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়। এর দু' বছর বাদে এই বইটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাঁর সময়কার বাংলার সমাজ-জীবনে চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল দু'বার। প্রথম সেই বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশী আন্দোলনের সময় আর তার কয়েক বছর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায়। এই আলোড়ন গুরুতর পরিবর্তন আনতে না পারলেও 'একটা লক্ষ্যণীয়

পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বাংলার সমাজ-মানসে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হিন্দু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই পরিবর্তন-আবেগ অধিক দানা বাঁধে।' এর কিছু পরেই এলো আসমুদ্র-হিমাচল সারা ভারতে জন-জাগরণের যুগ। অসহযোগ আন্দোলন। তার বিপুল ভাবপ্রবাহ। এই পটভূমিতেই শরৎচন্দ্র সমাজকে দেখেছিলেন এবং সমাজ-ব্যবস্থায় ও সামাজিকবোধে প্রয়োজনীয় যে পরিবর্তন আসন্ন হয়ে আসছিল তাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন।

এই গেল তাঁর সমাজ-চেতনার এক দিক।

এর অন্য দিকও আছে।

সেটি হলো তাঁর মানবতাবোধ। এ কথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা প্রবল মানবতাবোধের সহিত জড়িত। মানুষকে শরৎচন্দ্র মানুষ হিসাবেই দেখিতেন এবং মানুষ হিসাবেই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষ আসলে ভাল, সমগ্রভাবে ভাল। পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায়, শিক্ষা বা পরিবেশের সুযোগের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু একেবারে সবদিক দিয়া মানুষ কখনই নষ্ট হয় না। তবে আপাতদৃষ্টিতে মানুষের যে হীনতা পরিলক্ষিত হয়, সমগ্র জীবন বা চরিত্রের হিসাবে তাহা যত আংশিকই হৌক, সেই দৈন্যকে অনেকে বড় করিয়া দেখে, সমাজের প্রচলিত বিধিবিধানে অভ্যস্ত অনেকেই এই বিশেষ মানুষের দুর্বলতাকে ক্ষমা করিতে পারে না।......কিন্তু শরৎচন্দ্র বলিতে চান এই ব্যক্তি যত ছোট হৌক, ক্ষুদ্রতা হইতে তাহার মুক্তি সম্ভাবনা আছেই।'[১] তাঁর সংবেদনশীল মন কখনো বিশ্বাস করতে চাইত না যে, মানুষ তার সামগ্রিক ঐশ্বর্য থেকে যে কোন অবস্থায় রিক্ত হয়ে পড়তে পারে।

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিজের একটি উক্তি মনে পড়ে। একবার তিনি বলেছিলেনঃ 'সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না। মানুষ কি, তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না। অতি কুৎসিত নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি যা কল্পনা করা যায় না।... মানুষের ভিতরকার সত্তাটা অনুভব করাই আমার উদ্দেশ্য। যার একবার স্খলন হলো, মানুষ তাকে একেবারে বাদ দেবে, এ কেমন কথা?' আর একবার তিনি বলেছিলেনঃ 'মানুষের আত্মার আমি অপমান করতে কখনও পারি না। কোন মানুষকেই নিছক কালো মনে করতে আমার ব্যথা লাগে। আমি ভাবতে পারি নে যে একটা মানুষ একেবারে মন্দ, তার কোন redeeming feature নেই। ভাল-মন্দ দুই-ই সবার মধ্যে আছে। তবে হয়তো মন্দটা কারো মধ্যে বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ঘৃণা তাকে কেন করব? অবিশ্যি আমি কখনও বলি না যে পাপ ভালো। পাপের প্রতি মানুষকে প্রলুব্ধ করতে আমি চাই নে। আমি বলি তাদের মধ্যেও তো ভগবানের দেওয়া মানুষের আত্মা রয়েছে। তাকে অপমান করবার আমাদের কোন অধিকার নেই। আমি এমন জিনিস অনেক সময় তাদের মধ্যে দেখেছি, যা বড় সমাজের মধ্যে নেই। মহত্ত্ব জিনিসটা কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে না। তাকে সন্ধান করে খুঁজে নিতে হয়। মানুষ যখন মহত্ত্বের সন্ধান করতে ভুলে যাবে তখন সে নিজেকে ছোট করে আনবে। আমি অনেক সময় তাদের মধ্যে যা ভালো, দেখাতে চেয়েছি।'[১]

এইভাবে মানুষকে দেখে, মানুষের আত্মার সন্ধান পেয়েই তো সমাজসচেতন শরৎচন্দ্র বাংলা কথা-সাহিত্যে একদিন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সেই তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রথম দিনটি থেকে তাঁর সর্বশেষ অসমাপ্ত রচনা 'শেষের পরিচয়' পর্যন্ত তিনি অকৃপণ হস্তে যা

১. ১৯২৩, ৩০ এপ্রিল, প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।

দিয়ে গেছেন তার ভিতর থেকে মানুষের ভালোয়-মন্দে মিশানো মানুষের চিরন্তন মহিমাই বিঘোষিত হয়েছে। জীবন-সন্ধানী শরৎচন্দ্রই সাহিত্যে প্রথম নিয়ে এলেন সহজ জীবনের পরিচয়, সহজ মানুষের পরিচয়। কিন্তু এহো বাহ্য। শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনায় আরো একটি সত্য ধরা পড়েছে। তাঁর নিজের কথায় সেটি হলো এই ঃ 'মানুষ তো শুধু নরও নয়, নারীও নয়—এ দুয়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্ধেককে বাদ দিয়ে যখনি দেখি সে নিজেকে বৃহৎ করে পেতে চায়, তখন দেখি সে আপনাকেও পায় না, ভগবানকেও খোয়াল।...পৃথিবীতে কোন একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আরেকজনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, বাহিরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে।'[১] এই যে দুয়ে মিলে এক এবং একের মধ্যে দুই—এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সমাজের মধ্যে সর্বাঙ্গীণরূপে বাস করতে গিয়ে এই দু'য়ের স্থান কোথায় কেমন—তাঁর প্রায় উপন্যাস-গুলির মধ্যেই সেইসব কথাই তুলে ধরেছেন।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের এই ভারতবর্ষ মানুষের এই দুই সত্তাকে তাদের স্বাতন্ত্র্যে স্বীকার করতে শেখে নি। সে মানুষ বলতে কেবল নরকেই ধরে নিয়েছে প্রধান করে এবং তাকেই করেছে কেন্দ্র। তাই জীবনব্যবস্থা তথা সমাজব্যবস্থায় নারীকে একান্তভাবে সেই নরের বিকাশ ও প্রকাশ লাভের সহায়করূপেই দেখে তার স্থান ও মর্যাদা নির্দেশ করেছে। নারীকে তারা শুধু নারীই করে রেখেছিল, মানুষ হতে দেয় নি, তাইতো সে আজ এমন দায়, এমন ভার হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই নারী-বন্ধন, তাই জীবন-সাধনায় সে যেমন জীবনসঙ্গিনী নয়, ব্রহ্মলাভ সাধনায় সে প্রতিবন্ধকই। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে নারীকে মর্যাদার আসনে বসিয়ে বললেন, মনুষ্যত্বের কাছে এ দেনা আজ শোধ করবার দিন এসেছে। আরো বললেন, নারী শুধু চিরদিন

১. শেষ প্রশ্ন ঃ শরৎচন্দ্র

সহায়কই থাকবে না, থাকতে পারে না। একটি পরিপূর্ণ মনুষ্য-সত্ত্বার এক প্রকাশ নর, অপর স্বাভাবিক প্রকাশ নারী।

শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছিলেন কি অসহনীয় বঞ্চনা-নিগ্রহ ও দুঃখের ভেতর দিয়ে বাঙালী হিন্দুঘরের অন্তঃপুরচারিণী নারীর জীবন অতিবাহিত হয়। সমাজে ও পরিবারে নারীর প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করার জন্যই তো তিনি লিখলেন 'নারীর মূল্য', বোঝালেন আমাদের নারীর অধিকারের মর্মকথা। 'সমগ্রভাবে সমস্ত নারীজাতির সুখ-দুঃখের মঙ্গল-অমঙ্গলের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর সমস্ত হীনতা সমস্ত ফাঁকি এক মুহূর্তেই সূর্যের আলোর মত ফুটিয়া উঠে'—নারীর পক্ষ নিয়ে এমন কথা বাংলার আর কোন কথা-সাহিত্যিক লিখতে পেরেছেন? শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের সার কথা হলো এই যে, 'নারীকে যে সমাজ যত বেশি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে, সে তত বেশি নারীর উপর অন্যায় করিয়াছে, এবং তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নারীকেও নত করিয়াছে। নিজেরাও অবনত হইয়াছে।'[১]

শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা নিবিড় ও আন্তরিক ছিল বলেই না আমরা দেখতে পাই, নারীজীবনের বেদনা ও পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অপমান ও লাঞ্ছনা, এসব কথা তাঁর বহু উপন্যাসে তিনি বার বার বলেছেন। এই বঞ্চিতাদের 'জীবনের মধুকোষে যে সত্য রয়েছে সেটি তিনি আমাদের গভীর বেদনা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন। নারীর জীবনে যে সহনীয় কিছু থাকতে পারে, পুরুষের সমাজ নারীদের ললাটে যে কলঙ্কের তিলক পরিয়ে দিয়েছে তা যে পুরুষেরই কলঙ্ক-স্বীকৃতি, যাদের কপালে নিজেদের কলঙ্কের দাগ পুরুষ পরিয়েছে তারা যে মনুষ্যত্বে পুরুষদের চেয়ে অনেক বড়, সমাজ যাদের হেয় বলে ঘোষণা করেছে তারা যে আদপেই হেয় নয়, তারা যে মনুষ্যত্বের আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে আমাদের এই সমাজের

১ নারীর মূল্য : শরৎচন্দ্র।

বক-ধার্মিকতার কুয়াশার অন্ধকারে, এ-কথা তাঁর সাহিত্যের নারী-চরিত্র মারফত শরৎচন্দ্র বার বার প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমাদের অন্তরে।'[১]

আমাদের সমাজ ও সংসারকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্যই সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে নারীত্বের মহিমার জয়গান বিঘোষিত হয়েছে। দেবীত্বের দোহাই দিয়ে যাদের মানুষের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যে হৃদয়হীন চাতুর্য আমাদের সমাজ এতকাল দেখিয়ে এসেছে তাকেই কঠোরভাবে আঘাত করেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে, চিঠিতে ও উপন্যাসে। একটি যথার্থ সংবেদনশীল মনের অধিকারী তিনি ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সমাজ ও সমাজপতিদের সম্মুখে নারীত্বের মহিমা ও আদর্শকে এমন উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত করতে। আর এই কাজটা করতে গিয়ে তাঁকেই কি কম নিন্দা ও অপযশের ভাগী হতে হয়েছিল? সমাজের অনুদার ঔদ্ধত্য আর নির্বিচার অবিচারকে আঘাত করে, শরৎচন্দ্র তাকে মোহমুক্ত করতে চেয়েছেন। মানুষের চলমান জীবনের ছন্দ রচনার নামই হচ্ছে সমাজ। তাই সমাজ-জীবনে গতি আনবার জন্যই সমাজের অবিচারকে আঘাত করার প্রয়োজন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এর বিপরীত কথাও বলেছেন: 'সমাজ যাই হোক তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না।'[২] যিনি এক নিশ্বাসে বললেন যে সমাজের ঔদ্ধত্যকে, অবিচারকে আঘাত করতে হবে, তিনিই আবার অপর নিশ্বাসে বললেন, সমাজ যাই হোক তাকে মান্য করতে হবে।' এই দুইটি বিপরীত উক্তির মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য কোথায়? শরৎচন্দ্র কি বুঝতেন না যে, অন্যায়কে মেনে নিলে ভালো করবার সৎ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত

---

১. শরৎচন্দ্র: দেশ ও সমাজ: সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. পল্লীসমাজ: শরৎচন্দ্র।

হই যে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল বিদ্রোহে পর্যবসিত হয়েছে। তাইতো একজন সমালোচক বলেছেন: 'মানুষের উপর শরৎচন্দ্রের দরদ আছে। কিন্তু সে দরদের অন্তরে বীর্যের একান্ত অভাব, বড়ো কোমল পর্দায় বাঁধা সে দরদ, তার অন্তরে সত্যের বজ্রাগ্নি নেই।'

অসামাজিক প্রেমের রূপায়ণে শরৎচন্দ্র যত্নের কার্পণ্য করেন নি। তেমনি পতিতা সমস্যাটিকেও তিনি একটি জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবেই দেখেছেন। তিনিই আমাদের দেশে প্রথম লেখক যিনি এই সমস্যাটিকে সম্পূর্ণ মানবতামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন ও ভেবেছেন। পতিতাকেও তিনি মানুষ বলে মনে করেছেন এবং জঘন্য জীবন-যাপনের মধ্যেও তাদের ভিতরকার মানবিক সত্তা তিনি শুধু আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হন নি, তাকে তাঁর সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করেছেন। পতিতারাও নারী, নারীর স্বভাবধর্ম প্রতিকূল পরিবেশে অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও নারীধর্ম কি তাদের মন থেকে লুপ্ত হয়? না—এটাই হলো শরৎ-সাহিত্যের উত্তর। পতিতার প্রতি তাঁর সহানুভূতি সংরক্ষণশীল সমাজ সহজে গ্রহণ করতে পারে নি এবং এজন্য একশ্রেণীর পাঠকের কাছে তাঁকে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকতে হয়েছিল এবং নীতিবাগীশরা তাঁর উপন্যাস কাউকে পাঠ করতে দেখলে নাসিকা কুঞ্চন করতেন। কিন্তু আসলে শরৎচন্দ্র যেটা দেখাতে চেয়েছেন সেটা পতিতাবৃত্তির জয়গান নয়, পতিতার মনের ছবি। তাদের মন আছে, বাসনা-কামনা আছে, মনের ভুল বা পারি-পার্শ্বিকের চাপে পতিতা জীবনযাপনের গ্লানিবোধ আছে আর আছে পুরনারাদের মত মাথা উঁচু করে থাকতে না পারার বেদনা। এই জিনিসটাই তিনি তাঁর সাহিত্যে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে স্থান দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "শরৎচন্দ্রের মহত্ত্ব এই যে, তিনি পতিত নারীর সঙ্গে পতিতা নারীর ভুল করেন নাই। তাঁহার বাস্তবসম্মত লেখনী পতিত নারীকে সামাজিক মর্যাদায়

ফিরাইয়া লইয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের মানবিক মহত্ত্বের উপরেও প্রতিষ্ঠিত করিতে ভোলে নাই। সামাজিক মর্যাদাই একমাত্র মর্যাদা নয়, মানবিক মর্যাদা বলিয়াও একটা বস্তু আছে। তাহার মূল্য অপরটির চেয়ে অল্প নয়। সেই অত্যুচ্চ পীঠস্থানে তিনি পতিত নারীদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—এখানেই তাঁর করুণা। মানবিক মহত্ত্বের পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শরৎচন্দ্রের সাবিত্রীর উন্নত ললাট পৌরাণিক সাবিত্রীর প্রায় সমান হইয়া পড়িয়াছে। খুব সম্ভব লেখকের জ্ঞাতসারেই সাবিত্রী নামের মধ্যে এইরকম একটা ইঙ্গিত বর্তমান।'[১]

এই সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার পরিণাম পতিতাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়া নয়, সমাজের উপর আবেগজনিত আঘাত। শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে অবশ্যই এটা করতে চান নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি এইসব পতিতা বা পদস্খলিতা নারীকে মানুষ হিসাবে এঁকে দোষ-ত্রুটি-হীনতা সত্ত্বেও তিনি তাদের মানবিক গুণাবলীকেই পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন এবং তাদের অন্তরে এদের জন্য কিছু সহানুভূতি উদ্রেকের মহৎ প্রয়াসই পেয়েছেন। 'এইভাবে হৃদয়গ্রাহীরূপে পতিতা চরিত্রের রূপায়ণ করিয়া শরৎচন্দ্র সামাজিক মানুষকে তাহাদের উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং ফলে সমাজ-শৃঙ্খলায় আঘাত পড়িয়াছে,—শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতার প্রমাণ কাহিনীর পরিণতিতে রাখিয়া শরৎচন্দ্র এরূপ অভিযোগ আপন সাহিত্যিক নিষ্ঠার জোরে উপেক্ষা করিয়াছেন।'[২] আসল কথা, সমাজকে ভালবাসতেন বলেই সামাজিক মানুষ—সে পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক—ভ্রষ্ট হলেই তাকে তিনি চিরকালের জন্য ভ্রষ্ট ধরে নিতেন না এবং ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন বড় গুণ থাকলে তা দরদের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে যত্ন নিতেন।

১. বাংলা সাহিত্যে নরনারী: প্রমথনাথ বিশী।

২. শরৎ-চেতনা: বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই মানবপ্রীতিমূলক সমাজ-চেতনার জন্যই শরৎচন্দ্রের হাতে সাবিত্রী, সতীশ, কিরণময়ী, জীবানন্দ, দেবদাস, চন্দ্রমুখী, বিজলী, সবিতা, রাজলক্ষ্মী, সুরেশ প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে পরিচিত মন্দ দিকের উদ্ঘাটনের সঙ্গে অন্তর্লীন ভালো দিকেরও প্রকাশ ঘটেছে। মালিন্যের ঊর্ধ্বে মানবজীবনের অম্লান মহিমা ঘোষণার মধ্যেই তো সার্থক হয়েছে শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা। পতন-স্খলনের মধ্যেও তিনি দিয়েছেন জীবনের অপরাজিত মহিমার আশ্বাস এবং শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার এইটাই হলো মূল কথা। সমগ্র শরৎ-সাহিত্য তাই লেখকের মানবিক মহিমাবোধ এবং নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে উজ্জ্বল। উজ্জ্বল এবং সুন্দর।

হিন্দু পরিবারে বাঙালী মেয়ের স্বামী-সংস্কার বিষয়টি শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনার মধ্যে বিশেষভাবেই স্থান পেয়েছে দেখা যায়। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের কয়েকটি নারী-চরিত্রের মাধ্যমে তিনি এই বিষয়টির নিগূঢ় তাৎপর্য যেভাবে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করেছেন তা শরৎ-সাহিত্যকে যেন একটি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে। এইবার এই সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করব। গৃহস্থঘরের বিবাহিতা নারীদের মধ্যে স্বামী-সংস্কার চিরদিনই খুব প্রবল। এর মূলে আছে সামাজিক নীতি ও সমাজের প্রভাব। কিন্তু এই সংস্কারের উপরেও একটি জিনিস আছে। সেটি হলো নারীর হৃদয়-ধর্ম। একদিকে স্বামী-সংস্কার আর অন্যদিকে হৃদয়-ধর্ম—এই দুটি বিষয় পাশাপাশি স্থান পেয়েছে শরৎচন্দ্রের চিন্তায় এবং যদিও তিনি সতীত্ব ও নারীত্ব—এই দুটিকে আলাদা করে দেখেছেন তথাপি আমরা দেখতে পাই যে নারীর স্বামী-সংস্কার সম্পর্কে তাঁর মনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণে হৃদয়-ধর্মের সমাজ-নিরপেক্ষ রূপায়ণে আধুনিকতার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রচলিত মূল্যবোধ ভেঙে দিয়ে বিদ্রোহী মনের পরিচয় দিতে পারেন নি। এইজন্য কোন কোন সমালোচক প্রগতিধর্মী

লেখক হওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রকে সংরক্ষণশীল বলেছেন। কিন্তু আসল কথাটি হলো এই: 'সামাজিক উপন্যাসে সমকালীন সমাজের ছাপ থাকে বলিয়া তিনি আপন কালের বাঙালী মেয়েদের মানস-গঠন লক্ষ্য করিয়া তদনুসারেই নারী-চরিত্র আঁকিতে চাহিয়াছেন এবং এইজন্য তাঁহার সময়কার বাঙালী মেয়েদের স্বাভাবিক গভীর স্বামী-সংস্কার শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি নারী-চরিত্রের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।...তবে তিনি সবকিছুর মূলে রাখিয়াছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে উদার শ্রদ্ধাবোধ।'[১]

শরৎচন্দ্র আদৌ সংরক্ষণশীল লেখক ছিলেন না। সংস্কার-মুক্ত একটি উদার মন নিয়েই তো তিনি বাংলার সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: 'ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই, তাঁহার মনটি ছিল সংস্কারমুক্ত, জীবনকে তিনি দেখিয়াছিলেন শুধু সমাজ, জাতি, ধর্ম ও নীতির সংস্কারের রঙীন চশমার ভিতর দিয়া নহে—জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন সংস্কারের বাহিরে তাহার স্বাধীন স্বাভাবিক রূপে।'[২] অন্নদা ও অভয়া—এই চরিত্র দুটির কথা স্মরণ করলেই আমরা এই মন্তব্যটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারব। শরৎ-সাহিত্যে স্বামী-সংস্কারের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি। এই চরিত্রটি শরৎচন্দ্র বিশেষ যত্নের সঙ্গেই এঁকেছেন। অভয়া স্বামীকে ত্যাগ করে আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, অন্যদিকে অমানুষ হলেও অন্নদা তার স্বামীকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে আত্মদীপ্তিতে উজ্জ্বল। এই দুটি বিবাহিতা নারীকে দুটি মেরুপ্রান্তে রেখে, দুদিক থেকে দেখিয়ে শরৎচন্দ্র মানুষের ব্যক্তিমনের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য বিপরীত প্রান্তে ফুটিয়েছেন। এই দুটি নারী-চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক এই কথাটাই আমাদের বুঝিয়েছেন—মানুষ তার অন্তর্নিহিত মূল্যেই সত্য এবং আপন মনের সম্পদেই মানুষের সত্যকার মর্যাদা।

১. শরৎ-চেতনা: বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বাঙলা সাহিত্যে নবযুগ: শশীভূষণ দাশগুপ্ত।

অসামাজিক প্রেম আর সামাজিক বিবাহ-বন্ধন—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি সত্য? কি বঙ্কিমচন্দ্র, কি রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্রের এই দুজন পূর্বসূরীই সমাজ-সম্মত বিবাহের প্রতিই পক্ষপাত দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে প্রেমের মহিমা (যাকে তিনি বাল্যপ্রণয় বলে অভিহিত করেছেন) সরবে ঘোষিত হলেও, যেখানে প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি নেই সেখানে তিনি প্রেমিক-প্রেমিকার বিয়ে দিয়ে সমাজের বিরোধিতা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের একাধিক উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাদের মিলন ভেঙে গিয়েছে, বিবাহ-সংস্কারেরই জয় হয়েছে। নৌকাডুবির রমেশ ও কমলা অথবা ঘরে-বাইরে-তে সন্দীপ ও বিমলা—এর দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে অসামাজিক বা নিষিদ্ধ প্রেমের নিপুণ রূপকার শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারাও দেখতে পাই অসামাজিক প্রেমের জন্য দুঃখভোগই করেছে, তাদের প্রেম কদাচিৎ মিলনে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তথাপি এ-কথা বলতে বাধা নেই যে, 'অসামাজিক প্রেমের উদ্ভব ও স্থিতির খুঁটিনাটির দরদী বর্ণনায় শরৎ-সাহিত্য অনুপম, এদিক হইতে তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক শিল্পী।' কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত অসামাজিক প্রেমকে খুব কম ক্ষেত্রেই সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আবার সবক্ষেত্রেই যে তিনি নিছক বিবাহের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এমন নয়। বরং দেখা যায় যে, সমাজের অনুমোদন-হীন প্রেমকে বিয়েতে পরিণতি লাভ না করিয়ে প্রেমের বেদনার মধ্যেই সীমায়িত রেখেছেন। শরৎচন্দ্র একান্তভাবেই সমাজ-সচেতন শিল্পী, তাই সামাজিক বন্ধনকে, অথবা সমাজ-জীবনে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত মনোভাবকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। মোটকথা, নারী-হৃদয়ের প্রেম এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত মিলনহীন এই প্রেমের জন্য দীর্ঘ উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা ও দুঃখবরণ—সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের এটাই হলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

সমাজের বিধিবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-প্রেমকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা সত্ত্বেও, আত্যন্তিক সমাজ-চেতনার জন্য

শরৎচন্দ্র সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রশ্নটা ভবিষ্যতের জন্য রেখে গিয়েছেন। শরৎ-মানসের এই দিকটি লক্ষ্য করে একজন সমালোচক লিখেছেন : 'In spite of his revolutionary ardour, there is in Saratchandra an element of conservatism that has often surprised people'.[১] সমালোচকের এই অভিমত স্বীকার করেও আমরা বলব যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ যা পারেন নি, শরৎচন্দ্র সেই সাহস বা দুঃসাহস দেখিয়েছেন—প্রেমের জাতিবিচার করেন নি। একমাত্র তাঁরই রচনায় প্রেম বহুবিচিত্র পটভূমিতে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। যেখানে নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসা সার্থক বলে সমাজের আপত্তি নেই বা সমাজের বিশেষ কিছু এসে যায় না, তিনি অপেক্ষাকৃত উদারতার সঙ্গে সেখানে প্রেমের সার্থক পরিণতিই এঁকেছেন। এর মূলে আছে মানবতাবোধ আর এই বোধ-সঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গীর স্পর্শ।

বিধবা নারীদের, বিশেষ করে বালবিধবাদের, জীবনে প্রেমের সমস্যা শরৎ-সাহিত্যের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্টা। পুরুষকে অবলম্বন করেই নারী বাঁচতে চায়, জৈব-জীবনের অনিবার্যতাকে সে অস্বীকার করতে চায় না। 'এইজন্য ভালবাসার পাত্র সরিয়া গেলেও ভালবাসা নারীমনে মরিয়া যায় না এবং নূতন পাত্রের সন্ধান মিলিলে এবং তাহাতে নারীর মন বসিলে পুরাতন প্রেমের নিষ্ঠা নূতনের ক্ষেত্রেও নূতনরূপে ফিরিয়া আসা অসম্ভব নয়। এই প্রশ্নের উপরই তাঁহার বিধবা নারীদের প্রেম-সমস্যা দাঁড়াইয়া আছে।' এর দৃষ্টান্ত পল্লী-সমাজের রমা। রমা যখন রমেশকে ভালবেসেছে তখন তার বৈধব্য-সংস্কার সত্ত্বেও তার স্বামীর স্মৃতি তার এই প্রেমের পথে অন্তরায় স্বরূপ হয়ে ওঠে নি। শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা নিঃশব্দে আমাদের কাছে যেন এই সত্যটাই নিঃশব্দে ঘোষণা করছে : 'মানুষ থাকিলেই

১. **Sarat Chandra Chatterjee : Prof. Humayun Kabir.**

মানুষের হৃদয় থাকিবে এবং মানুষের হৃদয় থাকিলেই নরনারী বিশেষ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে ইহা জীবন-সত্য। কোন ভাল ঔপন্যাসিকই এই জীবন-সত্যকে বাদ দিয়া লেখনী চালনা করিতে পারে না। শরৎচন্দ্রও পারেন নাই।'

শরৎচন্দ্রের মন বাস্তববাদী, সমসাময়িক যুগধর্মের পরিবর্তনশীলতার প্রতি আস্থা সত্ত্বেও তিনি হিন্দু-সংস্কার-সৃষ্ট বাধাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তার ফলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও তাঁর ব্যক্তিত্বেও বিরোধ বেধেছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। তাই বিদ্রোহ ও রক্ষণশীলতা তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে। কেমন করে একই মানসে যুগপৎ বিপ্লবাত্মক প্রেরণা ও রক্ষণশীলভাবের সমাবেশ ঘটল, এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। এর ফল এই হয়েছে যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই, তিনি শুধু সহানুভূতি ও করুণাকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। তাঁর একটি নারী-চরিত্রও সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি। শরৎ-সাহিত্য-সম্পর্কে এই রকম সমালোচনা অনেকেই করে থাকেন। তাঁদের কিন্তু এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, যে সমাজ-চেতনা শরৎ-মানস গঠনে সক্রিয় ছিল তার মূল বিষয়টা হলো সমবেদনা—যে দুঃখী, যে বঞ্চিত, যে অত্যাচারিত, তার প্রতি সীমাহীন সমবেদনা—যে সমবেদনায় তিনি নিজেকে একেবারে উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই যে সমবেদনা, এর উৎস মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়। তবে এ-কথা ঠিক যে সমবেদনার আতিশয্য একই সঙ্গে হয়েছে তাঁর শক্তি ও দুর্বলতার হেতু।

এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক যথার্থ লিখেছেন: 'শরৎচন্দ্রের এই সমবেদনা-বোধ আরো একটু সূক্ষ্মভাবে দেখা দরকার। এর নাম দেওয়া হয়েছে সমবেদনা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ তার চাইতে বলবত্তর বা মহত্তর সামগ্রী। এর মূলে একদিকে অদম্য কৌতূহল

অন্যদিকে মানুষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মানুষের অন্তরতম মাহাত্ম্যে তাঁর বিশ্বাস। নারীপ্রকৃতির মাহাত্ম্যে তিনি একান্ত শ্রদ্ধাশীল এ-কথা সুবিদিত, কিন্তু শুধু নারীর মাহাত্ম্যে নয় ব্যাপকভাবে মানুষের মাহাত্ম্যে তিনি বিশ্বাসবান্—মানুষ যে স্বভাবতঃ সুন্দর ও মহৎ, সে মাহাত্ম্য জীবনের সংকট-মুহূর্তে তাকে দেবদত্ত বর্মের মত ঘিরে দাঁড়ায়, তার জীবনকে অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে বিভূষিত করে—যেমন স্বেচ্ছাচারী সুরেশের অন্তিম মুহূর্ত পরম মহিমময় হলো—এ-কথা ভাবতে তাঁর আত্মার আনন্দ।'[১]

আসল কথা, মানুষের অন্তরতম মাহাত্ম্যে শরৎচন্দ্রের যে বিশ্বাস তা অতি সত্য বস্তু—ভাবালুতার সামগ্রী নয় আদৌ। এটাই তাঁর ধর্মবিশ্বাস। বেদনা-লাঞ্ছিত মানুষ বা জীব ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ দেবতা—এরই পূজারী ছিলেন তিনি। এই বিশ্বাসই তাঁর সমাজ-চেতনার ভিত্তি বলা চলে এবং এরই দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে সমাজের তথা সমাজের মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজেকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাইতো তাঁর জীবন ও প্রতিভা দুই-ই বর্তমানের আঙিনায় নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতোই দীপ্যমান।

॥ উনিশ ॥

শরৎচন্দ্র একান্তভাবেই মানবতাবাদী সাহিত্যিক।

মানুষের জীবন নিয়েই তিনি গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর ধর্মচেতনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক যে বৃত্তি-আচরণ, শরৎচন্দ্র তাকেই ধর্ম বলে স্বীকার করতেন। অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি নয়, কর্তব্যপালনই

১. শাশ্বত বঙ্গ : কাজী আবদুল ওদুদ।

ধর্মপালন—এটাই তিনি মানতেন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুসরণ করতেন। তাই তাঁর সাহিত্যে প্রচলিত ধর্মবোধের চিত্র আমরা খুব কমই দেখতে পাই। মহৎ জীবনযাপনই সত্যকার ধর্মাচরণ —এই বিশ্বাসে, মনে হয়, তিনি আজীবন অটল ছিলেন। মানুষের প্রতি কর্তব্যপালনে, মানুষের প্রতি নির্মল প্রেমে যে ধর্মাচরণ হয় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে এই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসার মধ্যে। রাজলক্ষ্মী এর একটি বড় দৃষ্টান্ত। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, গোড়ার দিকে আচারগত ধর্মের দিকে ঝুঁকে শ্রীকান্তকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী আচারগত ধর্মকে নয়, এই জগতেরই একজন মানুষকে নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবাসল আর সেই ভালবাসার গৌরবে সে ভগবানকেও পূজা করবার অবকাশ পেল না। বরং রাজলক্ষ্মীর এই স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান তার এই মানুষী ভালবাসার নিষ্ঠায় প্রসন্ন হবেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই যে দ্বারিকাদাস বাবাজীর উপদেশ সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসাকে ভগবৎমুখী করে তুলতে কিছুতেই সম্মত হয় নি।

যাঁরাই মনোযোগের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্য পাঠ করেছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, মানবদরদী শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনা যেমন, তাঁর ধর্মচেতনাও তেমনি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল। তাঁর লেখায় ধর্মের শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানের দিকটি বার বার নিন্দিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে তিনি খুব কমই লিখেছেন। অনেকের ধারণা, শরৎচন্দ্র নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু সে কথা একেবারেই সত্য নয়। তিনি ধার্মিক ছিলেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসীও ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে শ্রীকান্ত চতুর্থপর্বের শেষ দৃশ্যটি। কমললতা এখানে শূন্য হস্তে চিরবিদায় নিচ্ছে শুধু ভগবানের উপর একান্ত ভরসা রেখে। শ্রীকান্ত কমললতাকে টাকা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ভগবানের চরণে আশ্রয় নিয়ে কমললতা সে টাকা গ্রহণ করে নি, শান্ত-মনে নিঃস্ব অবস্থায় সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। 'না গোসাঁই, টাকা আমার চাই নে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেছি

তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই, সব অভাব তিনি পূর্ণ করে দেবেন।' কমললতার এই স্নিগ্ধ প্রত্যয়ের মধ্যেই আভাসিত হয়েছে তার স্রষ্টার ধর্মচেতনা।

সংসার ও জীবনকে অস্বীকার করে ভগবানের জন্য যে আর্তি, শরৎচন্দ্রের মন তাতে সায় দেয় না। তিনি জীবনধর্মী সাহিত্যিক, তাই তাঁর ধর্মচেতনার মধ্যে সংসার উপেক্ষিত হয় নি। শুধু তাই নয়। 'অন্যায় ও অসত্য ন্যায় ও সত্যের স্বাভাবিক বিকাশে যেখানে পরাজিত হইয়াছে, পাপ এবং মিথ্যাচার বিবেক ও মহত্ত্বের অভ্যুদয়ে যেখানে ধুলিলুণ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই ভগবানের আত্মপ্রকাশ, এই শরৎচন্দ্রের প্রত্যয়।' রোগশয্যায় শায়িত কাশীনাথের নীরবে চোখ বুজে অন্তর্যামীকে উপলব্ধি অথবা 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে উপেন্দ্রের অসুখের বাড়াবাড়িতে কিরণময়ীর ঈশ্বর-নির্ভরতার দিকে যে মানস-পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তার মধ্যে কি শরৎচন্দ্রের আস্তিক্যতা ফুটে ওঠে নি? সুখের দিনে নয় দুঃখের দিনেই তো আমরা ভগবানকে বেশি করে স্মরণ করে থাকি। এই অতি সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ধারণা তাঁর বেদনা-বিক্ষুব্ধ একাধিক নায়িকাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে 'স্বামী' গল্পে গৃহত্যাগের পর অনুতপ্তা সৌদামিনীর স্বীকৃতি: 'যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে রেহাই দিলেন না।' অথবা 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের মৃত্যুর পর স্বামীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে তার সম্মুখেই ভগবানের কাছে অচলার সেই সকরুণ আর্তি নিবেদন: 'তোমাকে হারিয়ে পর্যন্ত ভগবানকে আমি কত জানাচ্ছি, হে ঈশ্বর, আমি আর পারি নে—আমাকে তুমি নাও। কিন্তু তিনিও শুনলেন না, তুমিও শুনতে চাও না। আমি আর কি করব!'

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও শরৎচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের ওপর চমৎকার আলোকসম্পাত করেছেন তাঁর সুহৃদ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন: শরৎচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর

অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক।...তাঁর সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন। বললুম—সেটা বলা কঠিন, হয়ে গেলে অলাভ নেই তো! তবে ঝঞ্ঝাট থেকে কতকটা মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেরই আসা—এইটে ঠিক বলেছেন, বলে হাসলেন শরৎচন্দ্র। বললেন—আমাকে নাস্তিক বলে অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয়। বললুম—অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাতে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে আপনি পরম আস্তিক।—কে বললে, কোথায়? ভুল কথা—। বললুম—যা নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই, সেই 'চরিত্রহীনে'ই রয়েছে। দিবাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারে নি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাশ্রু ক্ষমা প্রার্থনা না করে বাড়ি ফিরতে পারে নি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন, বিশেষ ক্ষতিও হতো না। আপনি পারেন নি।'

ব্রাহ্মণ-সন্তান শরৎচন্দ্রের মনে হিন্দুধর্ম-সংস্কার যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর রচনার মধ্যে এর অপর্যাপ্ত প্রমাণ মিলবে। এই ধর্মসংস্কারের মধ্যে একটি হলো তীর্থস্থানগুলির প্রতি শ্রদ্ধা। শরৎ-সাহিত্য পাঠকমাত্রেই জানেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বার বার কাশী-বৃন্দাবনে গিয়ে জীবনে শান্তি খুঁজেছে। ঈশ্বরবিশ্বাসী শরৎচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে ছিলেন মানবতাবাদী সাহিত্যিক, তাই তাঁর পক্ষে ধর্মকে মানবতাবাদের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখা স্বাভাবিক ছিল। এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলবে তাঁর কুন্তলীন পুরস্কার পাওয়া 'মন্দির' গল্পটিতে: 'অপর্ণা শ্বশুরালয়ে যাইতেছিল, পথে সন্ধ্যার শঙ্খঘণ্টার শব্দে সচকিত হইয়া সে নিজেদের

১. শরৎ-কথা: কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৫)।

গৃহদেবতার মন্দিরচূড়া কল্পনা করিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়টিতে মন্দিরের ভিতরে দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারায়ণ মদনমোহন ঠাকুরের পার্শ্বে ধূপধূনার ধূমে ও চক্ষুজলে অস্পষ্ট একখানি দেবীমূর্তির অনিন্দ্যসুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছিল।'

'দেনা-পাওনা'র ফকির সাহেবের বহিরঙ্গ বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম-জীবনের সবিশেষ আলোচনা লেখক করেন নি, কিন্তু তিনি পাঠকের সামনে এই চরিত্রটিকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা শরৎ-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে না কি? কি সুন্দরভাবেই না তিনি 'জীবনায়নে পবিত্রতা-সুরভিত এই চরিত্রটির কল্যাণ-রূপ' ফুটিয়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা শাস্ত্রীয় অনুশাসন মুক্ত ও মানবতা-বোধে ঋদ্ধ। একটা প্রবল ধর্মবোধ বা ঈশ্বরবিশ্বাসের ভিত্তির উপরেই যে শরৎ-সাহিত্যের সৌধ দাঁড়িয়ে আছে, সেটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাঁর জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু ছিল না। **'All great creative artists have within themselves some sort of religious urge which is their elan vital and which sustains their creations'.** ডি. এইচ. লরেন্সের এই উক্তিটি কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ লেখকরাই তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে এই প্রেরণা বোধ করে থাকেন, নতুবা তাঁদের লেখনীমুখে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হতে পারত না। মোটকথা, আচার-নিরপেক্ষ উদার পবিত্র ধর্মবিশ্বাসের বলেই শরৎচন্দ্র ধর্ম ও জীবনবোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা সত্য ও সুন্দরের জন্য আকুতির সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। এই ধর্মচেতনা বহিরঙ্গ আচার-অনুষ্ঠান নিরপেক্ষভাবেই অন্তরের মহিমাব্যঞ্জক। শরৎ-সাহিত্যে লেখকের ধর্মবোধ একদিকে যেমন অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের অস্বীকৃতিমূলক চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যদিকে আবার ইহা উজ্জ্বলভাবেই নিষ্ঠা ও সত্যাদর্শের মহিমান্বিত চরিত্রে আনুষ্ঠানিক

আচার-আচরণের ছবিতেও ফুটিয়াছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসেই এই দুই বিপরীত প্রান্তীয় ধর্মচেতনার দৃষ্টান্ত আছে অভয়া ও অন্নদাদিদির চরিত্রে।'[১]

শরৎচন্দ্র যে যুগের লেখক তাকে নবযুগ বলা হয়। এই যুগে জগৎ ও জীবনের নূতন মূল্যায়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। এই নবযুগের তরঙ্গ বিলম্বে হলেও এদেশে এসেছে। মানুষের অস্তিত্ব স্বীকৃতিই শুধু নয়, সেই সঙ্গে তার মূল্য নির্ণয়ে অধিকার স্বীকৃতিটাও নবযুগের চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই নবচেতনা উপন্যাসের প্রাণ। শরৎ-সাহিত্য আগাগোড়া এই চেতনায় সমৃদ্ধ। পুরাতন মূল্যবোধের নব মূল্যায়ন—এটাই ছিল সমাজের সামনে বড় কথা। শরৎচন্দ্র মানুষের মহৎ সম্ভাবনায় আস্থাবান ছিলেন বলেই তিনি আপাত-হীনের মধ্যে ছোট-বড় সদ্‌গুণ আবিষ্কার করে মানুষকে আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন। তাঁকে সমাজদ্রোহী লেখক বলা হয়েছে কারণ তাঁর গল্প-উপন্যাসে তথাকথিত মন্দ চরিত্রের মানুষের ভিড়ই বেশি। কিন্তু তাঁর ধর্ম-চেতনায় তিনি গোটা মানুষটিকে ভালমন্দে মিশিয়ে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, তাঁর ধর্মচেতনায় নৈতিকতার ও মানবতাবোধের স্থান আচার-সংস্কারের অনেক উপরে। আরো বুঝতে হবে যে, সত্য ও সুন্দর এবং ন্যায় ও মানবতামণ্ডিত ধর্মচেতনাই শরৎ-সাহিত্যকে একটা স্বতন্ত্র মূল্য প্রদান করেছে। এবং এই কারণেই তিনি বাঙালীর এমন প্রিয় ঔপন্যাসিক হতে পেরেছিলেন। সংস্কারের উপরে তিনি জীবনকে স্থান দিয়েছিলেন বলেই না তিনি জীবনধর্মী লেখক হিসাবে সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই। সেই সমাদর ও স্বীকৃতি চিরকালই অম্লান থাকবে।

১. শরৎ-রচনা : বন্দ্যোপাধ্যায়

এইবার শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার কথা।

ইতিপূর্বে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই বিষয়ে কিছু উল্লিখিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে তাঁর স্বজাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন, শরৎচন্দ্রকেও আমরা ঠিক সেইভাবে এবং একটু বেশি করেই পেয়েছি। দেশবন্ধুর আহ্বানেই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন, কিন্তু এর সমস্ত কার্যসূচীর সঙ্গে তিনি যে একমত ছিলেন তা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গান্ধীর খিলাফৎ আন্দোলনের কথা উল্লেখ্য। তাঁর মন এতে একেবারেই সায় দেয় নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। এটি তিনি পরবর্তী কালে লিখেছিলেন ঃ

'অহিংস অসহযোগের যুগে এদেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাই ই। এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি।··· তারপরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই-হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার তো হিসাবই নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট।[১] অথচ এত বড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিকক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়, কারণ কল্যাণের হউক, অকল্যাণের হউক, সময়মত একটা ছাড়রফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাংলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়তো একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে

১ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে লেখকের 'দেশবন্ধু' গ্রন্থে

অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই—এ কোন্ কথা? যে দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ পরাধীন মুসলিম-সমাজ আব্দার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় কর। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ গভর্ণনেণ্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ আন্দোলন সেই খলিফাকেই তুর্কীরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল।...এত বড় তামাশার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে।'

শরৎচন্দ্রের এই স্পষ্ট ভাষণে সেদিন অনেকেই খুশি হতে পারেন নি। কিন্তু কি সাহিত্যকর্মে, কি রাজনৈতিক কর্মে অন্যের মন যোগাইয়া চলা বা বলার মত মানুষই তিনি ছিলেন না। দেশের সমকালীন রাজনৈতিক মত ও পথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র কিরূপ অভিমত পোষণ করতেন তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে ১৯২৯ সালে রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত তাঁর সেই বিখ্যাত বক্তৃতায় যেটি পরবর্তীকালে 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। তাঁর এই ভাষণটিকে আমরা শরৎচন্দ্রের 'পলিটিক্যাল উইল এ্যাণ্ড টেস্টামেণ্ট' বলতে পারি। সেদিন 'রেভোলিউসন' বা বিপ্লব কথাটি লোকের মুখে মুখে ফিরতো কিন্তু এর প্রকৃত তত্ত্বটা কেউ বড় একটা উপলব্ধি করতে পারে নি। তাইতো শরৎচন্দ্রকে বলতে হলো:

'ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়—সে বিপ্লব। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলো না যে, কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্য বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফল লাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এই আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্য তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়।'[১]

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের এই অভিমত বাংলার তৎকালীন বিপ্লব-পন্থীরা প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। কথিত আছে, এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিপিন মামাকে (প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী) একবার বলেছিলেন, 'ফরাসী বা রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে তোমরা যদি বিপ্লবের পাঠ গ্রহণ করে থাক তাহলে ভুল করেছ বলব। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস তো আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-কলহের ইতিহাস। এই অভিশাপ থেকে এই হতভাগ্য জাতি যতদিন না মুক্ত হতে পারছে, আমার মনে হয়, ততদিন তোমাদের এই বিপ্লব-প্রয়াস প্রয়াসমাত্র হবে, তার বেশি কিছু হবে না, হতে পারে না।'

গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস যখন ব্রিটিশ-পণ্য বর্জনের সংকল্প গ্রহণ করল, তখনো শরৎচন্দ্র বাংলার তরুণদের বলেছিলেন: 'এই সংঘর্ষে তোমরা সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করো। কিন্তু অন্ধের মতো নয়; মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়; কংগ্রেস সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করে বেড়ালেও নয়। ভারতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে আশি কোটি টাকার অভাব পূর্ণ করা যায় না। কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না। এবং গেলেও তাতে

১. তরুণের বিদ্রোহ: শরৎচন্দ্র।

মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।' এর দ্বারা তিনি এই কথাটাই আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বিবাদটা যেখানে প্রকৃত রাজনৈতিক সেখানে এর অর্থনৈতিক দিকটার ওপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। রাজনীতিজ্ঞ বলতে সাধারণতঃ ঠিক যা বোঝায় শরৎচন্দ্র সেই শ্রেণীর পলিটিসিয়ান ছিলেন না, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চেতনা শুধু প্রখর নয়, নির্ভেজাল ছিল বলা চলে। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে এই চেতনার প্রতিফলন কতখানি ঘটেছিল এইবার আমরা সেই বিষয়টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

শরৎ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার প্রকাশই বড় কথা।

কিন্তু আমরা দেখেছি তিনি একজন রাজনৈতিক কর্মীও ছিলেন।

দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতি তিনি যখন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন তখন অন্তরের রাজনৈতিক চেতনার তাগিদে তাঁকে তাঁর আপন শিল্পীসত্তার কিছুটা সংকোচন ঘটাতে হয়েছিল। তাঁর সামাজিক গল্প-উপন্যাস অপেক্ষা প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের মাধ্যমেই শরৎচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করতেন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা তাঁর গল্প-উপন্যাসে খুব বেশি অভিব্যক্ত না হলেও যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে লেখকের গভীর নিষ্ঠা ও হৃদয়াবেগ দুই-ই আভাসিত হয়েছে। যেসব সামাজিক সমস্যাকে ভিত্তি করে তিনি তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন, শরৎচন্দ্র বিশেষভাবেই জানতেন যে ঐসব সমস্যার অধিকাংশই পরাধীনতার অভিশাপ থেকে উদ্ভূত। তাঁব রচনার মধ্যে শ্রেণীবিদ্বেষের যে পরিচয় পাই সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত ছিল, কেতাবি বা কাল্পনিক ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন, বাংলার পল্লীতে তাঁর জন্ম। তাঁর সাহিত্যকর্মের সকল উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চল থেকে। এই গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে তিনি দেখেছেন ঘনিষ্ঠভাবে আর তাদের সঙ্গে মিশেছেন অকুণ্ঠভাবে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতিপর্বে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন যে, আমাদের দেশে সুবিধাভোগী সচ্ছল মানুষের চেয়ে দরিদ্র সাধারণ মানুষের হৃদয়

অনেক উদার আর সমাজের নিচের তলার মানুষ যেরকম মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে, উপরতলার মানুষ তা পারে না।

শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে ভালোয়-মন্দে মেশানো সাধারণ মানুষগুলির মধ্যে যে দৈন্য চোখে পড়ে তার জন্য দায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধিবিধান আর পরাধীনতার অভিশাপ। তাইতো তাঁর সহানুভূতির সবটাই তাদের প্রতি প্রসারিত হয়েছিল, ধনীশ্রেণীর প্রতি নয়। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'সমাজের উপরতলার মানুষ সুবিধা ভোগ করিতে করিতে অশেষ স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে, লোভে তাহারা আপন মহৎ বৃত্তিগুলি প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের হীনবৃত্তি অপেক্ষাকৃত কম, লোভের বা স্বার্থপরতার উত্তাপে তাহাদের অন্তর শুকাইয়া যায় নাই। শরৎচন্দ্রের এইরূপ প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, পরিবেশ আনুকূল্য করিলে অথবা সুযোগ-সুবিধা পাইলে এই তলার শ্রেণীর অনেকেই জীবনবোধের প্রতিযোগিতায় উচ্চশ্রেণীর মানুষদের অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এই সহানুভূতির সহিত রাজনৈতিক চেতনার বিশেষ যোগ আছে, কারণ অসম ধনবণ্টনের ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অসাম্যের ফলে মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর ভাগ্যবানের বিপরীতে যে অসংখ্য তলার শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের বড় হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই প্রত্যয় সমাজতান্ত্রিক ধারণার সহিত এক হিসাবে সংযুক্ত। শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাঁহার রচনায় হামেশা মিলে।'[১]

শুধু শ্রেণীবিদ্বেষের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশবন্ধু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী হিসাবে তিনি সর্বস্ব বিনিময়ে ভারতের-স্বাধীনতা কামনা করতেন। কিন্তু তিনি এইখানেই থামেন নি। স্বদেশের মানুষ যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে পরস্পর সমান বোধ করে, অন্যায় শোষণ যাতে বন্ধ হয় সেজন্য

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের লেখনী বলিষ্ঠভাবে দাবী জানিয়েছে। তাইতো আমরা দেখতে পাই যে, বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে এবং শোষণকারী ও অধিকারলিপ্সুর সঙ্গে যুগপৎ সংগ্রাম চালাবার একটা সুতীব্র আগ্রহ শরৎ-সাহিত্যের অনেকস্থলেই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনিই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি 'সোজাসুজি ভারতের পরাধীনতার কারণ ইংরেজ রাজশক্তিকে ঘৃণা করিয়াছেন এবং এই শোষণকারী শাসন-শক্তির পিছনে যাহারা সেই ইংরেজ জাতিকে নিন্দা করিয়াছেন।' শুধু তাই নয়। ইংরেজের পদলেহনকারী ভারতীয়দের তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। অমৃতসরের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের দেওয়া মানের মুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলে শরৎচন্দ্র যেমন গর্ববোধ করেছিলেন তেমনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'স্যার' উপাধি বর্জন না করায় দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, চাঁদে কলঙ্ক রয়ে গেল।

দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল শরৎচন্দ্রের হৃদয়।
ইংরেজ-বিদ্বেষের আগুনে পরিশুদ্ধ ছিল সেই দেশপ্রেম।
সেখানে কাপুরুষতা বা নির্বীর্যতার কোন স্থান ছিল না।
ভারতে ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরে ছিল তীব্র ঘৃণা।

সেই ঘৃণা দেশের জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করবার রাজনৈতিক চেতনা তাঁর কি রকম ছিল শরৎ-সাহিত্যে তার বহু নিদর্শন আছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে যারাই নির্ভীক চিত্তে অংশ গ্রহণ করতেন, তাদের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে না পারলেও, শরৎচন্দ্র তাদের আরব্ধ মহৎ প্রয়াসে সর্বদা সহানুভূতি দেখাতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে তাঁর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর মনের জ্বালা তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে। অন্যত্র আমরা এই উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব, এখানে শুধু এই কথাটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাংলা সাহিত্যে এই একটিমাত্র উপন্যাস যার মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়েছে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর প্রচণ্ড ক্ষোভের গৈরিক প্রবাহ।

কিন্তু এটা তো রাজনৈতিক উপন্যাস, তাঁর হৃদয়প্রধান উপন্যাসেও তিনি আপন রাজনৈতিক ক্ষোভের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে এর দৃষ্টান্ত মিলবে। অন্ধকারে বসে সাধু বজ্রানন্দ বাংলার পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য ও রিক্ততার কথা বলছিল। শ্রোতা শ্রীকান্ত। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তর মাধ্যমে বিদেশী রাজশক্তি শোষিত গ্রাম-বাংলার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

'অনুচরদিগের মধ্যে কে জাগিয়া আর কে নাই জানা গেল না, সবাই শীতবস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নীরব। কেবল একা সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গ লইয়াছে এবং এই পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে তাহারই মুখ দিয়া কেবল দেশের অজ্ঞাত ভাই-ভগিনীর অসহ্য বেদনার ইতিহাস যেন ঝলকে ঝলকে বাহিরে আসিতেছে। এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমগ্র সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা-রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।'[১]

এর কিছু পরেই আছে শ্রীকান্তের কাছে দুইজন গ্রামবাসীর এই মন্তব্য ঃ 'কোম্পানী বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সেই চোর না হয়ে পারবে না।···দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও এক ফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়।···ম্যালেরিয়া, কলেরা, হর-রকমের ব্যাধিপীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে।'

শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেমের সুতীব্র অনুভূতি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সরল প্রাণ গ্রামবাসীদের মনের বেদনা শ্রীকান্তর মনে কি রকম

১. শ্রীকান্ত, ৩য় পর্ব ঃ শরৎচন্দ্র।

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল তা অভিব্যক্ত হয়েছে তার এই কথাগুলির মধ্যে: 'আলোচনা করিবার মত গলার জোর ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সায় দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই, এই, এই, কেবলমাত্র এইজন্যই তেত্রিশ কোটি নর-নারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীর শাসনযন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সংকীর্ণ ও বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য তো কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার যো নাই।'

সমালোচকদের মতে হয়তো শ্রীকান্তর মুখ দিয়া এই কথাগুলি কলাশিল্পের দিক দিয়া উপন্যাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে তথাপি এরই মধ্যে আমরা সেই দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রকে পাই যিনি দেশের দুর্গতির কথা বলেছেন এবং এই দুর্গতির স্রষ্টা বিদেশী শাসককে নির্ভীকভাবে নিন্দা করেছেন। তাঁর লেখনী এইভাবেই সার্থক হয়েছে। 'ভাব-প্রবণ হৃদয়বান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যে আবেগ লইয়া সমাজের শোষণের প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই আবেগ লইয়াই তিনি অন্যায়ের জন্য ধনী, মালিক, জমিদার, সর্বোপরি সরকারকে ধিক্কার জানাইয়াছেন, অত্যাচারী শোষকের মুখোশ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।' সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হবে না যে, তাঁর গল্প-উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই আপন রাজনৈতিক চেতনা অবাধে প্রকাশ করে গিয়েছেন, আর্টের কথা চিন্তা করেন নি। 'পথের দাবী' ব্যতীত, তাঁর শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, বিপ্রদাস প্রভৃতি রচনায় শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম তথা রাজনৈতিক চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁকে 'কালের যাত্রা'

নাটিকাটি উৎসর্গ করে। উৎসর্গলিপির একাংশে এই কথাগুলি আছে : 'সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল বিশেষভাবে যাদের পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদের আহ্বান করেছেন রথের বাহন-রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে। কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক।'[১]

যাঁরাই মনোযোগের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্য পাঠ করেছেন, অনুশীলন করেছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, 'বাস্তবিক এই মহাকালের অচল রথকে সচল করিবার জন্য শরৎচন্দ্র জীবনব্যাপী লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাঁহার ভুলভ্রান্তি, শিক্ষার সীমা প্রভৃতির জন্য দোষ-ত্রুটি বাদ দিলে সাধারণ অবজ্ঞাত সমাজের সংখ্যাগুরু মানুষকে বড় করিয়া তুলিবার আন্তরিক আগ্রহ, তাহাদের দুঃখে অকৃত্রিম সমবেদনা ও সেই দুঃখ ঘুচাইবার আকাঙ্ক্ষা শরৎ-সাহিত্যে বহুস্থানেই দেখা যায়।' যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার মূল কথাটি কি?—তাহলে তার উত্তরে বলতে হয়ঃ মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। আবার এই বাণীই তো ঝঙ্কৃত হয়েছে তাঁর গল্পে, উপন্যাসে ও অন্যান্য রচনায়।

নারীসত্তার বিকাশের কথাও তাঁর রাজনৈতিক চেতনার পরিমণ্ডলে স্থান পেয়েছে। বাঙালী সমাজে মেয়েদের অপরিসীম দুর্গতি শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। পুরুষ-প্রাধান্য শাসিত সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের দুরবস্থা তাঁকে যেভাবে অস্থির করে তুলেছিল বোধ হয় আর কোন কথা-সাহিত্যিককে ততটা করে নি। অন্তঃপুরের প্রাচীরান্তরালে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে মেয়েরা

১৯৩২ সালে শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটিকাখানি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন।

কী অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো, সে কথা শরৎচন্দ্র তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। মানব-দরদী এই সাহিত্যিকের কণ্ঠে আমরা তাই প্রথম শুনলাম, মেয়েরা আগে মানুষ তারপর মেয়েমানুষ। সমাজের বৃহৎ অংশ নারী, অথচ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তার বিপরীত বিধিবিধান দেখে তিনি গভীর ব্যথাবোধ করতেন। এই অনুভূতি তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল স্পর্শনক্ষম একটা বাস্তব সচেতনতা। যেকালে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু, সেকালে পুরাতন মূল্যবোধ নূতনভাবে নির্ধারিত হচ্ছিল, তাই শরৎচন্দ্র সমাজে অবহেলিত অসম্মানিত নারীকে তাঁর গল্প-উপন্যাসে মহিমাদীপ্ত করে প্রকাশ করলেন। নারীর উন্নতি কেবলমাত্র নারীসমাজের নয়, দেশের উন্নতি আর নারীর অনুন্নতি দেশের অবনতি—এই প্রত্যয়ে শরৎচন্দ্র অটল ছিলেন। নারীর কল্যাণ চিন্তাই তো তাঁকে 'নারীর মূল্য' লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

'মোটকথা, শরৎচন্দ্র শক্তিমান, বিত্তশালী শোষকদের ঘৃণা করিয়া বিপরীতে অসহায় দরিদ্র শোষিতদের ভালবাসিতেন। অন্যায় সুযোগ-লব্ধ ক্ষমতা শোষনকার্যে সহায়তা করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সকল মানুষ জন্মগত অধিকারে সমান—এই নীতিবাক্যে শরৎচন্দ্রের প্রত্যয় ছিল, তাই সকলকে মানুষের মত বাঁচিবার সমান সুযোগ দিতে তিনি সব সময়ই উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যে শোষিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দুঃখ যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন করিয়া মেয়েদের, এমন কি পদস্খলিতা পতিতা মেয়েদের দুঃখ দেখাইয়াছেন, তেমনি করিয়া আবার শোষিত-নিপীড়িতদের মহৎ হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিয়া তাহাদের হীনমন্যতা দূর করিতে এবং জনমানসে তাহাদের সম্পর্কে হীন ধারণার পরিবর্তে তাহাদের মহৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশার ভাব জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।'[১]

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ কুড়ি ॥

শরৎ-প্রতিভা যেন সাতরঙা রামধনু। তারই প্রতিবিম্বন আছে তাঁর শিল্প-চেতনায়। কল্পনা নয়, হৃদয়ের অনুভূতি আর জীবনের অভিজ্ঞতাই শরৎচন্দ্রের শিল্প-চেতনার মূল কথা।

মনোরম-গল্প-সমন্বিত উপন্যাস-রচয়িতা হিসেবে তিনি যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার মূলে ছিল অভিজ্ঞতা—খাঁটি অভিজ্ঞতা। চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি যে অমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা এই অভিজ্ঞতার জন্যই তো সার্থক হয়েছে। বিষয়টি একটু বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা দরকার।

কবির কাব্য যেমন কবি-মানসের প্রতিচ্ছবি, উপন্যাস-সাহিত্যও তেমনি লেখক-মানসের ছবি। লেখক-চিত্তের পরিচয় তাঁর সৃষ্টির পরিচয়কে নিবিড়তর করে তোলে। শরৎচন্দ্রের এই মানস, তাঁর চিত্তের বিকাশ ও পরিণতি বিশ্লেষণের মধ্যেই তাঁর সৃষ্টির সহজ পরিচয় রয়ে গেছে। তাই প্রথমে আমরা তাঁর এই চিত্তবৃত্তিকে বুঝতে চেষ্টা করব।

শরৎচন্দ্রকে বলা হয় বাস্তববাদী লেখক।

সাহিত্যে বাস্তববাদ কাকে বলে?

সমসাময়িক মানবজীবনের জটিলতা, ব্যক্তি-সংঘাতের কথা যদি সম্ভাব্য চরিত্র ও মনোবিকলনের ভিতর দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা যদি মানুষের চিরন্তন জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি করে থাকে তবে তাকে বাস্তব-সাহিত্য বলা যেতে পারে। এই অর্থে শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের জোলা প্রমুখ লেখকগণ যে অর্থে বাস্তববাদী সে অর্থে শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী নন। তাঁর মধ্যে উনিশ শতকের সাহিত্যের ভাবধারাই প্রকট, বিশের বুদ্ধি-ভিত্তিক সাহিত্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্থান পায় নি। অবশ্য 'শেষ প্রশ্ন' এর ব্যতিক্রম। উনিশ শতকের লেখকগণ সাধারণতঃ তাঁদের

পরিচিত চরিত্রকেই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। টুর্গেনিভ স্বীকার করতেন যে বাস্তবে একটা চরিত্র না পেলে স্বাভাবিক চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্রও বলতেন, তাঁর চরিত্রগুলির শতকরা নব্বুই ভাগ সত্য। তাই দেখি শরৎ-সাহিত্যে তাঁর বাস্তবজীবনে পরিচিত ব্যক্তিই উপন্যাস-চরিত্রে পরিণত হয়েছে। সেই কারণেই কতকগুলি চরিত্র পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে, মন তাকে সহজেই গ্রহণ করে।

কিন্তু কেন গ্রহণ করে?

এই প্রশ্নের উত্তরেই প্রথমে মনে আসে লেখকের চিত্তবৃত্তি তথা প্রবণতার কথা। লেখক তাঁর জীবন-সংগ্রামের মধ্যেই এই চিত্তবৃত্তিকে আবিষ্কার করেন ও চরিত্র সৃষ্টি করেন। লেখককে যেমন, পাঠককেও তেমনি উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে হয়। শুধু বাইরে থেকে দেখা চরিত্র সজীব হয় না, যদি না লেখক নিজে তার সঙ্গে একীভূত হন।

শরৎচন্দ্রের মন বাস্তববাদী, সমসাময়িক যুগধর্মের পরিবর্তন-শীলতার প্রতি আস্থা সত্ত্বেও তিনি হিন্দু-সংস্কার-সৃষ্ট বাধাকে অতিক্রম করতে পারেন নি, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও তাঁর ব্যক্তিত্বেও বিরোধ বেঁধেছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। যে সমাজ ও সংসার তাঁর জীবনের সবকিছু হরণ করে তাঁকে একরকম ছন্নছাড়া করে রেঙ্গুনে পাঠিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে এবং জীবনে তিনি হয়ে উঠলেন উচ্ছৃঙ্খল। অভিমানে ও ব্যর্থতার বেদনায় চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে জীবনকে নিঃশেষ করে দেওয়াই যেন প্রয়োজন হয়ে উঠল। কিন্তু রেঙ্গুনে তাঁর বিদ্রোহী অন্তর দেখল, সমাজহীন মুক্ত নরনারীকে, তাদের জীবনের গভীর দুঃখকে। সেই তাদের জীবনের দুঃখ ও গভীর আত্মাহুতি তাঁর দরদী হৃদয়কে বেদনার্ত করে দিল—যদিও তাদের জীবনকে তিনি কাম্য বলে মনে করতে পারেন নি।

এই প্রবাস জীবনের সময় শরৎচন্দ্র প্রচুর পড়াশুনার অবসর পেয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি হার্বার্ট স্পেন্সার পড়েছেন। পড়েছেন টলস্টয়, জোলা, ডিকেন্স প্রভৃতি বিদেশী রিয়ালিষ্টিক লেখকদের বই। পড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি। রবীন্দ্রনাথের লেখা তিনি যত্নের সঙ্গেই পড়েছেন। 'চোখের বালি'র চরিত্র ও মনোবিশ্লেষণ তাঁকে নূতন আলো দিয়েছিল। ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরে তখনই তিনি হার্বাট স্পেন্সারের দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। মানুষের নীতিবোধ জগতে বিবর্তিত হয়েছে—স্পেন্সারের এই সিদ্ধান্ত শরৎচন্দ্র গ্রহণ করে বলেছেন : 'কালের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মও বদলায়। স্পেন্সারের নীতিবাদের মূলভিত্তি হিতবাদ এবং তাঁর দর্শনে মানবচরিত্রে হৃদয়ের বিস্তৃতিই যথার্থ সৎ জীবনাচরণ বলে বর্ণিত হয়েছে।' শরৎচন্দ্রও তাই বিশ্বাস করতেন। হৃদয়ের বিস্তৃতিই তাঁর নীতিবাদের মূল ভিত্তি।

সমাজ ও সংস্কারের শৃঙ্খল যে মানব-হৃদয়কে সঙ্কুচিত করেছে, তারই বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ। দরদী স্রষ্টার হৃদয় দুঃখে ও বেদনায় মথিত হয়েছে এই সংকীর্ণতার জন্য—যেহেতু এমনি একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা তাঁর সমস্ত জীবনকে উদ্বেলিত, হৃদয়কে বঞ্চিত করে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ব্যক্তি-মন ও ব্যক্তি-হৃদয়ের বিচার যদি হৃদয় দিয়ে না হয়, তাকে যদি জগতের নীতি ও সমাজ-সংস্কার দিয়ে বিচার করা হয়, তবে সে বিচার সত্য নয়—তাঁর সংগ্রাম এই অসত্যের বিরুদ্ধে, জীবনের ও ব্যক্তির অসত্য মূল্যায়নের বিরুদ্ধে।

শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্য ও জীবন যেন একাত্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি অনেকটা টলস্টয়ের সগোত্র ছিলেন—টলস্টয়ের আর্টের সংজ্ঞার সঙ্গে তাঁর শিল্পকলার একটা হৃদয়গত ঐক্য দেখা যায়। মানুষের ভেতরটাকেই তিনি বড় করে দেখতেন; বলতেন, মানুষের ভিতরের বস্তুটিকে বিচার কর। এই নীতিবাদই হলো শরৎ-

সাহিত্যে মূলতত্ত্ব, আবার এটাই তাঁর অনুপম শিল্পচেতনার প্রধান ভিত্তিস্বরূপ বলা যায়। এই নৈতিক তত্ত্ব ও এই হৃদয়ধর্ম তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। তাইতো তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন স্পেন্সারের প্রতি। ভাগলপুরে থাকতে যে ছন্নছাড়া জীবনযাপন করেছেন, রেঙ্গুনে যে উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতাচারের জীবন-যাপন করেছেন তারই কলঙ্ক তাঁর সামাজিক জীবনে সত্য হয়েছিল কিন্তু সমাজের অব্যবস্থাজনিত যে মর্মবেদনায় তাঁর জীবন এই খাতে বয়েছিল তা কেউ দেখল না, তাঁর হৃদয়ের অপরিসীম প্রেমকে কেউ মর্যাদা দিল না—যে প্রেম পথের একটি সামান্য কুকুরের জন্যও তিনি বোধ করতেন।

শরৎচন্দ্রের শিল্প-চেতনা এই প্রেমে উজ্জ্বল ছিল।

তাঁর তুই চক্ষে মাখানো ছিল এই প্রেমেরই অঞ্জন।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—ভারতের এই চিরন্তন আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। যা সুন্দর তা সত্য ও কল্যাণময়, এ বিশ্বাসকে তিনি ভুলতে পারেন নি। যা মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনে, তা যে সত্য নয় এবং সুন্দরও নয়—এই বিশ্বাসই তাঁকে করে তুলেছিল সংরক্ষণশীল।

শিল্পী শরৎচন্দ্রের মধ্যে তাঁর সাহিত্যকর্মের তুই পর্বে তুরকম মন কাজ করেছে। প্রথমটিকে আমরা দেখতে পাই প্রাক্-শ্রীকান্ত পর্বে রচিত গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্যে, আর দ্বিতীয়টি দেখি শ্রীকান্ত-পরবর্তী সৃষ্টির মধ্যে। এই পর্বেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা এলো। তখন তিনি বাজেশিবপুরে বসতি স্থাপন করলেন। হিরণ্ময়ী দেবীকে নিয়ে তিনি সংসারী হলেন। তখন তিনি বিগত যৌবন। এই বয়সে মানুষের ভাবপ্রবণতা স্তিমিত হয়ে আসে এবং যুক্তি বাড়তে শুরু করে। এই সময়ে তাঁর বেশির ভাগ সৃষ্টি পাঠকসমাজের সামনে উপস্থিত হয়। তখনকার সেই মন তাঁর অতীত জীবনেরই দান—অভিজ্ঞতাপুষ্ট বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মন। সেই মন নিয়ে তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন, সেই দেখার মধ্যে অপূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু অযোগ্যতা

নেই ; এই দেখা সামগ্রিক না হতে পারে কিন্তু আংশিকভাবে তা সত্য এবং সুন্দর।

তাঁর শিল্প-চেতনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। শরৎচন্দ্রের সত্তা তথা অন্তর, জীবনে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ পেয়েছে, তাঁর অন্তরাত্মা বেদনায় হাহাকার করেছে। পৃথিবী দেয় নি তাঁকে তাঁর কাম্য জিনিস, মানুষ দেয় নি প্রীতি, সমাজ দেয় নি স্বীকৃতি, প্রেম দেয় নি প্রতিদান—তাঁর অন্তর, আমরা অনুমান করতে পারি, ক্রন্দন করেছে নিরন্তর না-পাওয়ার দুঃখে। এই দুঃখমথিত অন্তর নিয়ে তিনি দেখেছেন—এই পৃথিবীতে, এই সংসারে মানব-হৃদয় নিয়ত তাঁর অন্তরের মতই হাহাকার করছে।

সমগ্র শরৎ-সাহিত্য বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে মানবাত্মার চিরন্তন এই দুঃখকে অনুভব করেছে, প্রকাশ করেছে, প্রাণময় করেছে। মনে রাখতে হবে শরৎচন্দ্র এক সংঘাত-মুখর যুগের শিল্পী। এই সংঘাত-জনিত দুঃখময় তাঁর জীবন, দুঃখের হলাহল তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন। এই সংঘাতই রূপায়িত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে, তাঁর সৃষ্টিতে। এই সংঘাতই তো এক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে তাঁর সমগ্র শিল্প-চেতনাকে।

'ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ, তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে অপমান যেন না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা যেন এত বড় প্রশ্রয় না পায়।'[১]

এমন কথা যিনি বলতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ পর্যায়ের সাহিত্যিক নন এবং তাঁর শিল্প-চেতনাও সাধারণ স্তরের অনেক ঊর্ধ্বে

১. ৫৭তম জন্মদিনে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্রের ভাষণ

ছিল—এ কথা আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলতে পারি। এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তার থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে, শরৎচন্দ্র মানুষকে বিচার করেছেন তার হৃদয়ের মাপকাঠিতে। মানুষের হৃদয় যখন ব্যাপ্তিলাভ করে, উদার ও মহৎ হয়ে উঠেছে তখনই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছে।

আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। আজ বিংশ শতকের অন্তিম-লগ্নে শরৎ-সাহিত্যের সঠিক বিচার ও মূল্যায়ন বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো সম্ভব নয়। আজ সাহিত্য সম্পূর্ণ মস্তিষ্কধর্মী ও অচেতন মনবিশ্লেষণমূলক হয়ে উঠেছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষ আজ নিজের প্রতিই বিশ্বাস হারিয়েছে এবং জীবনপ্রত্যয় ও আদর্শ আজ দিশেহারা। এক কথায় মানুষের জীবন আজ অন্তর ও আত্মার একটা সংকটময় যুগে এসে পৌঁছেছে। তাই বর্তমান যুগের ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে হৃদয়ধর্মী শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন কিছুটা দুরূহ।

আজ সাহিত্যকে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই বহু সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সাহিত্য-সমালোচনাকে জটিল করে তুলেছে। তবে একটি সত্যকে মানতেই হবে—প্রতিটি যুগে যুগের বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাহিত্য বিভিন্নধর্মী হয়েছে, বিভিন্ন পথে রূপায়িত হয়েছে,—শিল্পীর সৃষ্টি কিন্তু কোন যুগেই এই সংজ্ঞা বা ব্যাকরণসূত্রকে মেনে চলে নি, যদি চলত তবে সে সৃষ্টি ব্যর্থ হতো। মূলতঃ মানবাত্মার এই সংঘাতজনিত বেদনার সুন্দর প্রকাশই সাহিত্য। সত্যকার শিল্পসৃষ্টির আসল রহস্য তো এইখানেই। শরৎচন্দ্র এই রহস্যবেত্তা ছিলেন।

শরৎ-সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ, ব্যক্তি-সংঘাত, মানব-হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার করুণ বেদনাময় মুক্তি-সংগ্রামের রঙে ও রসে প্রত্যক্ষ সুন্দর। এই প্রত্যক্ষ সুন্দর মানবচিত্তলোক মানবচিত্তকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে বলেই শরৎ-সাহিত্য চিরন্তনী সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী—টলস্টয়ের সাহিত্যের মতো কল্যাণকামী। হৃদয় ও মস্তিষ্কের কোন্‌টি বড়, কোন্ সৃষ্টির মূল্য কতটুকু তার উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ যুগ। আমাদের মনোজগতের ও জীবন-প্রত্যয়ের

পরিবর্তনকে স্মরণ রেখেই এই যুগ-প্রকাশক সাহিত্যিকের শিল্প-চেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে।

'যা নিজে বোঝ না তা পরকে বোঝাবার মিথ্যা চেষ্টা কোরো না। যাকে চেন না, তার যা তা পরিচয় পরের কাছে দিও না।'

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে গল্পকার-যশোলিপ্সু দিবাকরের প্রতি কিরণময়ীর এই উক্তি শরৎচন্দ্রেরই কথা, আর এই কথাটি অবলম্বন করেই শরৎ-চেতনার মর্ম উদ্ঘাটনে আমরা প্রবৃত্ত হব। 'শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে, পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব লইয়াই তিনি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাহিত্য রচনায় শরৎচন্দ্র পূর্ব-সূরীদের স্বীকৃত বা পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণা আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহেন নাই, তিনি চলমান জগৎ ও জীবনের প্রতি খোলা চোখে তাকাইয়া বাস্তব-জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যকৃতির মৌল গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন।'[১] এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

'Character is the man'.

ব্যক্তি-মানুষের চরিত্রটাই সব। মানুষ সম্পর্কে এ-কথা যেমন সত্য, হৃদয়ধর্মী সাহিত্য সম্পর্কেও তা আরো সত্য। সকল মহৎ সাহিত্যকর্মের প্রধান সম্পদ চরিত্র। শরৎ-সাহিত্য পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন সে চরিত্র শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির সম্পদ। এ বিষয়ে তাঁর নিজেরও সুস্পষ্ট মত ছিল যে, চরিত্র সৃষ্টিই উপন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চরিত্রসৃষ্টি সাহিত্যের একটি নিত্য প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক কৃতিত্ব চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর গল্প বা উপন্যাসে রূপের বর্ণনা, স্বভাবের বর্ণনা প্রায় নেই। তিনি সব সময়েই দৃষ্টি রেখেছেন আসল বস্তুর ওপর অর্থাৎ মানুষের ভেতরটায়। মানুষের

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভেতর বলতে তার চরিত্রকেই বোঝায়। আর সেইটা উপলব্ধি করার জন্য প্রথম যৌবনে তাঁকে বহু ও বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে। তাঁর চরিত্রগুলি তাই কল্পনার সামগ্রী হয়ে ওঠেনি—হয়ে উঠেছে সত্য ও জীবন্ত। তিনি জানতেন সত্যের ওপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। তাইতো তিনি বলেছেন: 'বনেদ নিরেট হলে আর ভয় নেই। আমি যে চরিত্র দেখেছি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার যে পরিণতি দেখেছি তাই লিখেছি। তাই আমার ভয়ের কারণ নেই। লোকে সেগুলোকে অস্বাভাবিক বললেও মানব না। এই রকম করে আমার সাহিত্যজীবন গড়ে উঠছে।'

সাহিত্য নিয়ে শরৎচন্দ্র কোনদিন ছেলেখেলা করেন নি।

তাঁর নিজের জীবনে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা সত্যি হয়ে উঠেছিল, তাকেই তিনি তাঁর ঐন্দ্রজালিক লেখনীমুখে সাহিত্যবস্তুতে পরিণত করেছেন। লোকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা মিলেছিল বলেই না লোকে তাঁকে ভালবাসল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের আর একটি কথা। একবার এক সাহিত্য-সভায় তিনি বলেছিলেন: 'আমি মানুষের ভেতরটা বরাবর দেখি। এ বললে, সে বললে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নেওয়া—এ আমার কোনদিন ছিল না। সত্যিকারের জীবন দেখতে গেলে শুচিবাইগ্রস্ত হলে চলবে না। যে অভিজ্ঞতার ফলে টলস্টয়, গোর্কি, শেক্‌সপীয়র পর্যন্ত অতি শুচিবাইগ্রস্ত হতে পারেন নি। তাঁদের শুচিবাই ছিল না। Concrete রচনা করতে গেলে কল্পনা চলে না। নিজের অভিজ্ঞতা চাই।'

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সৃষ্টি।

কিন্তু চরিত্রকে গড়ে তুলতে হয়।

মাল-মসলা হলেই ইমারত তৈরী হয় না; স্থপতির গঠন-কৌশল ভিন্ন সুদৃশ্য ইমারত নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তেমনি একটি চরিত্রকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গড়ে তুলতে হলে নিখুঁত গঠনরীতি বা

কৌশল প্রয়োজন। যে লেখক এই কৌশল যতখানি আয়ত্ত করতে পারেন, চরিত্র-স্রষ্টারূপে তিনি ততখানি সার্থকতা লাভ করেন। বলা বাহুল্য, গঠন-কৌশলে শরৎচন্দ্র বিশেষভাবেই পারঙ্গম ছিলেন। একটি সার্থক উপন্যাসের মধ্যে দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা—গল্প বা Plot ও চরিত্র। এই দুটির মধ্যে চরিত্রসৃষ্টিই প্রধান। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিলেও আখ্যানভাগের গুরুত্ব বড় কম নয়। মানব-মনের নিগূঢ় রহস্য কাহিনীর মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যে তাই থাকে এই দুইটি উপাদানের সার্থক সমন্বয়। শরৎ-সাহিত্যে চরিত্র মুখ্য, কাহিনী গৌণ। তাঁর প্রধান লক্ষ্য চরিত্র-সৃষ্টি। প্লটকে তিনি চরিত্রসৃষ্টির বাহন হিসেবেই উদ্ভাবিত করেছেন। চরিত্রসৃষ্টির উপযোগী কাহিনী তাঁর প্রথম দিকের অপেক্ষাকৃত অপরিণত রচনার মধ্যে অনুপস্থিত বললেই হয়। আবার তাঁর কোন কোন উপন্যাসে কাহিনীর উপযোগী চরিত্র সৃষ্ট হয় নি। তাঁর 'দত্তা', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে চরিত্র ও কাহিনীর অপরূপ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টি বলতে যা বোঝায়, শরৎ-প্রতিভার প্রবণতা সেদিকে তেমন নয়; এর প্রবণতা জীবনের এক-একটি মুহূর্ত, এক-একটি ঘটনা সংস্থান—এই সবের অপরূপত্বের দিকেই। জীবনের খণ্ড মুহূর্তকে শরৎ-প্রতিভা জীবনের পরমাশ্চর্য শিল্পরূপ দান করতে সক্ষম হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির আর একটি লক্ষণীয় বিষয় তাঁর রচনা-রীতি বা ভঙ্গী, যাকে ইংরেজীতে style বলা হয়ে থাকে। 'শরৎচন্দ্রের ষ্টাইল বা রচনারীতির মাধুর্য সর্বত্র উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী বা ভাবেরশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও তাঁহার শব্দ-সম্পদ ও রচনা-সৌষ্ঠবকে শিরোধার্য করেন। ...তাঁহার ভাষা সংযত, শান্ত।...শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায় রমণীর রূপ বর্ণনায়। তাঁহার উপন্যাসের অধিকাংশ নায়িকা রূপসী। কিন্তু তিনি তাহাদের রূপের বর্ণনাকে দীর্ঘ করেন নাই। প্রথমতঃ দুই-একটি কথায় তাহাদের রূপের সহজ, সরল বর্ণনা

দিয়াছেন, পরে নানা অবস্থায় নানা লোকের উপর সেই রূপের প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন অন্নদাদিদিকে বর্ণনা করিয়াছেন দুইটি বাক্যে: 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।'[১]

তবে তাঁর রচনারীতির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় তাঁর ভাষা। সহজ মাধুর্যমণ্ডিত ভাষার প্রয়োগে শরৎচন্দ্র দক্ষ ছিলেন। 'শরৎচন্দ্রের গদ্যে প্রচলিত ভাষা প্রথম তাহার ন্যায্য আসন পাইয়াছে অথচ তাহার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র অতিক্রম করে নাই। তাঁহার ভাষা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভাষা। ··· শরৎচন্দ্রের ভাষা স্বচ্ছ, আড়ম্বরহীন, প্রাত্যহিক জীবনের রসে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রচলিত ভাষার সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা থাকিলেও তাহার লঘুতা ও তুচ্ছতা নাই।···প্রকৃতপক্ষে, শরৎচন্দ্রের স্টাইলের প্রধান গুণ এই যে এখানে তথাকথিত সাধুভাষা ও চলিত ভাষার সমন্বয় হইয়াছে; চলিত ভাষার স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এবং সাধুভাষার সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন।'[২]

শরৎচন্দ্রের ভাষা বা তাঁর বলবার ভঙ্গীর মধ্যে আমরা যে গড়ন, আগাগোড়া যে রস, যে লালিত্য দেখতে পাই, সেই ভাষা তিনি কোথায় পেলেন? তাঁর নিজের উক্তির মধ্যেই এর সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। চন্দননগরের আলাপ-সভায় এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: ভাষাটা আপনি আসে, আমার লেখার ধরনটা সাধারণ থেকে আলাদা। আমার ভাষাটা বোধ হয় সায়েন্সের বই পড়ার দরুন ঐ রকম হয়ে থাকবে। ভাষা আপনি আসে। যার আসে না, তার বড় মুস্কিল। আমি ভাষা ভাল জানি না—শব্দ-সম্পদের ঝুঁকি খুব কম—তবু লোকের ভালো লাগে কেন, জানি না। যা বোঝাতে চাই

১. শরৎচন্দ্র: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

২. তদেব।

তা মনে রাখি, তার জন্যে অনেক পরিশ্রম করি। লেখা অনেক ঘষা-মাজা করতে হয়।···আমার সঙ্গে মতের মিল না হতে পারে, কিন্তু কেউ বলবে না যে, আপনার লেখা পড়ে বুঝতে পারলাম না।'

ভাষা-শিল্পী বলতে যা বোঝায়, শরৎচন্দ্র ঠিক তা ছিলেন না। তিনি আবেগপ্রবণ লেখক ছিলেন এবং ভাষার দিক থেকে তাঁর আবেগ ক্বচিৎ বাহুল্যে পরিণত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ তাঁর শিল্পশক্তির পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের মতো বাগ্‌বৈদগ্ধপূর্ণ ভাষা শরৎচন্দ্রের রচনায় দেখা যায় না, অথবা কারুকার্যমণ্ডিত ভাষা তাঁর রচনায় বিরল। কিন্তু কে না জানে যে তাঁর ভাষা সরলতার সঙ্গে লাবণ্যমণ্ডিত ছিল এবং স্থানে স্থানে অলঙ্কার প্রয়োগে সেই ভাষা কি রকম হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে তা শরৎ-সাহিত্য পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। দুটি দৃষ্টান্ত দিই।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে ষোড়শীকে হৈম বলছেঃ 'আমার শ্বশুরকে কোন এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন, ছেলেবেলায় আমি প্রায় সেখানি খুলে খুলে দেখতাম। খাপখানা তার ধূলোবালিতে মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরে নি। সে যেমন সোজা তেমনি খাঁটি—তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয় দেশসুদ্ধ লোক সবাই ভুল করচে, কেউ কিছুই জানে না—তুমি ইচ্ছা করলে চোখের পলকে সেই খাপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো।' 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে উপেন্দ্র কলকাতায় কিরণময়ীদের বাড়িতে থেকে দিবাকরের কলেজের পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিরণময়ীর আদর-যত্নের সীমা নেই। দিবাকরের অবস্থা বর্ণনা করে শরৎচন্দ্র লিখেছেনঃ 'অযত্ন-পালিত টবের গাছ দৈবাৎ ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া অপর্যাপ্ত রসের আস্বাদে তাহার বুভুক্ষু শীর্ণ শিকড়গুলো যেভাবে মাটির মধ্যে সহস্র বাহু বিস্তার করিতে থাকে, কিরণময়ীর আশ্রয়েও দিবাকরের ঠিক সেইমত হইল।'

শরৎচন্দ্রের ভাষা পরিচ্ছন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিরালঙ্কৃত। সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কথা সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরতে যে সহজবোধ্য অথচ আবেদনশীল ভাষার প্রয়োজন, শরৎচন্দ্রের রচনা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর মনের পরিচ্ছন্নতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ভাষায়। এই কারণেই তো তিনি অমন জনচিত্ত-বিজয়ী লেখক হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্য-সংসারে আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকেই। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ বা সারল্য সত্যিই বিস্ময়কর। সংলাপে সহজ ভাষা ব্যবহারের জন্য নবীন লেখকদের তিনি উপদেশ দিতেন; বলতেন, অলঙ্কৃত বাক্যের বাহুল্যভারে ভাল রচনাও নষ্ট হয়ে যায় ও পাঠকদের কাছে পীড়াদায়ক মনে হয়।

কথার সংযত প্রয়োগের দিকেও তাঁর লেখনী সর্বদা সাবধান ছিল। মূলতঃ তিনি ছিলেন হৃদয়ধর্মী লেখক এবং সেই কারণে তাঁর মধ্যে ভাবাবেগ ছিল—ছিল আবেগ-উচ্ছ্বাস। তথাপি 'তিনি কোন কোন সঙ্কট ক্ষণে স্তম্ভিত পাঠক-হৃদয়ে বিদ্যুৎ চমকের মত অতি সংযত দু'-চারটি কথায় অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই বক্তব্য রাখিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহার ক্ষমতা বুঝা যায়।' 'দেবদাস' থেকে এর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যদিও এটি শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অপরিণত রচনা, কিন্তু এই উপন্যাসেই তাঁর এই সংযত বলিষ্ঠ ভাষার নিদর্শন মেলে। রাত একটার সময় কুমারী পার্বতী অন্যের সঙ্গে বিয়ের যূপকাষ্ঠ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রেমাস্পদ দেবদাসের কাছে গিয়েছে। দেবদাস যখন তাকে জানাজানি হলে কলঙ্ক রটবার সম্ভাবনার কথা বলল, পার্বতী উত্তর করেছে: 'দেবদা, নদীতে কত জল? অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?'

শরৎ-সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে অধিকাংশই এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বহুবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও সহজে বোধগম্য, শ্রুতিমধুর পরিচ্ছন্ন ভাষার জন্য শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব বিশেষভাবেই স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়েছে। তাঁর মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে তাঁর যাদুকরী ভাষাই তো বারো আনা সহায়তা করেছে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের বর্ণনা

যেমন জীবন্ত, সংলাপ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। আবার অনেকের বিবেচনায়, 'শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে অনেক স্থলে পাত্র-পাত্রী একটু বেশি কথা বলে, কিন্তু এই সংলাপ-বাহুল্য 'শেষ প্রশ্ন' (এবং কিছুটা 'বিপ্রদাস') ছাড়া আরও কোথাও লেখাকে বিশেষ ভারগ্রস্ত করে নাই।......শরৎচন্দ্র পাত্র-পাত্রার মুখে কথা বসাইয়া কাহিনী ও চরিত্রের অগ্রগতি সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সংলাপ-বাহুল্যের ইহা অন্যতম কারণ।'

পরিচ্ছন্ন ভাষার সঙ্গে বলতে হয় প্লট-বিন্যাসে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। অনেক ঔপন্যাসিক কাহিনী ঠিক করে তারপর চরিত্র সৃষ্টি করেন, শরৎচন্দ্র বিপরীত ভাবে চরিত্র পরিকল্পনা করে নিয়ে তারপর আখ্যান-বিন্যাস করতেন। বলা বাহুল্য, এই হিসাবে তিনি যে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর সহজাত ক্ষমতা।

তাঁর রচনার মধ্যে শরৎচন্দ্র খুব কমই আত্মপ্রকাশ করেছেন, যদিও লেখক হিসাবে তিনি নিজেকে সর্বত্র সরিয়ে রাখতে পারেন নি, আবেগবশে শিল্পকলাকে ক্ষুণ্ণ করে তাঁর রচনার মধ্যে তিনি কোথাও কোথাও পাঠকদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কাঙালী এসেছে গোমস্তার কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। কাজ কিছুই হলো না, কিন্তু কাঙালীচরণ কথা বলবার আগেই শরৎচন্দ্র জমিদারী পরিচালনার দুর্নীতি সম্পর্কে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখলেন: 'হায়রে অনভিজ্ঞ! বাংলা দেশের জমিদার ও তাঁহার কর্মচারীকে সে চিনিত না।' অথবা 'মহেশ' গল্পটির উপসংহার উল্লেখ করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে গল্পের করুণ উপসংহার পাঠককে অভিভূত করে, তার চোখকে করে তোলে অশ্রুসজল। কিন্তু শিল্পকলা এখানে স্পষ্টতই ব্যাহত হয়েছে, কারণ লেখক এখানে কঠিনভাবে নিপীড়িত গফুরের আল্লার কাছে ফরিয়াদের ভেতর দিয়ে স্বদেশের ধনবণ্টন পদ্ধতির অসমতার বিরুদ্ধে তাঁর নিজের তীব্র বিক্ষোভ রেখেছেন:

'আল্লা। আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরো না।' ইহা শিল্পকলা নয়, বক্তৃতা।

সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই জানেন যে, অল্প কয়েকটি কথায় ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে শিল্পকলা সার্থক হয়। শরৎচন্দ্র নিজেও এ-কথা জানতেন তথাপি কোন কোন জায়গায় তা তিনি মানেন নি। বিশদ বিবরণ না দিয়ে পাঠকের কল্পনার ওপর কিছুটা ছেড়ে দিলে যেখানে শিল্পকলা সার্থক হতে পারত, সেখানে বিশদ বিবরণ সন্নিবিষ্ট করে রচনাকে শুধু অপেক্ষাকৃত ভারাক্রান্ত করা হয় নি, চরিত্রের গতিও সেখানে শ্লথ হয়ে পড়েছে। তবে এ-কথা সত্য যে, এই বিশদ বিবরণ বিষয়বস্তুকে বোধগম্য করে তুলতে সহায়তা করেছে, ফলে 'সেখানকার চমৎকার চিত্ররূপ বা চিত্রকল্প পাঠকের আনন্দ বিধান করে।' 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীর জমিদারী গঙ্গামাটির গোমস্তা কাশীনাথ কুশারীর বাড়ির বর্ণনাটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'তাছাড়া, এই বর্ণনায় প্রাচুর্য ও প্রশান্তির বিপরীত কুশারী মহাশয়ের পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক অশান্তির পরিচয় আনিয়া শরৎচন্দ্র বৈপরীত্যের সাহায্যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন।'

শরৎচন্দ্রের বর্ণনা কোথাও কোথাও কবিত্বপূর্ণ। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের মৃত্যুর পর অচলার শূন্য হৃদয়ের আশ্চর্য সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাব তাঁর লেখনীমুখে এইভাবে ফুটিয়াছে: 'ভয় নাই, ভাবনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধুধু করিতেছে। তাহার রং নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই—একেবারে নির্বিকার, একেবারে প্রকাণ্ড শূন্য।'

শরৎচন্দ্রের মধ্যে কবিত্ব ছিল।

কবিত্বের একটা বড় পরিচয় প্রকৃতি-প্রীতি।

সকল জীবন-শিল্পীর মধ্যেই কমবেশি এটা থাকবেই।

জগৎ ও জীবন নিয়ে মহৎ শিল্পীর কারবার। কাজেই জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। শরৎচন্দ্র বাস্তবতাবাদী লেখক; তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির স্থান গৌণ সন্দেহ নেই। জগতের ও জীবনের নানা সমস্যার ছবি তিনি যত্ন করে এঁকেছেন; কিন্তু প্রকৃতি সেখানে অনুপস্থিতও নয়। প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় শরৎচন্দ্র যে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা পাঠকচিত্তকে সহজেই মুগ্ধ করে। মানব-মন ও প্রকৃতিকে এক সূত্রে গেঁথে শরৎচন্দ্র কি রকম শিল্প-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত আছে 'দত্তা' উপন্যাসের চব্বিশতম পরিচ্ছেদে:

'বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সম্মুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ, প্রান্তর, গ্রামান্তরের বনরেখা, নদী, জল—সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিমঝিম করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই—পরিচয় নাই—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গিয়াছে—এখন তন্দ্রা ভাঙিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক হইয়া তাকাইয়া আছে। চলিতে চলিতে তাহার চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল, এবং মুছিতে মুছিতে বার বার বলিতে লাগিল, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না।'

এ বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ।

কথা-সাহিত্যিক নিঃসন্দেহে একজন কবি ছিলেন। তাঁর শিল্প-চেতনার মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল দুর্লভ কবি-চেতনা।

কবিত্ব ও কল্পনার যোগ অবিচ্ছেদ্য।

কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে জড় সজীব হয়ে ওঠে। বিশ্বজগতে জাগে ভাবের প্লাবন। কবি আপন মনোভাবের দ্বারা বিভাবিত করে তোলেন বাইরের জগৎকে। তখন বাইরের জগৎটা হয়ে দাঁড়ায়

অন্তরের প্রতিচ্ছবি। তখন নদী বা সমুদ্রের তরঙ্গ, বায়ু-হিল্লোল, এমন কি আকাশের বজ্রনাদও কবিকে কথা শোনায়। বস্তুতঃ কবি বাস করেন চৈতন্যময় জগতে যেখানে জড় ও জীবের পার্থক্য অবলুপ্ত, যেখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ঐক্য সম্পূর্ণ বাধাহীন। কল্পনার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সুপ্তচৈতন্য জড়বস্তু চেতনার পূর্ণতা লাভ করে।

শরৎচন্দ্র কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি অবশ্য এ-কথা স্বীকার করতেন না। বরং এই বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তা একান্ত নৈরাশ্যজনক। 'মস্ত মুসকিল হইয়াছে আমার এই যে ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি। পাহাড়-পর্বতকে ঠিক পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া ঘাড় ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারও নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারও মুখটুখ তো চোখে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা চলে না।'

শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন মনোভাব আলোচনা করলে মনে হবে, কবিত্ব সম্পর্কে বোধ হয় তাঁর জন্মগত বীতরাগ ছিল। কবিদের রূপমুগ্ধতা সম্বন্ধে অনেক স্থলে কৌতুক বর্ষণ করেছেন। 'শ্রীকান্ত' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই :

'প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা নদী ও সেই বন-বাদাড়। বেণু ও বেতসকুঞ্জ চারিদিকে—গায়ের চামড়া বাঁচান দায়। আসন্ন সূর্যাস্তকালে তটপ্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সংকল্প করিলাম। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি কচুজাতীয় আঁধারমানিক ফুল ফুটিয়াছে; তাহার বীভৎস মাংসপচা গন্ধে তিষ্টিতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম, কবিরা

ফুল এত ভালবাসে, কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাহাদের উপহার দিয়া আসে না কেন।'

আবার সূর্যাস্ত-দর্শনে তন্ময় দুটি রসিক ব্যক্তিকে তাঁর মনে হয়েছে —উহারা 'জড়ভরতের মত বসিয়া আছে।' কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের যথার্থ পাঠক মাত্রেই জানেন, শরৎচন্দ্র কখনোই প্রকৃত কবিত্বকে ব্যঙ্গ করতেন না; প্রচলিত কাব্যরীতিকেই তিনি নির্মম কশাঘাত করেছেন। কবিদের মধ্যে দেখা যায়, চাঁদকে দেখলেই চাঁদমুখের ছবি জেগে ওঠে, চন্দ্রোদয়ে কুমুদকল্হার এনে হাজির করতে হয় এবং দক্ষিণাপবনের প্রবাহে হৃদয়-দুয়ার খুলে যাবেই। জরাগ্রস্ত প্রথাসিদ্ধ কাব্যরীতির প্রতি কৌতুক অকৃত্রিম কবিত্বের প্রতি অবহেলার দৃষ্টান্ত মনে করলে ভুল হবে।

গহর ও শ্রীকান্তের মিলনে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য-সংঘাতে যে রসোচ্ছলতা জেগে উঠেছে তা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব। একজন কল্পনা-বিলাসী কবি, প্রকৃতির সৌন্দর্যরসে তন্ময় ও আত্মবিস্মৃত: আর একজন বাস্তববাদী, আত্মসংবৃত। শরৎচন্দ্রের বসন্ত বর্ণনা এদিক দিয়ে খুব উল্লেখযোগ্য।

'গহর কহিল, বসন্তকে ডাক দিয়ে কবি বলেছেন, আজি দখিন দুয়ার খোলা।' কাঁচা মেঠো রাস্তা। এক ঝাপটা মলয়ানিলে রাস্তার শুকনা ধূলা আর রাস্তায় রহিল না, সমস্ত মাথায় মুখে মাখাইয়া দিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কবি, বসন্তকে ডাকেন নি, তিনি বলেছেন এ সময়ে যমের দক্ষিণ দোর খোলা—সুতরাং গাড়ির দরজা বন্ধ না করলে হয়তো সেই এসে হাজির হবে।···গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেণুবন, খুব সম্ভব তাহার কোকিল, দোয়েল ও বুলবুলির দল এর মধ্যেই থাকে এবং অহর্নিশি শিস দিয়া গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। পরিপক্ক অসংখ্য বেণুপত্ররাশি ঝরিয়া ঝরিয়া উঠান-আঙ্গিনা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। দৃষ্টিমাত্রই ঝরাপাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্তে গর্জন করিয়া ওঠে।'[১]

১. শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব।

এইসব বর্ণনা অনুধাবন করে দেখলে বোঝা যায়, গহরের তন্ময় কবি দৃষ্টির প্রতি এ কৌতুক আপাত, প্রকৃতপক্ষে গহরের প্রতি লেখকের সহানুভূতির অভাবজনিত ছিল না। পল্লীকবি গহরের কাব্যসাধনার প্রতি শ্রীকান্তের শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, ইহলোকে গহরের সাধনার ব্যর্থতা অন্য কোন লোকে সকলের অলক্ষিতে সাফল্যে মণ্ডিত হয়ে উঠবে। তির্যক ভঙ্গীতে এই বসন্ত-বর্ণনা লেখকের কল্পনা-কুশলতার চমৎকার নিদর্শন। পাখির গানে কবিরা যেখানে সহজে মুগ্ধ, শরৎচন্দ্র সেখানে বিক্ষুব্ধ! এইটিই তাঁর তির্যক ভঙ্গী। কবিত্বকল্পনার বাষ্পমাত্র নেই—এ-কথা শরৎচন্দ্র নিজে বার বার ঘোষণা করলেও সত্য নয়। কবি-জীবনের মর্মরহস্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন বলেই কবি গহরের মুখে শুনতে পাই—'গাছপালাও কথা কয় রে, তাদের কথা শুনতে পাই।' কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে গাছপালা কথা কয়ে ওঠে এবং মানুষের কথা শোনে।

শ্রীকান্ত নির্জন বাল্যস্মৃতিবিজড়িত পুরাতন পথ দিয়ে যেতে যেতে বৃদ্ধ তেঁতুল গাছটিকে লক্ষ্য করে বন্ধু সম্বোধনে গভীর মর্মোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন। মনে হয়, তার প্রতিটি কথাই বৃদ্ধ গাছটির মর্ম-কোষে গিয়ে অনুরণন জাগাচ্ছে। এইখানেই আমরা শরৎচন্দ্রের কবিত্বের যথার্থ পরিচয় পাই।

'গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মতো, মাথাটা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে।··· জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মতো চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না তো? কাছে গিয়া পরম স্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়। সায়াহ্নের আলো নিবিয়া

আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। চললাম বন্ধু।'

গহরের মৃত্যুতে তার মালতী ও মাধবীলতার কুঞ্জ মূর্তিমান শোক-কুঞ্জে পরিণত। শোকাতুর লতাকুঞ্জ বিধবার মত বিপর্যস্ত বেশভূষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আসলে শ্রীকান্তেরই নিজের বন্ধু বিয়োগজনিত শোক গাছপালার মধ্যে ঘনীভূত রূপ লাভ করেছে।

'আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া একটি কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে। তাহারই কোন একটা সংকীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি রাঙা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর-সংলগ্ন সেই শুষ্কপ্রায় জামগাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মালতী লতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটি কয়েক আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কেবল কাঠপিঁপড়ার ভয়ে পারে নাই। আর আজ তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, কত ঝরিয়াছে তলায়, কত বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশেপাশে, ইহারই কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষ দান মনে করিয়া।'

শুধু কি মানুষ? মনুষ্যেতর পশুর মর্মবেদনার অন্তস্তলে প্রবেশ করতে পেরেছেন শরৎচন্দ্র আপন জীবনের গভীর বেদনার অনুভূতি দিয়ে। মানুষ ও পশু পরস্পরের সমব্যথী—এমনতর উদাহরণ সাহিত্যে সুদুর্লভ। নীচের উদ্ধৃতিটির প্রতিটি ছত্রে সকরুণ কল্পনার জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে:

'এ যে যশোদার কুকুর সন্দেহ নাই। ফুল-কাটা রাঙা পাড়ের সেলাই করা বগ্‌লস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটীরের মধ্যে কি খাইয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া-কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই—অনশনে অর্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ

চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়তো ভাবে, কোথাও-না-কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এই কি এমনিই? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?…সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে বেচারা এই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।…বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাৎ হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না, এমনি দশা।'

মূঢ়-ম্লান-মূক পশুর বেদনার ইতিহাস এমন দরদ দিয়ে যিনি অনাবৃত করতে পারেন তাঁকে কবি বলব না তো আর কাকে বলব? শ্রীকান্ত উপন্যাসের বহুস্থলে অকৃত্রিম কবিত্ব ও কল্পনার প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

'পূর্বে রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায় সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায় পাতায় শোভায় সৌরভে ফুলে ফুলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুরুদ্ধ ভাষা। করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা পেয়েছ, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।'

শরৎচন্দ্রকে বড় কবির মর্যাদা না দিয়ে উপায় কি? তাঁর কবি-চেতনার নানা লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আঁধারের রূপ বা সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনা অংশগুলো বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। মানব-মনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় ও গভীর সম্বন্ধ উপলব্ধি করে তারই বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিরথ। শরৎচন্দ্রের কবিত্ব সে পর্যায়ের বা ততখানি না হলেও মানুষের মনের সঙ্গে

প্রকৃতির সংযোগ স্থাপনে তিনিও কম কবিত্ব দেখান নি। এক্ষেত্রে তাঁর কলাশিল্প যেন সাতরঙা একটি রামধনু সৃষ্টি করেছে।

॥ একুশ ॥

শরৎ-প্রতিভার পূর্ণ রূপ আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কেননা মৃত্যুতে তাঁর জীবন ও প্রতিভা হয়েছে কালের আঙিনায় নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতো। আগেই বলেছি, শরৎ-সাহিত্যকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করে দেখা উচিত, যথা—প্রাক্-শ্রীকান্ত ভাগ ও শ্রীকান্ত পরবর্তী ভাগ। প্রথম ভাগের রচনাগুলি তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা এবং অনেকের বিবেচনায় সেই হিসাবে এগুলি তাঁর অপরিপক্ক বা immature রচনা। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় ভাগের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায়, প্রথম ভাগের রচনাকে অপরিপক্ক রচনা বলা চলে না। 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ চরিত্রটি কি নিপুণ শিল্পীর সৃষ্টি নয়? বাস্তবিক শরৎ-প্রতিভা বাঙালীর যে এতটা বিস্ময়ের সামগ্রী হয়েছে, তার বড় কারণ মনে হয় এই যে পাঠকরা তাঁর রচনার অপরিপক্কতার সুযোগ পেয়ে তাঁকে উপহাস বা কৃপা করবার অবসর কখনো পায় নি।

কেন? কারণ প্রথম ভাগে অর্থাৎ কাশীনাথ', 'বড়দিদি', 'পল্লী-সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে শরৎচন্দ্র নিপুণ শিল্পী বটেন কিন্তু নূতন ভাবুক নন, কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে, অর্থাৎ 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে, তিনি নিপুণ শিল্পীও বটেন। প্রকৃতপক্ষে এই পরম জন-প্রিয় ঔপন্যাসিক জীবনের কথা গভীর করে ভেবেছেন। মানুষের জীবনের প্রতি এক অপরিসীম মর্যাদাবোধ রয়েছে এই শিল্পীর শিল্প প্রেরণার মূলে। এই প্রেরণার ফলেই তো শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে প্রতিদিনের জীবনকে দান করেছেন পূর্ণাঙ্গতা—একটি অচঞ্চল রূপ। তিনি এঁকেছেন মানবমনের সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ছবি।

এই ছবি তখনই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে যখন তা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়। মানব-হৃদয়ের মাধুর্য সেইখানেই বেশি করে ক্ষরিত হয় যেখানে তাকে সংগ্রাম করতে হয় প্রবল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে। মোটকথা, বুদ্ধি ও সংসারের সঙ্গে হৃদয়াবেগের যে দ্বন্দ্ব তাকেই শরৎচন্দ্র ভাষা দিয়েছেন। এইবার আমরা শরৎ-সাহিত্যের ত্রিমুখী সৃষ্টি—উপন্যাস, ছোট গল্প ও তার নিজের দেওয়া স্বীয় উপন্যাসের নাট্যরূপের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

শরৎচন্দ্রের লেখার কালানুক্রমিক হিসাব মেলে না। তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'বাগানখাতা'-ই তাঁর সাহিত্যমানসের সূচীপত্র। এই পর্বের গল্পগুলিতে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির প্রবণতা অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশঃ বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। উত্তরজীবনে যিনি বাংলা উপন্যাস-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকার হয়ে উঠেছিলেন, তার বিচিত্র দিকগুলির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে বাগানখাতার গল্পগুলিতে। এই গল্পগুলির অধিকাংশই শরৎচন্দ্রের ষোল-সতেরো থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বয়সের মধ্যে লেখা। তাঁর জন্মস্থান দেবানন্দপুর গ্রামে পাঠ্যাবস্থাতেই শুরু হয়েছিল বাংলার এই অপরাজেয় কথাশিল্পীর সাহিত্য-জীবন—এ-কথা আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। কিন্তু সে খবর তখন কেউ রাখত না। ভাগলপুরে যখন তিনি জুবিলী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষীর সনির্বন্ধ অনুরোধে সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তবে সে আত্মপ্রকাশও ছিল প্রত্যূষের সূর্যোদয়ের মতো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভাগলপুরের জীবনে তাঁর লেখার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়—ভাষায়, চরিত্রসৃষ্টিতে এবং গল্প-উপস্থাপনে। তার কারণ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়ে পড়ে তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, এ-কথা শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের উদ্বোধন-পর্বের রচনা এইগুলি : ১। কাশীনাথ, ২। বোঝা, ৩। অনুপমার প্রেম, ৪। বাল্যস্মৃতি, ৫। দেবদাস, ৬। হরিচরণ, ৭। আলো ও ছায়া, ৮। মন্দির,

৯। ছবি এবং ১০। বড়দিদি। তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে আমরা নব-জাগরণ পর্ব নামে চিহ্নিত করতে পারি। এই পর্বের রচনাগুলি এই : ১। রামের সুমতি, ২। পথ-নির্দেশ, ৩। বিন্দুর ছেলে, ৪। পরিণীতা, ৫। আঁধারে আলো, ৬। মেজদিদি, ৭। দর্পচূর্ণ, ৮। বৈকুণ্ঠের উইল, ৯। নিষ্কৃতি, ১০। অরক্ষণীয়া, ১১। চন্দ্রনাথ, ১২। আসার আশায়, ১৩। স্বামী, ১৪। একাদশী বৈরাগী, ১৫। বিলাসী, ১৬। মামলার ফল, ১৭। মহেশ, ১৮। অভাগীর স্বর্গ, ১৯। হরিলক্ষ্মী, ২০। পরেশ, ২১। সতী ও ২২। অনুরাধা। 'অনুরাধা' তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ গল্প। আমাদের আলোচনার পরিধির মধ্যে এর সবগুলিকে না আনলেও চলবে। 'কাশীনাথ' দিয়েই আলোচনা শুরু করি।

'কাশীনাথ' বাল্যকালের রচনা হলেও, এ কাহিনীটিকে তিনি পরিমার্জিত করে আবার লিখেছিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনীর অনেক পরিবর্তন হয়। কাশীনাথ গল্পরচনায় শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব যথেষ্টই পড়েছে। আমরা দেখেছি তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার মতোই সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ত, ভবঘুরে প্রকৃতির। কাশীনাথ চরিত্রটি এই ছাঁচেই গঠিত। এই চরিত্র শ্রীকান্ত শ্রেণীর চরিত্রেরই আদি রূপ। এই ধারার চরিত্রই শরৎ-সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে অধিক এবং প্রাধান্য পেয়েছে কাহিনীতে।

উপন্যাসগত জটিলতর জীবন-রস কাশীনাথের প্রাণসত্তাকে সঞ্জীবিত করে থাকলেও, তার নিখুঁত প্রকাশ এখানে ঘটে নি। কাহিনীটি যেভাবে এখানে পরিস্ফুট হয়েছে, বর্ণনাভঙ্গীর সংযত প্রকাশে এবং ইঙ্গিতময়তার যথাযোগ্য প্রয়োগে কাশীনাথ ছোট গল্পের সার্থকতা নিয়ে দেখা দিতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের সংস্করণরূপে দেখা দিয়ে অখণ্ডতা হারিয়েছে।

বাঙালী জীবনের ঘরজামাই রাখার সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এই আখ্যায়িকার পটভূমিকা। দরিদ্র কুলীন জামাতাকে বাঙালী ঘরে শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত হতে দেখা যেত। কাশীনাথের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জামাতারা কখনো এই অবস্থায় সুখী হতে পারে নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই সমস্যা ছাড়াও কাশীনাথে আর একটি প্রধান উপকরণ গ্রহণ করেছেন।' সেটি হলো নরনারীর চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে পুরুষের চির-ঔদাসীন্য এবং নারীর অভিমান-প্রসূত দুর্জয় আক্রোশের সংযোগে। ঐশ্বর্যের দম্ভ কমলার স্বামী-প্রেমকে আচ্ছন্ন করেছে। সমগ্র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে মুখ্যত কাশীনাথ ও তার স্ত্রী কমলার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচিতি নিয়ে। তাই এখানে উপন্যাসগত ও প্রত্যক্ষ বিবর্তন উপলব্ধি করা যায় না। সমগ্র কাহিনীভাগে একমাত্র কাশীনাথ-কমলার জটিল মানসিক সংঘাত ছাড়া ঘটনার জটিলতা কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। কাশীনাথকে তার স্রষ্টা একেবারে আত্মমগ্ন পুরুষ হিসাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

বাল্যকালের রচনা হলেও, এই দাম্পত্য-কাহিনীর মধ্যে আমরা যা দেখি তা সত্যিই বিস্ময়কর। এক ব্যক্তি-সংঘাতের সমগ্র চিত্র কাশীনাথ। ব্যক্তি-সংঘাতের এই সুষম সুন্দর কাহিনীটি, মানবাত্মার সংগ্রাম, তার আর্ত ক্রন্দনের একটি সার্থক চিত্র।

১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার 'সাহিত্য'[১] পত্রিকায় 'কাশীনাথ' বের হলো ; পাঠ করে সবাই মুগ্ধ হলো। সেই পাঠকদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন একজন ছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'কাশীনাথ পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। পড়া বন্ধ করিয়া কাঁদিলাম। কাশীনাথ যে খুন হইল, কমলা যে আত্মহত্যা করিল,

১. বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তখনকার দিনে এই পত্রিকাটির খুব প্রভাব ও খ্যাতি ছিল।

ইহা আমাদিগকে ব্যথিত করিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। ভগবৎ কৃপায় একদিন সুযোগ মিলিল। ভারতবর্ষ কার্যালয়ে ২০১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ত্রিতলের একটি ঘরে শরৎচন্দ্রের দর্শনলাভ করিলাম।…কাশীনাথের কথা উত্থাপন করিলাম। বলিলেন—'শুধু কাশীনাথ নয়, সাহিত্যে যে কয়টা গল্প বেরিয়েছে, ওর সব কয়টাই আমার বাল্যকালের লেখা, গল্পে কি যে ছিল মনেও নেই।'…দু-একটা কথা হওয়ার পর আমি কাশীনাথের খুন হওয়া এবং কমলার আত্মহত্যার কথাটা তুলিয়া একটু পরিবর্তন করা চলে কিনা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করায় বলিলেন—'ও গল্প কখনো বই-এর আকারে বেরুবে কিনা জানি না। যদি বেরোয় নিশ্চয় পরিবর্তন করতে হবে।' বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র এই অনুরোধ উপেক্ষা করেন নি!

'কাশীনাথ' প্রসঙ্গে একজন বিদগ্ধ সমালোচকের অভিমত কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম: 'শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'কাশীনাথ'। ইহাতে যেসব কাহিনী আছে[১] তাহাদের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের সূচনা আছে। এখানেও দেখি নারীর প্রতি সেই গভীর সহানুভূতি, সেই স্পষ্ট, সরল অথচ অতি-মধুর প্রকাশভঙ্গী।… কাশীনাথের গল্পাংশ উপন্যাসের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কাশীনাথ দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু নির্লোভ ও উদাসীন প্রকৃতির লোক। তাহার স্ত্রী কমলা স্বামীর প্রতি অনুরক্তা হইলেও অতিশয় অভিমানিনী; স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ। ইহাদের দাম্পত্য জীবনের গোড়ায় রহিল একটি বড় জিনিসের অভাব ইহারা পরস্পরের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিল না। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে সুখী করিতে চাহে অথচ চরিত্রের বৈষম্যের জন্য ও অবস্থার বৈগুণ্যে তাহারা সুখী হইতে পারিতেছে না—ইহা পরম আক্ষেপের

---

১ 'কাশীনাথ' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন এর সঙ্গে আরো তিনটি প্রেমের গল্প ছিল, যথা—'আলো ও ছায়া', 'মন্দির' ও 'অনুপমার প্রেম'।

বিষয়। কিন্তু ইহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে দম্পতির দৈনন্দিন জীবনের বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন। স্বামী ও স্ত্রীর মিলন ও দ্বন্দ্ব হয় প্রতিদিন নানা তুচ্ছ ঘটনায় এবং প্রাত্যহিকের এই তুচ্ছতাকে রূপ না দিতে পারিলে সেই মিলন ও দ্বন্দ্ব জীবন্ত হইবে না। ছোট গল্পে তাহা সম্ভব হয় না। সুতরাং শরৎচন্দ্র দুই একটি বড় ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয় নাই। কমলা যে সমগ্র সম্পত্তির দাবী করিয়াছিল তাহার কারণ বুঝিতে পারি, কিন্তু ম্যানেজার কর্তৃক কাশীনাথের অপমান সম্পর্কে কমলা যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা একটু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অভিমানিনী কমলার চরিত্রেও ইহা সুসমঞ্জস নহে। কমলা নির্বোধ নহে, স্বামী তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেও স্বামীর কথা সে যেভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং স্বামীকে যেভাবে তাড়াইয়া দিয়াছে তাহা স্বাভাবিক এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।'[১]

'বোঝা' গল্পটি বিয়োগান্ত। নায়ক সত্যেন্দ্র তার তৃতীয়া পত্নীকে নিয়ে সুখী হয়েছিল কিনা সে কথা গল্পে আদৌ বলা হয় নি। গল্পের বিষয়বস্তু সরলা ও নলিনীর মৃত্যু, বিশেষ করে নলিনীর জীবনের পরিণতি—দুর্ভাগ্যময় পরিণতি। সরলা সত্যেন্দ্রর প্রথমা স্ত্রী। তার মৃত্যুতে স্বভাবতঃই স্বামীর মন সরলার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত ছিল। সেই মানসিক ভাব নিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করল। এবং এই কারণেই তার পক্ষে দ্বিতীয়া স্ত্রী নলিনীকে আপনার করে নেওয়া সম্ভব হয় নি। আংশিক মিলন সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান রয়েই গেল। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও নলীনী তার স্বামীর মন অধিকার করতে সক্ষম হলো না। এর ফলে স্বামী তুচ্ছ কারণেই তার উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। এই বিরূপতার অভিব্যক্তি-স্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথের অভিমান ও ক্রোধের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে

১. শরৎচন্দ্র : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

তা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। অবশেষে যে সামান্য কারণে সে তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করল তাতে তাকে পাঠক একজন উন্মাদ ভিন্ন আর কিছুই মনে করতে পারে না। কাহিনীর মূল ঘটনা এটাই—কিন্তু এই ঘটনা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি অস্বাভাবিক। রসজ্ঞ পাঠকের মনে দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী সত্ত্বেও 'বোঝা' তাই শেষ পর্যন্ত একটি রীতিমত বোঝা হিসাবেই স্থান পায়, তার বেশি কিছু নয়।

'আলো ও ছায়া', 'মন্দির' ও 'অনুপমার প্রেম'—তিনটিই প্রেমের গল্প। এগুলি যে সময়কার রচনা তখন শরৎচন্দ্র বঙ্কিমভাবের ভাবুক ছিলেন। নূতনত্বের মধ্যে তিনটি গল্পেই তিনি নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র এঁকেছেন এবং বিশেষভাবে এই জাতীয় প্রেমের বিশুদ্ধতার দিকটিই তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন। আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই গল্প তিনটির মধ্যে শরৎ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট ছাপ আছে অর্থাৎ চরিত্রসৃষ্টি করবার ক্ষমতার পরিচয় এখানে কিছুটা মেলে। তবে ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির অবকাশ কোথায়? সার্থক চরিত্রসৃষ্টি বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। গল্পে তা আদৌ সম্ভব নয়।

একটি কেন্দ্রীয় ঘটনাকে আশ্রয় করে সাধারণতঃ ছোট গল্প গড়ে ওঠে। শরৎচন্দ্রের এই গল্প তিনটির মধ্যে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বরং পাঠকদের মনে এই ধারণা জন্মাবে যে গল্প তিনটি কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি—মনে হবে লেখক যেন এই গল্প তিনটির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি দীর্ঘ উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। গৌণ ঘটনাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর কাহিনীর মুখ্য অংশকে শুধু আভাসে-ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে একটি চরিত্রও পরিপূর্ণতা নিয়ে ফুটে উঠতে পারে নি। গল্প পাঠ করছি, না দীর্ঘ উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার পাঠ করছি—পাঠকচিত্তে এই প্রকার প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়।

এই গল্প তিনটির মধ্যে 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পটি

উল্লেখ্য। ডঃ সেনগুপ্ত লিখেছেন : 'মন্দির' গল্পটিতে শ্রেষ্ঠ আর্টের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশবে বালিকার মনে দেবতা ও দেবমন্দিরের প্রতি যে আকর্ষণ জাগিয়া উঠিয়াছে, কৈশোরে ও যৌবনে সেই আকর্ষণ বর্ধিত হইয়া প্রণয়াসক্তির বিরুদ্ধতা করিয়াছে। আবার এই দুই প্রবৃত্তি জড়াইয়া গিয়া পরস্পরের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। মন্দিরের প্রতি অনুরক্তি অপর্ণার স্বামী-প্রীতির অন্তরায় হইয়াছিল, আবার শক্তিনাথের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল মন্দিরে। শৈলেশ্বরের মন্দিরে তিলোত্তমা-জগৎসিংহের মিলনের মত এই মিলন আকস্মিক নহে, কারণ অপর্ণা মন্দিরের পূজারিণী আর শক্তিনাথ তাহার পূজারী ব্রাহ্মণ। আর একটি ঐক্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অপর্ণা দুইটি পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল ; উভয়ের সম্ভাষণ চরমে পৌঁছিয়াছিল গন্ধদ্রব্যের উপহারে এবং উভয়ের উপহারই সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। শুধু যে অপর্ণার চরিত্রের অভিব্যক্তি সুন্দর হইয়াছে তাহাই নহে, এই গল্পের গঠন-কৌশলও অনবদ্য।··· গল্পটির সম্পর্কে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। শক্তিনাথের প্রতি অপর্ণার মনে ঠিক কি ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট হয় নাই। ইহার মধ্যে কতখানি স্নেহ, কতখানি করুণা, কতখানি প্রীতি এবং অন্য সকল ভাবের অন্তরালে কতটুকু প্রেম লুকাইয়া ছিল তাহা বুঝা যায় না।'[১]

'বড়দিদি' গল্পটিই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্য-সংসারে প্রবেশের জন্য এক সম্পূর্ণ অপরিচিত লেখকের পক্ষে ছাড়পত্রের কাজ করেছিল। এই গল্পটিই সেদিন সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথেরও, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। 'বড়দিদি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র মাধবী, সুরেন্দ্র নয়। মাধবী আচারনিষ্ঠ, হিন্দুঘরের বালবিধবা—যার স্নেহকরুণাধারা অন্তরীক্ষ থেকে বর্ষিত হয়েছে পরিবারের সকলের উপর, আশ্রিত সুরেন্দ্রর উপরেও। সুরেন্দ্রকে

১. শরৎচন্দ্র : সেনগুপ্ত

ঘিরে মাধবীর অন্তরে ফুটে উঠেছিল একটা জটিলতা—মাতৃত্ব ও নারীত্বের একটা রহস্যময় সংমিশ্রণ ফুটে উঠেছে তার চরিত্রে। সুরেন্দ্রর শিশুর মত নির্ভরতা যেমন তার হৃদয়ে মাতৃত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে, তেমনি মনোরমা যখন 'পোড়ার বাঁদর' দেখতে এল তখন তার পরিহাসে চোখের জলে তার বিধবাজীবনের সঞ্চিত নারীত্বের প্রকাশ করেছে। এই দুইটি একসঙ্গে মিলে মাধবীকে রহস্যময়ী একটি নারী-চরিত্রে পরিণত করেছে। শরৎ-প্রতিভা এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে আবিষ্কার করেছিল, তাই বড়দিদির চরিত্রটি, বিশেষতঃ শেষ দৃশ্যে তাঁর বৈধব্যের সংস্কার উপেক্ষা করে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, পাঠকচিত্তকে চমৎকৃত করে।

প্রথম জীবনের গল্পগুলির বর্ণনা ও ভাষা তখনো শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নি। উপস্থাপন ও ঘটনাংশ সুসংহত হয় নি—চরিত্রেও সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতার অভাব আছে, রোমান্টিকতা এবং অতি নাটকীয়তাও গল্পকে গভীরতা দিতে পারে নি। প্রাক্‌যৌবনসুলভ ভাবপ্রবণতা শিল্পসৌন্দর্যকে পরিম্লান করেছে সত্য, কিন্তু এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে শরৎ-প্রতিভার বিদ্যুৎচমকে এ কাহিনীগুলি প্রদীপ্ত। শুধু তাই নয়। এই অপরিণত রচনার মধ্যেও ব্যক্তি-জীবনের সংঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বন্দী মানবাত্মার নিরুপায় বেদনার ছবি আকস্মিকভাবে পাঠকচিত্তকে চমকিত করে। এই উপলব্ধির মধ্যেই আমরা পাই তাঁর প্রতিভার প্রাথমিক পরিচয়।

১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছিল; বই আকারে এর প্রকাশকাল ১৯১৩। ইহাই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। একদিকে নারীর সহজ হৃদয়ধর্ম, অন্যদিকে তার সমাজ-বোধ—মাধবী-চরিত্রে এই দুটি ভাব দেখা যায়। যে মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে ভালবেসে কেঁদে মরে, সেই আবার সমাজবোধের চাপে প্রেমাস্পদকে তাদের বাড়ি থেকে চলে যাবার মত ব্যবহার করে বসে। পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থায় অসহায় নারীর দল দুঃখের বিবর্ণতায় আপন জীবন সমগ্রভাবে রঞ্জিত করে শরৎ-সাহিত্যে ভিড় করেছে।

বিধবা মাধবী এইরকম একটি চরিত্র। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে এই শ্রেণীর নারী-চরিত্রের আধিক্য দেখা যায়। প্রেমে ও স্নেহে এই চরিত্রগুলি সুন্দর। 'বড়দিদি' উপন্যাসে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর প্রেম যদি জেগেই থাকে, তা এসেছে অসহায় সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর স্নেহ-করুণার ভিতর দিয়ে, ইন্দ্রিয়জ প্রেমের ভিতর দিয়ে নয়।

'বড়দিদি'তে সামাজিক সমস্যার অঙ্কুর ছিল, কিন্তু আপনভোলা সুরেন্দ্রনাথের জন্য বিধবা মাধবীর দরদ মাঝপথে আশ্রয়চ্যুত হয়েছে। বাপের মৃত্যুর পরে ভাইয়ের সংসারে মাধবীর অসুবিধা ও শ্বশুর-বাড়িতে জমিদারের শোষণের বেদনাও তার চরিত্রকে নায়িকা চরিত্রের প্রয়োজনীয় পূর্ণতা দিতে পারে নি। এই কারণেই কাহিনীর শেষভাগে সুরেন্দ্রনাথকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পেয়ে অসীম মমতায় মাধবী তার মাথা কোলে তুলে নিয়েছে সত্য, কিন্তু কারুণ্য সত্ত্বেও এর মধ্যে ট্র্যাজেডির ভাব ঠিক তেমনভাবে ফুটে ওঠে নি যেমনভাবে হওয়া উচিত ছিল।

শরৎ-সাহিত্যে বিধবা নারী যেমন অনেক, জমিদারও তেমনি অনেক। বাংলা কথা-সাহিত্যে জমিদারকে স্থান দিয়েছেন প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র। শরৎ-সাহিত্যের কোন জমিদার ভাল, কোন জমিদার মন্দ। 'বড়দিদি'র জমিদার সুরেন্দ্রনাথের নামে কর্মচারীরা যদি অসহায়া বিধবা মাধবীর সম্পত্তি গ্রাস করে, তাহলে সে কলঙ্ক জমিদার সুরেন্দ্রনাথেরই। জমিদারী ভোগ করছেন বলে তিনিই দায়ী। কিন্তু শরৎচন্দ্র জমিদার সুরেন্দ্রনাথকে যে অব্যাহতি দিয়া ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ উপন্যাসের শেষ করুণ অধ্যায়টি। উপন্যাসের শেষ দিকে লেখক সুরেন্দ্রনাথকে ঘোড়ায় চড়িয়ে মরণযাত্রায় পাঠিয়েছেন, তার বৃত্তিগত কলঙ্ক-কালিমা করুণার প্রবাহে মুছে দিয়েছেন। প্রেমের সামাজিক সমস্যাই চিত্রিত হয়েছে এই ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাসে।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিকে, বিশেষ করে নারী-চরিত্রগুলিকে বার বার কাশী-বৃন্দাবনের মতো পবিত্র তীর্থে গিয়ে জীবনের শান্তি

খুঁজতে দেখা যায়। 'বড়দিদি'তে মাধবী কাশী গিয়েছে। কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সমকালীন সামাজিক মানুষের জীবানুভূতি হলেও এর পিছনে শরৎচন্দ্রের এই তীর্থস্থানগুলির প্রতি শ্রদ্ধাভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কাশী ঘুরে এসেছিলেন। তীর্থ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ হিন্দুর আজন্ম সংস্কার, ব্রাহ্মণের পক্ষে আরো বেশি। শরৎচন্দ্র এই সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন না।

ভাবোচ্ছ্বাসের প্রবল আতিশয্য 'বড়দিদি' উপন্যাসে বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। আগেই বলা হয়েছে, এ তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা এবং সেইজন্য উপন্যাসের যা প্রধান লক্ষণ, বাস্তব-অনুভূতি—এই কাহিনীতে তা অনুপস্থিত। একজন সমালোচক তাই মন্তব্য করেছেন: 'শরৎচন্দ্র যেন কষ্ট-কল্পনা করিয়া ইহার গল্পটি সাজাইয়াছেন। গ্রন্থশেষে সুরেন্দ্রনাথ যেভাবে মাধবীর সহিত মিলিত হইল তাহা বিশেষভাবে অবাস্তব মনে হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা মাধবীর আত্মভোলা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও করুণার। এই স্নেহ-করুণা প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া প্লাবনীরূপ ধরিতে পারে না তাহা নয়। কিন্তু উপন্যাসটিতে যথাযথ আখ্যান-বিন্যাস না করিয়াই সেই প্রেমরূপ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথকে মাধবীদের বাড়িতে দেখানো হইয়াছে শিশুর মত আপনভোলা করিয়া। মাঝে অনেকদিনের ব্যবধান রাখা হইয়াছে তাহাকে মাধবী-প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, শেষে একরূপ হঠাৎ মাধবীর প্রতি অবিচার দূর করিবার জন্যই হউক, আর মাধবীর সহিত মিলিত হইবার জন্যই হউক, সুরেন্দ্রনাথ জীবনকে বাজি ধরিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথকে বিধবা মাধবীর কোলে মাথা রাখিয়া যেভাবে মৃত্যুবরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই চরম ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয়।'[১]

শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর জীবনেই হিন্দু ব্রাহ্মণঘরের বালবিধবার

১. শরৎ-চেতনা: বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। মনে হয় সেই তাঁর অতিক্রান্ত বয়ঃসন্ধির যুগ থেকে তিনি বিধবা নারীর চিত্ত-ক্ষুধার রূপায়ণকে তাঁর সাহিত্যের প্রিয় বস্তু করে তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁকে অপ্রতিরথ বললেই হয়। শরৎচন্দ্রের পুরুষরা বেশির ভাগই আত্মভোলা, অথবা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়; এর বিপরীতে তাঁর নায়িকারা বিশেষভাবেই সক্রিয় হবার সুযোগ পেয়েছে। 'বড়দিদি' উপন্যাসে সুরেন্দ্রনাথের বিপরীতে মাধবীও সেই সুযোগ পেয়েছে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। 'অসামাজিক প্রেমের পথে শরৎচন্দ্রের প্রেমিকা সমাজের নিকট হইতে বাধা পাক বা না পাক; বড় বাধা আসে তাহার নিজের অন্তর হইতে, নিজের স্বামী-সংস্কার বা সমাজ-সংস্কার হইতে। মাধবীর ক্ষেত্রেও তাহাই সত্য হইয়াছে।'

ভাষার কমনীয়তা ও কাহিনীর কোমলতা শরৎ-সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ। 'বড়দিদি'তে নিপুণতার কিছুটা অভাব থাকলেও এই দুইটি গুণই বর্তমান।

'দেবদাস' বয়ঃসন্ধিকালে রচিত বয়ঃসন্ধিকালের মনস্তত্ত্ব-আশ্রিত উপন্যাস। এই সময়ের মানবমনের প্রেম ও তার জীবনব্যাপী আবেগ প্রায় সকল জীবনের পক্ষেই সত্য—এই অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়ের কাহিনী তাই প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, কিন্তু রসসৃষ্টির দিক থেকে এবং চিন্তার গভীরতা বা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মাপকাঠিতে এই কাহিনী খুব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নয়। প্রাক্‌যৌবনসুলভ একটা ভাবপ্রবণতা ও আবেগাতিশয্য সূক্ষ্ম রসবোধের অন্তরায় হয়েছে। পার্বতী ও দেবদাসের বাল্যপ্রণয় ও শিশুসুলভ একটা প্রীতির সম্বন্ধ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতের মহান শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

দেবদাস প্রচলিত সামাজিক সংস্কার ও সামাজিক কর্তব্যকে অস্বীকার করে এই প্রেমের মর্যাদা দেয় নি, পার্বতীও তার সতীত্ব-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে গৃহত্যাগে রাজী হয় নি। শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীল মনই তাদের ব্যক্তিত্বকে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হতে দেয় নি। কারণ

সেই স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়। চন্দ্রমুখীর চরিত্রটি সম্পূর্ণতা পায় নি, তার প্রেম ও ত্যাগ ঠিক স্বাভাবিক ও স্বচ্ছভাবে রূপায়িত হয় নি। রেঙ্গুন প্রবাসে এই পতিতা চরিত্রের যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, সে অভিজ্ঞতার কোন চিহ্ন এই চরিত্র রূপায়ণে দেখা যায় না—নেহাৎ লেখকের প্রয়োজনেই যেন চন্দ্রমুখীর প্রয়োজন হয়েছে। তথাপি এর মধ্যে ভবিষ্যতের রাজলক্ষ্মী বা সাবিত্রীকে খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনীতে গভীরতার অভাব, কারণ চরিত্র ঘটনা-প্রবাহে নির্মিত হয়েছে। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে রূপায়িত হয় নি। ঘটনা চরিত্রকে সৃষ্টি করেছে, চরিত্র ঘটনাকে সৃষ্টি করে নি। ফলে রসসৃষ্টি গভীরতর ও সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি।

অপরিণত প্রতিভার সৃষ্টি হলেও, সমগ্রভাবে 'দেবদাস'-এর মধ্যে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে। আবেগ-উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও শিল্পকলাগত বৈশিষ্ট্য একেবারে অনুপস্থিত নয়। 'ব্যর্থপ্রেমের যে কাহিনী 'দেবদাস'-এ স্থান পাইয়াছে, 'বড়দিদি'র কাহিনীর চেয়ে তাহা অধিক মর্মস্পর্শী এবং বাস্তবতার নিরিখে ত্রুটি থাকিলেও ইহা 'বড়দিদি'র চেয়ে অধিক বাস্তব বলিয়া পাঠকদের নিকট অনুভূত হয়। প্রেমের বহিরঙ্গ অভিব্যক্তির বলিষ্ঠতায়, ব্যর্থ-প্রেমের আঘাতের তীক্ষ্ণতায় ও আত্মবিস্মৃতির কঠিন সাধনা বর্ণনায় এবং সর্বোপরি সুগভীর প্রেমের মর্যাদারক্ষার দিকে উপসংহার বিন্যস্ত করার মুন্সীয়ানায় শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস 'দেবদাস' প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।'[১]

আর একটি কথা। পল্লীসমস্যা শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের প্রায় সকল গল্পেই স্থান পেয়েছে। 'দেবদাস' উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম নেই। তাঁর প্রথম বয়সের এই লেখাতেও তাঁর পল্লীসমস্যার প্রতি ও জাতিভেদ প্রথাটির কুফলের প্রতি মানবতামূলক সতর্ক দৃষ্টি ফুটে

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়।

উঠেছে, যদিও অভিজ্ঞতা বা রচনাকুশলতার অভাবে এই দৃষ্টি পুরো-পুরি সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি।

'চন্দ্রনাথ' একটি সাধারণ সনাতনপন্থী গল্প হলেও চরিত্র ও কাহিনীর পটভূমিকায় কয়েকটি বিষয়ে তার অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে। এই গল্পেই মণিশঙ্কর সমাজ ও সংস্কারের বাধাকে অতিক্রম করে অকলঙ্ক সরযূকে পরিবারে গ্রহণ করেছেন, কলঙ্ক ও অপবাদকে তুচ্ছ করে মানবতা ও সত্যকে জয়ী করেছেন। 'পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যে পাপ করে নি তার আবার প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন? ...সমাজ আমি, সমাজ তুমি, এ গ্রামে আর কেউ নেই, যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি।' মণিশঙ্করের এই কথা শরৎচন্দ্রেরই মনের কথা। শরৎ-সাহিত্যে সমাজনীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম সার্থক বিদ্রোহ। মায়ের কলঙ্কে মেয়ের কলঙ্কিত হওয়ার কোন সঙ্গত হেতু নেই—এইখানেই শরৎচন্দ্র সমাজ নিরপেক্ষভাবে প্রথম ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বইটির মূল্য এইখানেই। এই স্বল্পায়তন উপন্যাসেই[১] শরৎচন্দ্র প্রথম বিবেকহীন সমাজনীতিকে আক্রমণ করেছেন।

এই বইটির অপর বিশেষত্ব হলো মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং এই কারুকার্য দ্বারা লেখক সরযূ-চরিত্রটিকে বড় সুন্দর, স্বাভাবিক ও জীবন্ত করে তুলেছেন। মায়ের কলঙ্কের জন্য মেয়ের অন্তরে যে সংশয় সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়া সরযূর প্রেম-জীবনকে সর্বদা নীরব রেখেছিল—খণ্ডিত করে দিয়েছিল তার পরিপূর্ণ যৌবনকালের জৈব আবেগকে। সরযূর চরিত্র-চিত্রণে এই অনবদ্য মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা যেন সোনার উপরে মিনার কাজ। যে বয়সে 'চন্দ্রনাথ' লেখা সেই বয়সেই শিল্পীর শক্তি অনস্বীকার্য। এই

১. শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স আট আনা দামে ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস প্রকাশের আয়োজন করেন। শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ', 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি কয়েকখানি বই এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দামের স্বল্পতা হেতু এই প্রচেষ্টা খুবই সার্থকতা লাভ করেছিল।

উপন্যাসের মধ্যেই ভাবপ্রবণতা ও আবেগ একটা সুসঙ্গত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে সৃষ্টিকে বাস্তব ও সার্থক করে তুলেছে।

মোটকথা, সমাজবোধের দিক থেকে 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে শরৎ-চেতনার প্রকাশ বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। 'মায়ের অপরাধে কন্যার সম্ভাবনাময় জীবন ব্যর্থ হওয়া অন্যায়, এই অভিমত পাঠকের তথা সমাজের সম্মুখে রাখবার দৃঢ়তা শরৎচন্দ্র 'চন্দ্রনাথ'-এ দেখিয়েছেন। চন্দ্রনাথের প্রেম এই উপন্যাসের অনেকখানি জুড়ে আছে। সে এ যুগের নায়ক নয়। সে সমাজের বিরুদ্ধে সোজাসুজি বিদ্রোহ করে নি। তবু সরযূর প্রতি চন্দ্রনাথের ছিল অসীম ভালবাসা ও দরদ। সরযূ নির্বাসনের পর সে নিজেকে সত্যিই অপরাধী মনে করেছে আর সংসারের সমস্ত ভোগসুখ থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কাশীতে গিয়ে আবার পরিত্যক্তা সরযূকে গ্রহণ করেছে। তার মহত্ত্ব এই যে আত্মীয়-আত্মীয়াদের অনুরোধ সত্ত্বেও চন্দ্রনাথ পুনরায় দারপরিগ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছে। এই উপন্যাসে সরযূ-চন্দ্রনাথের দাম্পত্যপ্রেমের কাহিনীর পাশাপাশি উদার হৃদয় স্নেহময় কৈলাস খুড়োর যে কাহিনীটি স্থান পেয়েছে তা কম আকর্ষণীয় নয়। এমন স্নিগ্ধ দাম্পত্যপ্রেমের কাহিনী শরৎচন্দ্র খুব বেশি লেখেন নি। এই উপন্যাসে আর একটি চরিত্র আছে—বিশু। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে এ শিশুটির যে গুরুত্বপূর্ণ মাধুর্যময় ভূমিকা, তা অনেকের মতে, শরৎ-সাহিত্যের তথা বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় সম্পদ। দাম্পত্যপ্রেমের কাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত শরৎচন্দ্র এর দ্বারা তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসে অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন।

'পরিণীতা' এমনি আর একটি দাম্পত্যপ্রেমের উপন্যাস। এটিকে উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলাই সঙ্গত। আমরা জানি শরৎচন্দ্র হিন্দুধর্মে আস্থাবান ছিলেন। তথাপি 'হিন্দু-ব্রাহ্ম বিরোধের যুগে রুচিমান, উদার হৃদয়, ব্রাহ্ম যুবক গিরীনকে আঁকিয়া তাহার উদ্দেশে ধনী সন্তান শিক্ষিত হিন্দু যুবক শেখরকে নতি জানাইতে শরৎচন্দ্র উৎসাহিত করিয়াছেন।...নায়িকা ললিতার স্বামী-সংস্কারের গৌরব

এবং গোপনে হইলেও যাহাকে সে স্বামীরূপে মাল্যদান করিয়াছে তাহার স্মৃতি সম্বল করিয়া সহস্র দুঃখ সহ্য করিবার দৃঢ়সংকল্প এই মধুর উপন্যাসটিতে অতিরিক্ত সুরভির সঞ্চার করিয়াছে।'

'বিরাজবৌ' যদিও পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি নয়. তবু এই স্বল্পায়তন উপন্যাসটির মধ্যে বিকাশমান প্রতিভার পরিচয় খুবই প্রত্যক্ষ। যে চরিত্র বিশ্লেষণ, গভীরতা ও সূক্ষ্ম রসবোধ শিল্পীকে প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টায় পরিণত করে, 'বিরাজবৌ'-র মধ্যে তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন ব্যক্তিজীবন-সংগ্রাম, পৃথিবীতে ব্যক্তি-সংঘাতের কারণ। প্রাক্‌যৌবনের ভাবপ্রবণতা তখন মন্দীভূত হয়ে এসেছে, অন্তর্দৃষ্টি গভীরতর হয়েছে, কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসে নাটকীয়তার প্রতি মোহটা সম্পূর্ণ কাটে নি।

নীলাম্বর-বিরাজের করুণ কাহিনীই উপন্যাসটিকে সজীব করে তুলেছে। শত ত্রুটির মধ্যেও নীলাম্বর তার সেবাধর্ম ও উদারপ্রাণ ধর্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বড় হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে তার কনিষ্ঠ সহোদর পীতাম্বরের কাছে অর্থবিত্তই জীবনের কাম্য, জীবনের মূল্য বলে স্বীকৃত হতো। পতিপরায়ণা সাধ্বী যে বিরাজবৌ, নেশাখোর স্বামীকে রেখে ক'দিনের জন্যও অন্যত্র যেতে পারত না, সেই বিরাজবৌকে দারিদ্র্য ও নিষ্ঠুর ঘটনাচক্রে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। বিরাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার মানসিক পরিণতি শিল্পীর বিশ্লেষণে অপূর্ব সূক্ষ্ম রসসৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। অপার সহিষ্ণুতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও তার ব্যক্তিত্ব ম্লান হয় নি, কিন্তু নীলাম্বরের অবিশ্বাস ও ভুল বোঝার মধ্যেই তার সতীত্ব-বুদ্ধি আহত হয়ে তার অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। সতীত্বের গর্বই তাকে জীবনে মরিয়া করে তুলেছিল' করে তুলেছিল স্বামী গৃহত্যাগিনী। এছাড়া বিরাজের প্রবল হৃদয়-দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

চরিত্র-চিত্রণের এই গভীরতা ও সূক্ষ্মতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী শরৎচন্দ্রকে আমরা দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট —কতকটা যেন শৈবলিনীর ধাঁচে তিনি বিরাজ-চরিত্রটিকে গড়েছেন ;

তাইতো শরৎচন্দ্র বলেছেন, বিরাজের মরাই উচিত ছিল কিন্তু সে মরিল না।···মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল। সমাজ-বিরোধিতা করা বা তাকে ভেঙে নতুন করার প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল না। লেখকের এই সমাজ-সচেতনতা তাই বিরাজকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করেছে। ফলে এই উদ্দেশ্যমূলক অভিপ্রায় শিল্পীর একটি মহান সৃষ্টিকে অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে।

'বিরাজবৌ' শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ এর প্রকাশ কাল ১৯১৪ সালের মে মাস। রেঙ্গুনে অজ্ঞাতবাস কালের রচনা এই উপন্যাসটির মধ্যে গল্পে ও আখ্যান-বিন্যাসে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার পরিচয় আছে; ঔপন্যাসিক তখন অনেকটা দক্ষতা অর্জন করেছেন। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত গ্রামীণ পরিবারের ভাঙনের রূপ নীলাম্বর ও পীতাম্বর—এই দুটি বিপরীতমুখী চরিত্রের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসে যৌথ পরিবার প্রথার জন্য লেখক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পীতাম্বরের মৃত্যু ঘটিয়ে তার স্ত্রী মোহিনীকে নীলাম্বরের পরিচর্যার জন্য এক সংসারে রেখে লেখক এই পরিবারটিকে যৌথ পরিবার হিসেবেই টিকিয়ে রেখেছেন। 'মানুষের সহস্র সুবুদ্ধি ও শুভেচ্ছা থাকিলেও দৈব শত্রুতা করিলে মানুষ যে কিভাবে নিজেকে বিপন্ন করিয়া ফেলে এবং রাগের মাথায় মানুষ কত অন্যায় করিয়া শেষ পর্যন্ত অনুশোচনার মর্মদাহে পুড়িয়া মরে, সতী সাধ্বী বিরাজের দুঃখময় জীবন-কাহিনী পড়িলেই তাহা বুঝা যায়।'[১]

এই উপন্যাস সম্পর্কে একজন বিদগ্ধ সমালোচক এই অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ 'বঙ্কিমের যুগে পতি-পত্নীর সুখময় মিলনই ছিল সাধারণ নিয়ম; বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্যই ছিল ব্যতিক্রম। আধুনিক যুগে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে বিরোধের বীজ ওতপ্রোতভাবেই উপ্ত দেখান হয়; দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই যেন উহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। স্থায়ী

১. শরৎ-চেতনা ঃ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্ধনমাত্রেই আনে অতৃপ্তি ও বন্ধনচ্ছেদের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা—দাম্পত্য শান্তি ঝটিকার ক্ষণবিরতি মাত্র, এক অনিশ্চিত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ভার-সাম্যের উপর নির্ভরশীল। শরৎচন্দ্র নীলাম্বর ও বিরাজের আদর্শ ও ঐকান্তিক প্রেমমূলক দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা দিয়া বঙ্কিমের ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন।'[১]

'পল্লীসমাজ' শরৎচন্দ্রের একটি বহুল পঠিত জনপ্রিয় বই। গ্রামীণ সমাজের ক্লেদাক্ত জীবনের এই চিত্র একদিকে সত্যধর্ম, অন্যদিকে অর্থহীন সংস্কারের কদর্যতাকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছে। সমাজের বিরোধিতা করা বা তাকে ভেঙে নূতন করার প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল না, তিনি সমাজকে উদারতর হতে আহ্বান করেছিলেন। তাই 'পল্লীসমাজ'-এ বিশ্বেশ্বরী যে কথা বলেছিলেন ('সমাজ যাই হোক তাকে মান্য করতেই হবে; নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না।') তা শরৎচন্দ্রেরই মনের কথা।

দেবানন্দপুর জীবনে যে সমাজ তিনি দেখেছিলেন, এই উপন্যাস তারই নিখুঁত চিত্র। সেই পল্লীসমাজ তাঁর চক্ষে যেন এক বিবর্ণ বিকৃত শবদেহের ছবি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এরই সঙ্গে রমেশের মাধ্যমে সংঘাত হয়েছে নূতন যুগের সঙ্গে। নূতম যুগের স্রোত নিভৃত, ক্ষয়িষ্ণু গ্রামে এসে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, শরৎচন্দ্র সেই আবর্তেরই চিত্র এঁকেছেন—সঠিকভাবে, স্বাভাবিকভাবে। এই আবর্তের অন্তরালে ফল্গুধারার মত একটি বালবিধবা ও একটি তরুণের অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়ের কাহিনীও ঘটনার সঙ্গে আবর্তিত হয়েছে। বিরুদ্ধতা ও বিক্ষোভের মাঝে, শত্রুতা ও সম্ভ্রমবোধের মাঝে তাদের হৃদয়ের অন্তস্তল ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়েছে শিল্পীর অপূর্ব যাদুদণ্ড স্পর্শে। আপাত-সংঘাতের মধ্যে রমা ও রমেশের প্রেম-জীবনের প্রকাশই শরৎচন্দ্রের শিল্পচাতুর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই বিশ্লেষণ, এবং অকথিত, অপ্রকাশ্য প্রেমের প্রকাশভঙ্গী নিঃসন্দেহে এক পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি।

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'তাঁহার পল্লীসমাজ উপন্যাসে দেখা যায়, নায়ক রমেশ স্বগ্রাম হিন্দু-প্রধান কুঁয়াপুর ছাড়িয়া মুসলমান-প্রধান পীরপুর গ্রামে জন-সেবার কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছে। 'পল্লীসমাজ'-এ একাধিক স্থানে হিন্দুদের দলাদলি, স্বার্থপরতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতার বিপরীতে মুসলমানদের একতা, নিষ্ঠা ও আদর্শবোধের তুলনামূলক সুখ্যাতিই করা হইয়াছে। আকবর সর্দার জমিদার বেণী ঘোষালের লোক, সে দাঙ্গায় রমেশের লাঠির ঘায়ে জখম হইয়াছে, কিন্তু বেণী যখন তাহাকে রমেশের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে যাইতে বলিয়াছে, সে ফরিয়াদী হইয়া রমেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে রাজী হয় নাই। বেণী রাগিয়া তাহাকে যখন বেইমান বলিয়া গালি দিয়া উঠিল। আত্মসম্মান আহত হওয়ায় আকবর সর্দার সঙ্গে সঙ্গে রুখিয়া দাঁড়াইল। কর্কশ কণ্ঠে বেণীকে আকবর বলিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে সব সইতে পারি, ও পারি না।'

এই চিত্রটির মাধ্যমে লেখক অতি সুন্দরভাবেই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলে উপন্যাসের কাহিনীকে একটি বিরল তুঙ্গতায় তুলে ধরেছেন। তেমনি এই উপন্যাসটির বিশ্বেশ্বরী চরিত্রটির মাধ্যমে আমরা নারীর মনের একটি স্নিগ্ধ দিক দেখতে পাই। সেটা হলো নারীর স্নেহের দিক—অপত্য স্নেহের দিক। নিজের ছেলের বেলায় হোক অথবা পরের ছেলের বেলায় হোক নারীর অপত্য স্নেহের চিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন—একথা শরৎ-সাহিত্য পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। যেখানে এই অপত্যস্নেহ বিতরিত হয়েছে, শরৎ-সাহিত্য সেখানেই মধুর হয়ে উঠেছে। এই মাধুর্য যেন নিজের ছেলের চেয়ে পরের ছেলের বেলায় আরো বেশি। এই উপন্যাসের গোড়ার দিকে বিশ্বেশ্বরীর মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ তাঁর নিজ পুত্র বেণী অপেক্ষা দেবর-পুত্র রমেশ ও সম্পর্কিত দেবর-কন্যা রমার উপর কি রকম অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছে তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিস। এই উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চরিত্রসৃষ্টির জন্য এবং রমাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলবার সুবিধা হবে মনে করে

শরৎচন্দ্র বিশ্বেশ্বরীকে এমন মহীয়সী করে এঁকেছেন। কিন্তু অনেকের মতে এই চরিত্রটি 'সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত হইতে পারে নাই।'

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ্য ঃ এই উপন্যাসে রমা ও রমেশকে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করায় কোন কোন পাঠক ক্ষুণ্ণ হন। এ সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের নিজের বক্তব্য এইঃ 'উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হলো এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানুষের রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকু যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি তো তার বেশি আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হয়ে যেত।'[১]

॥ বাইশ ॥

'Charitrahin creating alarming situation'.

'যমুনা' পত্রিকায় যখন 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের মাত্র কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তখন এর সম্পাদকের কাছ থেকে শরৎচন্দ্র একদিন এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন। তখন তিনি রেঙ্গুনে। আজ আমরা কিছুতেই কল্পনা করতে পারব না, কি আলোড়নই না জাগিয়েছিল শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসটি যখন এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য-সংসারে এমন ঘটনা আগে বা পরে

১. স্বদেশ ও সাহিত্য ঃ শরৎচন্দ্র

আর কখনো কোন উপন্যাসকে কেন্দ্র করে ঘটে নি। একদা ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সমাজে ঠিক এমনি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল ডি. এইচ. লরেন্সের 'লেডি চ্যাটারলিজ লভার' নামক উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে। উপন্যাস দুটি প্রায় সমসাময়িক।

এই বই সম্পর্কে গ্রন্থকার স্বয়ং 'যমুনা'-সম্পাদককে একটি পত্রে লিখেছিলেন : 'শুনিতেছি, 'চরিত্রহীন'-এ 'মেসের ঝি' থাকাতে রুচি নিয়ে হয়তো একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না কেন, যারা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশি পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে।' নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে কি গভীর আত্মবিশ্বাসই না ছিল শরৎচন্দ্রের। বন্ধু প্রমথনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'আমি এখনো স্বীকার করি না 'চরিত্রহীন'-এ এক বর্ণও immorality আছে।……ওটা বটতলার বই নয়। আমি যা-তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না, গোড়া থেকে উদ্দেশ্য করে লিখি, তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়া যায় না।' এই উপন্যাসের সার্থকতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এমনই সুনিশ্চিত ছিলেন যে, 'যমুনা'-সম্পাদককে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 'আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না।…আর moral হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, হ্যাঁ, একটা লেখা বটে।' 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে লেখকের এই আত্মবিশ্বাস পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছিল। 'সাড়ে তিন টাকা দামের বই প্রথম দিনেই চারশো কপি বিক্রী হয়ে যায়।'

চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনি শরৎচন্দ্রের লেখার এই একটা বিশেষ গুণ যে তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের চিত্তকে টেনে নেয়—প্রবলভাবেই টেনে নেয়। এই রহস্যের সন্ধান মেলে তাঁরই একটি কথার মধ্যে : 'কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, আমার সাহিত্যে সেটাই ফুটে উঠেছে বারংবার,

আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারেও।' ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, তাঁর যৌবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও শক্তি দিয়ে পাঁচশো পৃষ্ঠার যে উপন্যাসখানি তিনি লিখেছিলেন তার প্রথম পাণ্ডুলিপিখানি আগুনে পুড়ে যায় এবং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে তিনি বইটি আবার নূতন করে লিখেছিলেন। নিঃসন্দেহে এ এক অসাধ্যসাধন। রেঙ্গুনে থাকবার সময়েই তাঁর সম্পর্কে অপবাদ রটেছিল যে তিনি চরিত্রহীন। এ অপবাদ তিনি মাথায় পেতে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি, কারণ তিনি নিজের কাছে কতখানি খাঁটি ছিলেন শরৎচন্দ্র ভিন্ন সে কথা আর কেউ জানত কিনা সন্দেহ। তাইতো পরিহাস করে বন্ধুকে লিখেছিলেন : 'এটা চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন—তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে।'

শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বেশি আলোচিত উপন্যাস 'চরিত্রহীন'। প্রবল বিতর্কের ঝড় উঠেছিল এই বইটিকে উপলক্ষ করে। 'চরিত্রহীন' তাঁর পরিণত প্রতিভার প্রথম দান। চরিত্র কল্পনায়, ভাষা ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্যে এবং আখ্যান বিন্যাসে এই উপন্যাসে পরিণত প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। তাই এই উপন্যাস সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করব।

'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি।

চিন্তার দৃঢ়তায় ও কল্পনার সাহসিকতায় অনন্যসাধারণ।

মনস্তত্ত্ব সমন্বিত মানব-চরিত্রের এক উজ্জ্বল আলেখ্য এই উপন্যাস।

এর দুই তট দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সিদ্ধরস। সেই রসে আগাগোড়া অভিসিঞ্চিত এর কাহিনী। 'চরিত্রহীন' রেঙ্গুনের ছন্নছাড়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অভিজ্ঞতার পরে এবং বিদেশী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াশুনার পরের লেখা। কথিত আছে, এটি লিখবার আগে তিনি বহু কুলত্যাগিনী নারীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন।

এই উপন্যাস লিখিবার আগে শরৎচন্দ্র একদিকে স্পেন্সারের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত, অন্যদিকে রুশ সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। আর্ট সম্পর্কে টলস্টয়ের ধারণাও হয়তো তাঁর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। না করলেও তাঁর রচনা যাতে সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী না হয় সেদিকে শরৎচন্দ্র বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। ডিকেন্সের উপন্যাসও তিনি তার আগে সযত্নে পাঠ করেছেন। ডিকেন্স ও শরৎচন্দ্র দুজনেই ছিলেন সেই যুগের মানুষ যখন সমাজ-জীবনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি-জীবনে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রবল সংঘাত।

'চরিত্রহীন' এই সংঘাতের অনুপম কাব্য।

মানুষের বিচিত্র জটিল প্রেমজীবনের আলেখ্য।

বিচিত্র এই মানবমন, তার বিশেষ চিত্তবৃত্তি নিয়ে জগতের প্রান্তরে সৃষ্টি করেছে সংঘাত। বেদনা আনন্দ দুঃখেই তো জীবন-বৈচিত্র্য। এই সংঘাত-জর্জর মানব-অন্তরের চিরন্তন বেদনা ফুটে উঠেছে শরৎচন্দ্রের এই জীবনচিত্রণে। একদিকে সাবিত্রী-সতীশ-সরোজিনী, অন্যদিকে সুরবালা-উপেন্দ্র-কিরণময়ী আর কিরণময়ী-দিবাকর। সাবিত্রীর প্রেম কল্যাণময়—যে প্রেম তার প্রেমাস্পদের মঙ্গলেই প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করে; সুরবালার স্বামীপ্রেম সীতা-সাবিত্রীর চিরন্তন আদর্শগত জৈবাবেগহীন আত্মনির্ভরতা, আত্মসমর্পণ: কিরণময়ীর প্রেম জৈবাবেগ প্রদীপ্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম—এই সংগ্রামের মধ্যে উপেন্দ্র নৈতিক শক্তির প্রতীক, নীতিবাদের প্রতীক। উপেনের জীবনবোধের তুলাদণ্ডে বিচার হয়েছে অন্যের জীবন—মৃত্যুর পূর্বে সংস্কারবর্জিত উপেন সত্যের মাপকাঠিতে বিচার করেছে ধর্ম ও মনুষ্যত্বকে—বিশুদ্ধ প্রেমকে।

সাবিত্রী মেসের সামান্যা ঝি হলেও তার স্রষ্টার অন্তরসুধাসিক্ত একটি অনবদ্য চরিত্র। দাসী, তবু তার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই? দেখি তার মধ্যে তথাকথিত ঝি-শ্রেণীর সংকীর্ণ বা নীচ হীন মনোভাব অথবা দাসীবৃত্তির লেশমাত্র নেই, বরং মাতৃসুলভ একটা

সেবাবৃত্তি ও নিষ্পলক সতর্কতা সর্বদাই কল্যাণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। নারীত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত একটা সুন্দর মাতৃরূপ,—সেবাবৃত্তির মাঝে তার প্রেমের প্রকাশ ভারতীয় চিত্তেরই দান। আজকের এই প্রখর সাম্যের যুগে নারী পুরুষের সঙ্গে সাম্য দাবী করেও সেবাবৃত্তিহীন নারীত্বকে গ্রহণ করে নি। সতীশ সাবিত্রীর প্রাথমিক হাস্য-পরিহাস, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ও অসমীচীন ব্যবহারের মধ্যে আকস্মিকভাবে সাবিত্রী প্রথম প্রেমের স্বাদ লাভ করল এবং সেই প্রথম প্রেমের পরিচয় হলো তার আত্মসংযমে। এই যে আত্মসংযত ও শুচিশুভ্র প্রেমের কল্যাণ-রূপ, এটাই তো সতীশের চারপাশে দেখা দিয়েছিল কঠোর হিতৈষণা ও মঙ্গলেচ্ছারূপে। এই প্রেম চায় নি কিছু। শুধু দিতেই চেয়েছে—এই দেওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দে সেই নারী চেয়েছে শুধু পূর্ণতা। সেইজন্য সাবিত্রীর রূপের কোন বর্ণনা লেখক দেন নি; তবে বেহারীর মুখের কথায় বোঝা যায় সাবিত্রী অন্ততঃ কুরূপা নয়।

সাবিত্রীর কল্যাণধর্মী প্রেমই প্রতিহত করেছে সতীশের লালসা ও আসক্তিকে তারই জন্যে, তারই শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে। বলা বাহুল্য, সাবিত্রীর এই কঠোর আত্মসংযম তাকে পাঠকের চক্ষে মহীয়সী করে তুলেছে—নিজের জীবনকে রিক্ততায় নিঃশেষ করে সতীশের জীবনকে সে পুষ্পিত করতে চেয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে কলঙ্ককে সে কলঙ্ক বলে মানে নি; অপমান, অমর্যাদা ও বেদনার অশ্রুকে সংবৃত করে স্বেচ্ছায় সে সরে দাঁড়িয়েছে সতীশের জীবন থেকে। অথচ অজ্ঞাতবাস থেকে কল্যাণ কামনা বর্ষিত হয়েছে অঝোরে,—রোগে, শোকে সে সমস্ত ত্যাগ করে ছুটে এসেছে সতীশের পাশে। তার প্রেম, তার জীবনের সমস্ত চাওয়া ও পাওয়াকে, তার অন্তরের আবেগকে কঠোর সংযমে সে নির্দ্বিধায় নিবিষ্ট করেছে সতীশের মঙ্গলের জন্য। 'আমি তো জানি শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না'—তার মুখের এই একটিমাত্র কথার মধ্যেই আভাসিত হয়েছে সাবিত্রী-চরিত্রের স্বরূপ।

কিন্তু আরো আছে। সাবিত্রীর কঠোর আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, প্রেমাস্পদের জন্যেই। তার ত্যাগ, তার ঐকান্তিক সেবাধর্ম, তার আত্মাভিমানশূন্য আত্মসমর্পণ যেদিন মরণাপন্ন সতীশের শয্যাপার্শ্বে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো সেইদিনই উপেন্দ্রের ভগ্নী হিসাবে তার নৈতিক জয় সগৌরবে ঘোষিত হলো। সমাজ-সংস্কারের উর্ধ্বে প্রেমের কল্যাণরূপকে, কুলত্যাগিনী সাবিত্রীর অন্তর-শুচিতাকে স্বীকৃতি দিয়ে উপেনই মানবতার জয় ঘোষণা করল। এটাই মহত্তর স্বীকৃতি, কারণ এই উপেনই একদিন ঘৃণার বিষবাষ্পে তাকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র মিথ্যা আস্ফালন করেন নি: "চরিত্রহীন যাতে in the strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করব।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই উপন্যাসে বর্ণিত পুরুষ-চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র সতীশ-চরিত্রটি একটা অনাবিল প্রসন্নতায় পাঠকচিত্তকে পরিতৃপ্ত করে।

এবার কিরণময়ীর কথা।

চরিত্রটি জটিল—বাংলা সাহিত্যে নূতন এবং অত্যদ্ভুত সৃষ্টি।

বিশ্বের কথাসাহিত্যেও বোধ করি ঠিক এমনি একটি নারী-চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না। এই চরিত্রটি ঠিক বাঙালী ঘরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-বহ নয়,—সংস্কারমুক্ত জৈবাবেগ সমৃদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে শক্তিময়ী একটি নারী-চরিত্র। এ-কথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা যায় যে, শরৎচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বীক্ষণশক্তি দস্তেয়ভস্কির মতো ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পূর্বেই অচেতন মনের একটা স্বরূপ উপলব্ধি করেছিল। কিরণময়ী-চরিত্র যেন অচেতন মনচালিত একটি চিত্তবিকারগ্রস্ত নারী। তার জৈবাবেগ ও কাম-চেতনা ব্যাহত হয়ে, খণ্ডিত হয়ে, তার অচেতন মনে বিকৃতির সৃষ্টি করেছিল। এই বিকৃতিচালিত কিরণময়ী-চরিত্র তাই অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত, সামঞ্জস্যহীন কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব, স্বাভাবিক ও তেজদৃপ্ত।

শরৎ-সাহিত্যে প্রধান নারী-চরিত্রগুলি সবই প্রায় একরূপ।

তাদের জীবনের দুই তট দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সুগভীর দুঃখের উত্তাল প্রবাহ।

কিন্তু দুঃখকে এরা দুঃখ বলে গ্রাহ্য করে নি।

অথচ এরই মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-দৃপ্ত রূপটি।

এইখানেই শরৎ-প্রতিভার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কিরণময়ীর কথা আরো একটু বলতে হয়, কারণ 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণই হলো চরিত্রহীনা এই নারী। অথচ কি বলিষ্ঠ এই নারী-চরিত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'অত্যন্ত অশ্লীল'[১] এই উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয় ছিল এবং এর সম্পর্কে কেউ যদি বিরূপ সমালোচনা করত তাহলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। এ নিয়ে তিনি অনেকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক পর্যন্ত করেছেন।[২] এর পরেও আরো কয়েকখানি উপন্যাস আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এবং তার প্রত্যেকটি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তথাপি 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎ-প্রতিভার যে নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল তাকে আমাদের নিরীক্ষণ করতে হবে সেই মন দিয়ে যা সকল রকম সংস্কারের আবিলতা থেকে মুক্ত। টলস্টয়, ফ্লবেয়ার, জেমস্ জয়েস ও ডি. এইচ. লরেন্স প্রভৃতি সৃজনধর্মী ঔপন্যাসিকগণের সৃষ্টির মধ্যে যে সুগভীর মনন ও মানসিক শৃঙ্খলাবোধ পরিলক্ষিত হয়, শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে আমরা ঠিক সেই জিনিসই প্রত্যক্ষ করি। নতুবা তাঁর লেখনী থেকে আমরা 'চরিত্রহীন'-এর মত উপন্যাস পেতাম না। এই বহুনিন্দিত ও বহু আলোচিত উপন্যাসখানি বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয়-মন দিয়ে যাঁরা পাঠ করবেন তাঁরাই বুঝবেন যে: 'Every masterpiece is the product of long training and discipline—it is not produced casually, on the spur of the moment'. শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টি বলতে বাধা কোথায়?

১. ভারতবর্ষ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ 'চরিত্রহীন' অত্যন্ত অশ্লীল মনে করে অমনোনীত করেন।

২ শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য: সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সৌন্দর্যের প্রতিমা কিরণময়ী। 'নইলে তোর রূপটা কি সোজা রূপ, বৌ?'—এই একটি কথায় কিরণময়ীয় রূপেব যে বর্ণনা শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর লেখনীতে সম্ভব। এই রূপ দেখেই পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট হয়েছিল অনঙ্গ ডাক্তার। কিন্তু রূপই তো তার সব নয়, তাকে বিদুষীও বলা চলে। তার সুপণ্ডিত স্বামীর কাছে সে যে বিদ্যা অর্জন করেছিল তা যে বড় কম নয়, সেটা তার কথাবার্তার মধ্যেই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কিরণময়ীর রূপ ছিল দাহকারী, বুদ্ধি ছিল হীরকোজ্জ্বল। কিন্তু এই নারী ছিল প্রেম-বঞ্চিতা এবং সেই কারণেই এক উদ্দাম জৈবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার জীবনটা যেন অর্থহীন হয়ে গেল। এমন ট্র্যাজিক চরিত্র শরৎচন্দ্র আর দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে নি। কিরণময়ীর বিপরীতে সুরবালাকে রেখে, লেখক এই সত্যটাই পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন : প্রেমই জীবনের পথচলায় বড় শক্তি এবং একমাত্র প্রেমই চঞ্চল মনকে প্রশান্ত করতে পারে। সুরবালার স্নিগ্ধ প্রেমগঙ্গায় অবগাহনকারী উপেন্দ্রের জীবনে তা প্রমাণিত হয়েছে।

কিরণময়ীর মধ্যে কি প্রেম ছিল না?

নিশ্চয়ই ছিল। তবে তার প্রেমের তীব্রতা প্রচুর, প্রেমের অপমানে প্রতিশোধ-গ্রহণেচ্ছা তার যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি বিস্ময়কর। উপন্যাসে যখন তাকে আনা হয়েছে, তখনই কিরণময়ীর অন্তর সংসারের হীনতার ও উদাসীনতার চাপে আহত, মন তার অনেকখানি ভেঙে গিয়েছে। সে কঠিন মাটিতে ভিত গাঁথতে চেয়েছিল, কিন্তু উপেন্দ্রকে তার আদর্শগত জীবনবোধ থেকে নিজের আয়ত্তে নামিয়ে আনা এই প্রেম-বঞ্চিতা নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপন্যাসের পরিণতিতে সংগ্রামে সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত কিরণময়ীর মন ভারসাম্য হারিয়েছে, সে পাগল হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে আমরা শৈবলিনীকে পাগল হতে দেখেছি। কিরণময়ীকেও দেখলাম। কিন্তু দুজনের পাগল হওয়ার চরিত্র আলাদা। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হবে দুজনেই পাগল হয়েছে পরপুরুষকে ভালবাসার মতো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। কিন্তু

শরৎচন্দ্র তাঁর পূর্বসূরীকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক যথার্থই লিখেছেন :

'শৈবলিনীর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্রতাবাদী সামাজিক মনটি যেমন প্রত্যক্ষভাবে আগাইয়া আসিয়াছে, কিরণময়ীর ক্ষেত্র তাহা ঠিক হয় নাই। কিরণময়ী-চরিত্রের জটিলতার সঙ্গে তাহার প্রেমের উগ্রতার সঙ্গে এবং প্রেমের আশ্রয়ের কাঠিন্যের সঙ্গে তাহার উন্মাদ হইয়া যাওয়ার উপন্যাসের উপযোগী কার্যকারণ সামঞ্জস্য অনেক বেশি রক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিরণময়ীর সমগ্র চরিত্রে শরৎচন্দ্র এমন বিস্ময়কর একটি স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বলতা রাখিয়াছেন, যাহা শুধু শরৎ-সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই দুর্লভ। উপেন্দ্রের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে কিরণময়ী যে পর্যায়ে উঠিয়াছে, তাহা সাধারণ নারী-চরিত্রের পক্ষে কল্পনাতীত। এই অভিনব রসসৃষ্টির দৃষ্টান্তটি শরৎচন্দ্রকে আধুনিক কালের লেখকরূপে চিহ্নিত করিয়াছে সন্দেহ নাই।'[১]

কিরণময়ী চরিত্রটির ব্যাখ্যা লেখক নিজেই করেছেন। এক সাহিত্য-সভায় একজন পাঠক শরৎচন্দ্রকে বলেন, আপনি মুখে যাই বলুন, আপনার লেখা পড়ে মনে হয় আপনি সনাতনধর্মের মর্যাদাহানি করতে চান নি। এই বলে তিনি আরাকানগামী জাহাজের কেবিনে দিবাকরের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেও কিরণময়ীর নিজের দেহকে নষ্ট না হতে দেওয়ার দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করেন এবং শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, এর পরেও কি বলব আপনি সনাতনধর্ম মানেন নি? আপনার অন্তরের ধর্মবিশ্বাসটাই কি কিরণময়ীর দেহরক্ষার কারণ নয়? প্রশ্নটি বড় সহজ নয়। শরৎচন্দ্র এর উত্তরে বলেছিলেন যে, কিরণময়ীর এ-কাজ তাঁর ধর্মবিশ্বাসজাত নয়, মানবতাবোধজাত। প্রশ্নকর্তাকে তিনি বলেছিলেন : 'আপনি যা বলেছেন ওভাবে আমি কিছুই করি নি। মেয়েটি যদি দেহ নষ্টই করত তাতেও আমার কিছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ঐ চরিত্রটা একেবারে অসত্য হয়ে যেত।'

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিরণময়ী তার স্বামীর স্মৃতিকে বিস্মৃত হয়েই উপেন্দ্রকে ভালবেসেছিল। এই ভালবাসা সে কি রকম নিষ্ঠার সঙ্গে লালন করেছে তা দিবাকরের সঙ্গে দেহগত পবিত্র সম্পর্ক রক্ষা করা ছাড়াও শরৎচন্দ্র অন্যভাবে দেখিয়েছেন। কামিনী বাড়িউলি যখন তার ঘরে মারোয়াড়ী খরিদ্দার ঢুকিয়ে দিলে এবং কিরণময়ীকে 'বেবুশ্যে' সংজ্ঞা দিয়ে অপমানিত করল তখনকার সেই চিত্তস্পন্দী দৃশ্যটি শরৎচন্দ্রের লেখনীমুখে এইভাবে ফুটেছে :

'কিরণময়ী চিৎকার করিয়া উঠিল, কি আমি? আমি বেশ্যা?

'তাহার মনে হইল, বজ্রাগ্নি-রেখা তাহার পদতল হইতে উঠিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া বুঝি বাহির হইয়া গেল।...কিরণময়ীর স্নায়ুশিরার সহিষ্ণুতা ইস্পাতের অপেক্ষাও দৃঢ়, তাই এতক্ষণ পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না। তাহার রূপ-যৌবনের এই অপরিচিত হিন্দুস্থানী খরিদ্দারের গৃহ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে চৈতন্য হারাইয়া বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।' এইভাবে অপমানিত হওয়ার প্রতিবাদের উত্তেজনায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মধ্যেই কিরণময়ীর জীবন-সত্য—উপেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা—চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নিন্দা করেছিলেন তাঁরা এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেন নি বলেই তো শরৎচন্দ্রের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। আসল কথা, 'শিল্পের জন্য শিল্প' (Art for art's sake)—এই নীতিতে আস্থা স্থাপন না করে, হিতবাদী সাহিত্যধর্মের আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে শরৎচন্দ্র লেখনী চালনা করেছিলেন। সমাজের কল্যাণসাধনে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি সমাজের অনেক ক্ষতস্থান উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের আরো একটি দিক আছে যা আলোচনা করা দরকার। একমাত্র পুত্র হারাণের অসুখের সময় পুত্রবধূ সম্পর্কে তার মা অঘোরময়ীর মনোভাবে এই দিকটা পরিস্ফুট হয়েছে। 'তাঁহার পুত্র মৃত্যুশয্যায়, এই সময়ে কিরণময়ীর সঙ্গে অনঙ্গ ডাক্তারের যে

ঘনিষ্ঠতা চলিতেছিল অঘোরময়ী তাহা লক্ষ্য করেন নাই এমন নয়। কিরণময়ী ভ্রষ্টা হইয়া যাওয়া মানে তাঁহার পারিবারিক মর্যাদা ধূলায় লুটাইয়া যাওয়া। বিশেষ করিয়া হারাণ যখন মরণাপন্ন, তখন পুত্রবধূর এই পরপুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতার ক্লেদাক্ত দিক আরও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। তবু সব জানিয়া শুনিয়াও অঘোরময়ী প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। শুধু প্রতিবাদ করিতে পারা নয়, যেহেতু অনঙ্গ ডাক্তারের বাসনা পরিপূরণের একটা আর্থিক দিক আছে এবং ডাক্তারের দেওয়া সেই টাকায় অঘোরময়ীর সংসার বহুলাংশে চলে, নিরুপায় অসহায়তায় মনুষ্যত্ববোধ বিসর্জন দিয়া অঘোরময়ী পুত্রবধূকে এই নোংরা কাজে উৎসাহই দিয়াছেন। স্বামী তাহার কঠিন রোগগ্রস্ত. তাহার পক্ষে পরপুরুষের মনোরঞ্জন কিরূপ হীনতার তাহা বিদুষী কিরণময়ীর অজানা নয়। কিরণময়ী স্বামীকে যত কমই ভালবাসুক এবং তাহার দেহের ক্ষুধা যত তীব্রই হউক, এই করুণ পরিস্থিতিতে সাজিয়া-গুজিয়া অনঙ্গ ডাক্তারের মনোরঞ্জনে সে এক সময়ে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়াই উঠিয়াছিল। কিন্তু অঘোরময়ী তাহাকে পাঁক হইতে উঠিয়া আসিতে দিলেন না। সামাজিক মূল্যবোধের দিক হইতে অঘোরময়ীর এ আচরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক হইতে চরম আর্থিক অনটনের ক্ষেত্রে মানুষ সততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে তাহার সমস্ত মূল্যবোধ কিভাবে ভাঙিয়া দিতে পারে, অঘোরময়ীর এই ব্যবহার তাহার কঠিন দৃষ্টান্ত।'[১]

মুমূর্ষু স্বামীকে রোগশয্যায় ফেলে রেখে, অনঙ্গ ডাক্তারকে নিয়ে ভালবাসার স্বাদ মিটোতে কিরণময়ীকে কী জঘন্য পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হতে হয়েছিল উপেন্দ্রর কাছে সে কাহিনী অকপটে ব্যক্ত করতে প্রেম-বঞ্চিতা এই নারী বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে কিরণময়ীর এই মর্মদাহী স্বীকারোক্তি পাঠকচিত্তকে সহজেই অভিভূত করে ফেলে। তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম: 'কত বৎসরের দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা আমার এই বুকের

১ শরৎ-চেতনা: বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাঝখানে জমাট বেঁধেছিল বলেই এমন অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছিল। কি জানো ঠাকুরপো, যে তৃষ্ণায় মানুষ নর্দমার গাঢ় কালো জলও অঞ্জলি ভরে মুখে তুলে দেয়, আমারও ছিল সেই পিপাসা। কিন্তু সে খবর পেলাম সেই জল গলায় ঢেলে দিয়ে···তারপরে আসক্তি-ঘৃণার, তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার অবিশ্রাম সংঘর্ষে যে গরল অহরহ উঠতে লাগল ঠাকুরপো, দেব-দানবের নিষ্ঠুর আকর্ষণে মন্দার-পীড়িত বাসুকিও বোধ করি ততখানি বিষ তার অত বড় মুখ দিয়ে ছাড়তে পারে নি। আমার মনে হয়, এ-বাড়ির প্রত্যেক ইট-কাঠ, দরজা-জানালা, কড়ি-বরগা পর্যন্ত বিষে নীল হয়ে আছে।'

এই বিষের জ্বালাই তো তাকে উপেন্দ্রর গচ্ছিত ধন দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে দেশান্তরী করেছিল, ঠেলে দিয়েছিল নরকে এবং অবশেষে উন্মাদ করে দিয়েছিল। শুধু উন্মাদ হওয়া নয়, কিরণময়ীর পরাজয়কে লেখক আরো মর্মস্পর্শী করে দেখিয়েছেন। যে কিরণময়ী দিবাকরকে বলেছিল, আমি ভগবান মানি নে, আত্মা মানি নে, জন্মান্তর মানি নে, সেই কিরণময়ী উপেন্দ্রের অন্তিম সময়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তিন দিন ভগবানকে ডেকেছে, আর পাগলামির সাময়িক বিরতির ফাঁকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেছে, 'আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে ঠাকুরপো, একটু খাবে? হয়তো ভাল হয়ে যাবে।' এইভাবেই তার নাস্তিক্য-দর্শনের সমাধি রচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের লেখনীমুখে কিরণময়ী চরিত্রের এই যে শোচনীয় পরিণতি দেখানো হয়েছে তার মূলে আছে একদিকে অচরিতার্থ জৈবাবেগ, অন্যদিকে অপরিতৃপ্ত প্রেম। এই-জন্যই তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য নারী চরিত্র অপেক্ষা এই কিরণময়ী চরিত্রটিই পাঠকদের সহানুভূতি বেশি করে আকর্ষণ করে। শরৎচন্দ্র তাঁর অনুভূতিশীল হৃদয় দিয়ে এই নারী-প্রতিমাটি নির্মাণ করেছেন। এই চরিত্রটি যতখানি জটিল, ততখানি কোমল; যতখানি উগ্র, ঠিক ততখানি স্নিগ্ধ। কে বলবে কিরণময়ী একজন ভ্রষ্টা নারী? কে বলবে সে চরিত্রহীনা? দেহগত পবিত্রতার বহু ঊর্ধ্বে যে মনের পবিত্রতা, সাবিত্রী ও কিরণময়ী—এই চরিত্র দুটির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন'

উপন্যাসে তাই প্রতিপন্ন করেছেন শিল্পীজনোচিত দুর্লভ দক্ষতার সঙ্গে। একটু গভীরভাবে দেখলে আমরা এই সত্যই উপলব্ধি করব যে, সাবিত্রী ও কিরণময়ী দুজনেই বদ্ধ মানবাত্মার নিষ্ফল ক্রন্দনের দুইটি ভিন্নধর্মী বর্ণাঢ্য আলেখ্য।

॥ তেইশ ॥

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে ১৯১৭ সালটি স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছরের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় 'শ্রীকান্ত', প্রথম পর্ব আর শেষের দিকে 'চরিত্রহীন'। 'শ্রীকান্ত' দিয়েই তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু। চারটি পর্বে সমাপ্ত এইটিই তাঁর বৃহত্তম উপন্যাস। এই অধ্যায়ে আমরা এই উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

'শ্রীকান্ত' চার পর্বে সমাপ্ত। পঞ্চম খণ্ড লিখবার একটা ইচ্ছা শরৎচন্দ্রের ছিল, কিন্তু তা হয় নি। ১ম ও ২য় পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে। রচনাকাল ১৯১৫-১৭ ধরা যায়। ৩য় পর্ব ১৯২৭ এবং ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩ সালে। ১ম ও ২য় এবং ৩য় ও ৪র্থ পর্বের মাঝখানে যে দশ বৎসরের ব্যবধান তার মধ্যে লেখকের জীবনে বহু পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি তখন খ্যাতিমান পেশাদার সাহিত্যিক। অসহযোগ আন্দোলন হয়ে গেছে এবং তিনি রাজনীতিক্ষেত্রেও কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছিলেন, বিশেষতঃ তখন প্রখ্যাত লেখকের চাহিদা জন্মেছে বাজারে এবং লেখকের জীবনেও এসেছে অর্থের চাহিদা। চারটি পর্বকে একটা ক্ষীণ গল্পের সূত্র পরস্পরকে গ্রথিত করলেও, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে লেখকের যে মানসলোক প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে তার বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শেষ দুই পর্ব লেখক-মানসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ এবং অনেকেই এটিকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করেছেন। এই জনপ্রিয়তার মূলে

আছে শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ ও রাজলক্ষ্মী চরিত্র তিনটি। কিন্তু 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে চরিত্রের যে সার্থক ও সুন্দর ক্রমবিকাশ ও বিশ্লেষণ ঘটনার মাধ্যমে তাকে একটি সুসংবদ্ধ উপন্যাসে পরিণত করেছে, সে সুসংবদ্ধতা ও ঘনত্ব এই 'শ্রীকান্ত'র মধ্যে আমরা পাই না। শ্রীকান্ত যেন পৃথিবীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কতকগুলি চরিত্রকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে—যাদের পরস্পর যোগাযোগে কাহিনীর গ্রন্থন ও ঘনতা ঠিক উপন্যাসের নিবিড়তায় পৌঁছতে পারে নি। ইন্দ্রনাথ একটি আশ্চর্য চরিত্রসৃষ্টি। 'জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে ক'টা লোক করিয়াছে?……এতবড় মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই।' এই মহাপ্রাণের স্পর্শই শ্রীকান্তকে হৃদয়ের মূল্য দিতে শিখিয়েছিল।

সমগ্রভাবে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দুটি নরনারীর প্রেমের কাহিনী অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। এই প্রেমে সমাজের অনুমোদন নেই এবং 'প্রধানতঃ এই কারণেই প্রেমিক-প্রেমিকা বার বার অন্তরের একান্ত আকর্ষণে কাছাকাছি আসিয়াও সামাজিক সংস্কারবশে নিজেরাই দূরে সরিয়া গিয়াছে। বাহিরের কেহ তাহাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি করে নাই, অর্থনৈতিক ও সামাজিক হিসাবে তাহারা মোটামুটি স্বাধীন, কিন্তু তবু তাহাদের নিজেদের সংস্কার ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা মনের ক্ষুধা বাস্তব সুযোগ সত্ত্বেও পূরণ করিতে পারিল না।'

'শ্রীকান্ত' নানা দিক দিয়েই শরৎ-প্রতিভার সার্থক নিদর্শন। দৃশ্য, ভাষা, বর্ণনা ও চরিত্রের আকর্ষণে এর প্রথম পর্বটি এককথায় চমৎকার। এই উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্ত আবার সে-ই উপন্যাসে বর্ণিত জীবন-রঙ্গের বক্তা ও ভাষ্যকার। চোখে সে যা দেখেছে, মনে যা অনুভব করেছে, সেইভাবেই বর্ণনা করেছে। তার মনের আলো সব কিছুর উপরই কমবেশি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সে যা দেখেছে বা যা অনুভব করেছে তার দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে। মোট কথা, শ্রীকান্ত চলমান চরিত্র, তার অনুভূতি সূক্ষ্ম আর সে নিষ্ক্রিয় থাকুক বা সক্রিয় থাকুক তার মনোরথেই তো উপন্যাসের জগৎ চলছে।

রাজলক্ষ্মী এই উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্র।

এক বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা ও ভাগ্যহীনা নারীজীবনের সংগ্রামের নিখুঁত চিত্র রাজলক্ষ্মী।

যে মাতৃত্ব ও নারীত্ব নারীজীবনে আসে একীভূত হয়ে তা-ই রাজলক্ষ্মীর জীবনে হয়েছে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী। তাইতো শরৎচন্দ্র পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও করুণা নিয়ে এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা হৃদয়বতী, মহৎপ্রাণা রাজলক্ষ্মীকে রূপায়িত করেছেন। রাজলক্ষ্মী তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চারটি পর্বে শরৎচন্দ্র চারটি জীবন্ত নারী-চরিত্রকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সেই চরিত্র চারটি হলো ঃ ১। অন্নদা-দিদি, ২। অভয়া, ৩। সুনন্দা ও ৪। কমললতা। শকুন্তলা-চরিত্রকে পূর্ণতা দেবার জন্য কালিদাসকে যেমন প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া চরিত্র দুটি সৃষ্টি করতে হয়েছিল, শরৎচন্দ্রও রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে ঠিক তাই করেছেন। এই সমৃদ্ধ চরিত্রটিকে সমৃদ্ধতর করবার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। এই চরিত্রের চলমানতা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। এই জাতীয় চরিত্রে সংকোচের জড়তা কিছুমাত্র থাকে না। বহু অভিজ্ঞতার অধিকারিণী রাজলক্ষ্মীর আত্মপ্রকাশের সাবলীলতা শরৎচন্দ্রের অনুরূপ আর একটি চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেটি হল ষোড়শী। তৃষিতা নারী রাজলক্ষ্মীর পুঞ্জীভূত যত সাধ-স্বপ্ন সবই শ্রীকান্তকে ঘিরে মঞ্জরিত হয়েছে।

মানুষের জীবনে শৈশবে কত ঘটনা ঘটে।

শ্রীকান্তের জীবনেও এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল।

খেলার ছলে শৈশবে একদিন মাল্যদানের ভেতর দিয়ে সে রাজ-লক্ষ্মীকে স্বীকার করেছিল তার বধূরূপে। সেদিন তারা পরস্পরকে সত্যিই ভালবাসত। যদি গৃহস্থ বধূরূপে জীবনযাপনের সুযোগ পেত রাজলক্ষ্মী তাহলে শৈশবের এই মালাবদল মিথ্যা হয়ে যেত, শ্রীকান্তর কথা তার স্মৃতি থেকে আপনা থেকেই মুছে যেত। 'কিন্তু কলঙ্কিত বাইজী-জীবনে পদচারণ-ক্লান্ত রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তকে

খুঁজিয়া পাইল এবং যখন সে জানিল যে শ্রীকান্ত অবিবাহিত ও পারিবারিক বন্ধনহীন তখন গোপন মনে সংসার-জীবনের জন্য' সে আবার আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের ভালবাসা আবার নূতন করে উভয়ের জীবনের পটে ফুটে উঠল। তাই আমরা দেখি, বাইজী-জীবনের ধূসরতা-শ্রান্ত রাজলক্ষ্মীর কাছে শ্রীকান্তই অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠল এবং অন্তরের প্রেরণায় ছেলেবেলার এই সাথীকেই একান্তভাবে পাবার জন্য রাজলক্ষ্মী আকুল হলো। এই দুটি নরনারী-চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা দেখা যায় তা শরৎ-প্রতিভারই পরিচায়ক। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, 'ইহারা প্রেমের আকর্ষণে অন্তরে মিলন-গ্রন্থি বাঁধিয়াও বাহিরে সংস্কারবশে কাছে আসিয়াও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই আখ্যানভাগে সমাজ-সচেতন সামাজিক নরনারীর মানসগতির চমৎকার বিশ্লেষণ দেখা যায়।'

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর কাহিনীতে মান-অভিমান আছে।

কিন্তু ট্র্যাজেডির মূল রয়েছে তাদের হৃদয়ের অন্তরতম অন্তস্তলে।

এ জিনিস সর্বকালেই মান অভিমানের অতীত। শ্রীকান্তকে পাবার জন্য রাজলক্ষ্মী আকুল হলো বটে, কিন্তু এই নারীর অন্তরে ছিল ধর্ম-সংস্কার, ছিল সমাজবোধ। ছিল একটা জীবনানুভূতি। সকলের উপর সে বুদ্ধিমতী। একদিকে তার নিজের বাইজীরূপ, অন্য দিকে শ্রীকান্তের সামাজিক সম্ভ্রম—এই অবস্থায় তার পক্ষে যা করা স্বাভাবিক সে সেই পথই বেছে নিল। অন্তর চাইলেও সমাজ ও ধর্মের কথা স্মরণ করে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর বাঁধল না। মন একান্তভাবে চায় বলে, দুর্বারভাবে আকর্ষণ করে বলে এই দুটি জীবন বার বার পরস্পরের কাছে আসে, সমাজ-সচেতনতা তাদের বার বার বিচ্ছিন্ন করে। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের চিত্রটাই পাঠকের কাছে প্রথম পর্বের পরম আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং সেইজন্য মনোমুগ্ধকর রচনা হিসাবে এই পর্বটি সার্থক। তবে এর আখ্যান-ভাগের প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের সামঞ্জস্য সহজে খুঁজে পাওয়া

যায় না। প্রথম অংশের নায়ক শ্রীকান্ত নয়, ইন্দ্রনাথ। তারপর ইন্দ্রনাথ চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল। প্রথম পর্বের দ্বিতীয়াংশে কুমার বাহাদুরের তাঁবুতে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় থেকে চতুর্থ পর্বের শেষ পর্যন্ত শ্রীকান্ত নায়ক।

বলেছি, রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কথাটি একটু বুঝিয়ে বলি। চলমানতা বা সক্রিয়তা এই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য। নিজের জীবন-সমস্যার সমাধানে সে নিজেই অগ্রসর হয়েছে, নিজের গোপন হৃদয়ের প্রেমকামনা তার সক্রিয়তায় অনেকখানি উদ্ভাসিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটিকে খুব যত্নের সঙ্গে পরিকল্পনা করেছেন। রাজলক্ষ্মীর জীবনটাই বিচিত্র। উত্তরকালে যাকে আমরা প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যে দেখি দেখি তাকে ঐশ্বর্যময়ী যথার্থ রাজলক্ষ্মীরূপে, তারই জীবনের প্রথম দিকটা কেটেছে চরম আর্থিক অভাবের মধ্যে। রিক্তা রাজলক্ষ্মীকে কৌলীন্য প্রথার বলি হতে হয়েছে। তখন যদি আর্থিক সচ্ছলতা থাকত তার জীবন হয়তো ভদ্রকন্যার স্বাভাবিক জীবনখাতেই প্রবাহিত হতো। উপন্যাসের নায়িকারূপে তাকে আমরা পেতাম না, কিন্তু স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে-সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সে অনায়াসেই অতিবাহিত করতে পারত। নিশ্চিন্ত সুখে ঘরসংসার করার জন্য কী দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই না তার অন্তরে ছিল। বাইজী হওয়ার চেয়ে দরিদ্র হলেও সে জীবন অনেক কাম্য—এ-কথা রাজলক্ষ্মী ব্যথার সঙ্গেই শ্রীকান্তের কাছে নিজে বলেছে। তার জীবনের এই রিক্ততা ঐশ্বর্যের মধ্যেও ঘোচে নি ; এই নারীর জীবনের তটপ্রান্ত দিয়ে যে দুঃখ-প্রবাহ বয়ে গিয়েছে, তার উত্তরকালের ঐশ্বর্য তা প্রতিরুদ্ধ করতে পারে নি। তাইতো দেখি প্রেমাস্পদকে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও যুবতী রাজলক্ষ্মীর মনস্কামনা চরিতার্থ হলো না। এইখানেই তার জীবনের ট্র্যাজেডি।

এই প্রেম-বঞ্চিতা চরিত্রটিকে বুঝবার জন্যই প্রয়োজন হয়েছে আর একটি নারী-চরিত্রের। সেই চরিত্র অন্নদাদিদি—শরৎ-প্রতিভার আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। এ সেই অন্নদাদিদি যাকে স্বল্পতম কথায়

শরৎচন্দ্র বর্ণনা করেছেন এইভাবে : 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।'

এই চরিত্রটির প্রসঙ্গে একজন সমালোচক লিখেছেন : 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি চরিত্রটিকে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের নারী-চরিত্রের আলোকস্তম্ভ বলা চলে। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা প্রায়ই সুন্দরী, প্রেমে নিষ্ঠাবতী, কমনীয় হৃদয়ধর্মে সমৃদ্ধ। অন্নদাদিদি এ বিষয়ে অনন্যা। এই মহীয়সী মহিলার সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীকান্ত উপলব্ধি করিয়াছে যে, নারীর বাহিরের জীবন যাহাই হউক, অন্তরে তাহার অমৃতপ্রবাহ বিদ্যমান। বাইজীবৃত্তি সত্ত্বেও শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে চিনিয়াছে এই শ্রদ্ধাবোধের সাহায্যে। বাস্তবিকই স্নিগ্ধরূপা অন্নদাদিদির হৃদয়বোধ, বুদ্ধি, সংযম, কর্তব্যানুরক্তি, অপরিসীম মনোবল, সর্বোপরি তাঁহার পাতিব্রত্য শরৎচন্দ্রের সক্রিয় স্ত্রীচরিত্র-গুলির পরিচিতির ও মূল্যায়নের সবিশেষ সহায়ক। অন্নদাদিদির পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠা শরৎ-সাহিত্যের নায়িকাদের সুগভীর স্বামী-সংস্কারের ভাব-উৎস বলা চলে।'[১]

জটিল ও বিস্তৃত কাহিনী-সমন্বিত এই উপন্যাসখানি সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন : 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কাহিনী অসাধারণ বৈচিত্র্য-মণ্ডিত ; এবং অগণিত নরনারী ইহাতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা নিজেদের প্রয়োজনে আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে ; কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই। বর্তমানকালে দীর্ঘ উপন্যাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। রোমা র‍্যাঁলার **John Christopher,** টমাস ম্যানের **Buddenbrooks, The Magic Mountain** ও

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়

রেমণ্টের Peasants প্রভৃতির কথা সকলেরই মনে আসিবে। শুধু পরিধির বিশালতা দিয়া বিচার করিতে গেলেও 'শ্রীকান্ত'র তুলনা বিরল। অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বা কোন একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই।...শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়ের ইতিহাস প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে, এবং অন্যান্য খণ্ড আখ্যান এই কাহিনীকেই পরিপুষ্ট করিয়াছে।'[১]

তথাপি এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ১ম ও ২য় পর্বের ভাষার কারুকার্য ও বর্ণনার নিবিড়তা ৩য় ও ৪র্থ পর্বে বিলীন হয়ে গেছে। এই দুটি পর্বকে তাঁর অক্ষম সৃষ্টি বললে দোষ হবে না, কারণ স্তিমিত প্রতিভার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নের ম্লানিমাকেই আমরা এই দুটি পর্বে নিরীক্ষণ করে ব্যথিত হই। 'বাস্তবিক 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সবটা গঠনরীতি, রচনাশৈলী বা কাহিনী-বিন্যাসের হিসাবে সমান উপভোগ্য নয়। বিভিন্ন পর্বে বা খণ্ডে উপন্যাসের মূল কাহিনীটি নূতন নূতন বাঁকে সরিয়া সরিয়া গিয়াছে বলিয়া এবং মাঝে মাঝে শাখা-কাহিনীর ঔজ্জ্বল্যে মূল কাহিনী কিছুটা আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া রসের ঘনত্ব সর্বত্র সংরক্ষিত হয় নাই।...প্রথম পর্বের ভাষালালিত্য কমিতে কমিতে তৃতীয় পর্বের বিলম্বিত লয়ের কাহিনী ও জীবনায়নে অনেকটা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।' তথাপি 'শ্রীকান্ত' সুখপাঠ্য গ্রন্থ।

ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বলে আমরা এই অধ্যায় শেষ করব। নিঃসন্দেহে এটি শরৎচন্দ্রের অপরূপ সৃষ্টি। একটি কঠিন বাস্তব চরিত্র হিসেবেই লেখক তাঁকে এঁকেছেন। তার কার্যকলাপের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা হয়েছে যা আমাদের অতিমানবের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাধারণের অনেক উর্ধ্বে সে। রোমান্সের পরমাশ্চর্য সুদৃঢ়তা ও বাস্তবের প্রত্যক্ষতার সমাবেশে তৈরী এই চরিত্রটি সত্যিই

১. শরৎচন্দ্র : সেনগুপ্ত।

শরৎ-প্রতিভার একটি অপরূপ সৃষ্টি। ইন্দ্রনাথকে মহামানব বললে অত্যুক্তি হয় না। বিপদের পথে তার নির্ভীক সঞ্চরণ। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। সবরকম বিপদ তুচ্ছ করে সে তার বিজয়কেতন উড়িয়ে চলে গেছে।

নিঃশঙ্ক সাহস এই চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ। বোধ করি এত বড় সাহসী চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সংস্কার ও মিথ্যা শিক্ষার দ্বারা ইন্দ্রনাথের মন পঙ্গু ছিল না, তাই কোন বিপদকেই সে গ্রাহ্য করে না, কোন অবস্থাবিপর্যয়ে সে নিরস্ত হয় না। এমন কি অশান্ত প্রকৃতি ও হিংস্র জানোয়ারের সম্মুখীন হতে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। ইন্দ্রনাথ শুধু যে নির্ভীক তাই নয়, সে নির্লিপ্ত। 'মরতে তো একদিন হবেই'—এই জ্ঞান সে দর্শন-শাস্ত্র থেকে পায় নি, পেয়েছিল অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক অনুভূতি থেকে। নির্ভীকতা ও নির্লিপ্ততার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সরল, সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা। এসব ছাড়াও তার মধ্যে আর একটি মহৎ গুণ ছিল। সে পরোপচিকীর্ষু। এই দিক দিয়ে তার চরিত্রের যে দৃঢ় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাই ইন্দ্রনাথকে মহামানবত্বের দুর্লভ গৌরবে ভূষিত করেছে। চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও কোমলতা এবং হৃদয়ের উদারতায় ইন্দ্রনাথ সত্যিই একটি অপরূপ সৃষ্টি। শ্রীকান্তের মানসগঠনের জন্য এইরকম একটি চরিত্রের প্রয়োজন ছিল।

॥ চব্বিশ ॥

'দত্তা' একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন সুস্নিগ্ধ প্রেমকাহিনীর চিত্র। এটি শরৎচন্দ্রের একটি অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ উপন্যাস। অনেকের মতে তাঁর সবচেয়ে মনোহারী উপন্যাস। নাটকীয় ঘটনাহীন, অত্যুগ্র আবেগ ও ঘটনার খরতাহীন প্রশান্ত স্ফটিক-স্বচ্ছ একটি প্রবাহ। এই প্রশান্ত স্বচ্ছতার মধ্যে পাঠকচিত্ত সহজেই একটা অনাবিল আনন্দ ভোগ

করে। এইজন্যই 'দত্তা' চির-নূতন, চির-সুন্দর একটি প্রেমের কাহিনী হয়ে রয়েছে—যা পাঠকের কাছে কোনদিনই পুরাতন হয় না। এই দিক থেকে 'দত্তা'র মধুর প্রসন্ন আবেদন অনেক সময়ে পাঠকের কাছে 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ'কেও ছাড়িয়ে যায়। প্রেমের মাধুর্যমণ্ডিত এই উপন্যাসে শরৎ-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিজয়া।

এই বিদুষী যুবতীর অন্তরের দ্বন্দ্ব রাসবিহারী-বিলাসের বেড়াজালকে অতিক্রম করে হৃদয়ের জয় ঘোষণা করেছে। লোকলজ্জা, সংস্কার, পিতৃঋণ ও রাসবিহারী-বিলাসের ধূর্ত নির্লজ্জ নিষ্ঠুর বেড়াজালের চাপে মুমূর্ষু বিজয়ার আত্মার মুক্তি-সংগ্রামের বিজয়োৎসবে 'দত্তা' উপন্যাসখানি সত্যিই সার্থক ও সুন্দর। ধূর্ততা ও ভণ্ডামীর আদর্শ রাসবিহারী চরিত্রটি প্রকৃতই উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি। তার চতুর বাক্‌জাল, বাচনভঙ্গী, ভাষার কারুকার্য এবং বুদ্ধির খেলা চরিত্রটিকে অতুলনীয় সজীবতা দিয়েছে। সৃষ্টির দিক দিয়ে, কি ভাষায়, কি কার্যে, কি তার প্রয়োগে শিল্পীর এই চরিত্রটি নিঃসন্দেহে একটি অনবদ্য সৃষ্টি। পিতার ভণ্ডামি কিন্তু পুত্রের মধ্যে আশ্রয় পায় নি। চরিত্রের অসংযম, ধৈর্যহীনতা, ইতরতা, আস্ফালন ও প্রভুত্বপ্রিয়তার মধ্যে বিলাস ফুটে উঠেছে একটি সহজ সরল চরিত্র হিসেবে। তার চরিত্র আন্তরিকতায় পূর্ণ এবং নৈতিক আদর্শের দিক থেকে উচ্চতর।

শরৎচন্দ্র মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেবেলার খেলার বিয়ে, এমন কি পুত্র-কন্যা সম্পর্কে পিতামাতার বিয়ের প্রস্তাবের ওপরও অনেকখানি গুরুত্ব দিয়ে সে কয়েকটি সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন, 'দত্তা' তারই মধ্যে একটি। এই উপন্যাসে বিজয়া-নরেনের কাহিনীতে তার পরিচয় মিলবে। অভিভাবক রাসবিহারীর ধূর্ততা ও বিলাসবিহারীর অস্তিত্ব এড়িয়ে বলতে গেলে নরেনের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার ইচ্ছাজ্ঞাপক পিতার পত্রখানিই ব্রাহ্ম বিজয়াকে হিন্দু নরেনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

শরৎ-সাহিত্যের একটা খুব বড় দিক নারী-হৃদয়ের প্রেম। তাঁর শিল্পীচেতনায় প্রেমই প্রধান বিষয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত মিলনহীন, এই প্রেমের জন্য দীর্ঘ উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা ও দুঃখবরণ। এই দুঃখ শরৎচন্দ্র নারীদের দিয়েছেন। এই দুঃখের উৎপত্তি মূলতঃ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, সংস্কারের সঙ্গে বুদ্ধির, দেহের সঙ্গে আত্মার সংঘর্ষে। 'দত্তা'র বিজয়া অবশ্য একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির নারী। বৈষয়িক হিসেবে সে নরেন্দ্রের উত্তমর্ণ। আর্থিক স্বাধীনতা তার আছে বলেই তার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু বিলাসবিহারীর ক্ষেত্রে বিয়ের কথাবার্তাজনিত দুর্বলতা এবং মণিবালা-বোধের মিশ্রণেই বিজয়ার মধ্যে এই আত্মস্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছে। নরেনের ক্ষেত্রে বিজয়ার ভূমিকা অনেকটা প্রেমিকাপ্রার্থীর। যখন সে তার অভিভাবকের অপ্রসন্নতার বিরুদ্ধে গিয়ে এনেছে, তাকে দেখে, কথা বলে, খাইয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে তখন যে আর উত্তমর্ণ নয়, প্রেমিকা। তার অন্তরে প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ ছিল বলেই শিক্ষিতা ব্রাহ্ম-তরুণী বিজয়া হিন্দু-সন্তান নরেনকে হিন্দু-মতে বিয়ে করতে কনে সেজে বসে গেল। তার সাধের ব্রাহ্মমন্দিরের কথা, ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু-বান্ধবের কথা, হিন্দুসমাজে এ-বিয়ের ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়ার কথা, এমন কি তার বাবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য গ্রামে লাঞ্ছনার কথা সে যেন ভুলে গেল। আগে থেকেই যদি নরেনের প্রতি গভীর প্রেম বিজয়ার মনে না জন্মাত তাহলে দয়ালের হাজার স্নেহের ছলনামণ্ডিত ব্যবস্থায়ও বিজয়াকে এই বিয়েতে সম্মত করান যেত কিনা সন্দেহ। বিজয়ার সঙ্গে নরেনের বিয়ে হওয়ার পর যে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হলো, তার অনিবার্যতা পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন, কিন্তু তার পরীক্ষা এই উপন্যাসে হয় নি।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মনে হিন্দু-সংস্কার বা হিন্দু-সমাজবোধ যে খুবই দৃঢ়মূল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দয়াল হিন্দুমতে বিজয়ার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন কারণ নরেন হিন্দু। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা দয়াল করেন নি, করেছেন লেখক শরৎচন্দ্র। প্রেমের গৌরবই 'দত্তা' উপন্যাসের মূল আকর্ষণ। সেখানে বিয়েটা হিন্দুমতে হলো কি হলো না সে কথা বড় নয়, বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার নরেনের সামাজিক

ও মানসিক অবস্থা যে কোন ধর্মমতে বিজয়াকে বিয়ের অনুকূল ছিল। তবু হিন্দুসমাজের মধ্যে বাস করে শরৎচন্দ্র হিন্দু সন্তানকে (যদিও বিলাত যাওয়ার জন্য সে গ্রামে লাঞ্ছিত) ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে হিন্দুমতে বিয়ে দিয়ে এই সত্যটাই কি প্রমাণ করেন নি যে তিনি পুরুষ-প্রধান প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাটি মেনে চলতেই উৎসাহবোধ করতেন।

'দত্তা' উপন্যাসের দয়াল চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা-সিঞ্চিত।

দয়াল ও রাসবিহারী দুজনেই বহিরঙ্গভাবে ধর্মপ্রাণ।

একজন ব্রাহ্মমন্দিরের পুরোহিত, অপরজন ব্রাহ্মধর্ম প্রসারের উদ্যোক্তা। কিন্তু দয়াল মহৎ চরিত্রের মানুষ, তার অন্তরশুচিতা অকৃত্রিম তাই লেখকের সহানুভূতি তার ওপর যতখানি বর্ষিত হয়েছে, খল রাসবিহারী ঠিক সেই পরিমাণেই লাঞ্ছিত হয়েছে। দয়াল হিন্দুমতে বিজয়ার ব্যবস্থা করেছেন, বিজয়ার অজ্ঞাতসারেই তাকে সারা দিন অভুক্ত রেখেছেন, নরেনদের কুলপুরোহিতকে খুঁজে এনেছেন। ব্রাহ্মমন্দিরের একজন আচার্যের পক্ষে এইভাবে হিন্দুমতে বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের এই খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করা বিসদৃশ মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং এইজন্য কাহিনীর এই অংশটুকুতে কিছুটা বাহুল্যদোষ ঘটেছে মনে হয়। কিন্তু ধর্ম ন্যায়, কল্যাণ ও সত্যের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা, শরৎচন্দ্রের এই ধর্মচেতনা উদার হৃদয় ধার্মিক ব্রাহ্ম আচার্য দয়ালের চরিত্রে সার্থকভাবেই রূপায়িত হয়েছে। 'সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বের হয়েছে বলেই কোন জিনিস কখনো সত্য হয়ে ওঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের অগ্রে, সকলের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চায়, তারা সত্যকে ভালবাসে বলেই করে না, তারা সত্য প্রকাশের দম্ভকে ভালবাসে বলেই করে।' নরেনের এই উক্তির মধ্যে আভাসিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের ধর্মচেতনার স্বরূপ। 'মানুষ খাঁটি হইলেই যে সকল ধর্মই তাহাকে খাঁটি জিনিসটি দিতে পারে, ইহাই তিনি অকপটে বিশ্বাস করিতেন।' দয়াল সম্পর্কে নরেনের এই মনোভাব আসলে শরৎচন্দ্রেরই মনের কথা। এই চেতনা মানবতাবোধ-প্রসূত।

'দত্তা' উপন্যাসের নায়ক-চরিত্র নরেন।

শ্রীকান্তের মতই এই চরিত্রটি আকর্ষণীয়, তবে শ্রীকান্ত অপেক্ষা নরেনের মধ্যে বাস্তবতাবোধ অনেক কম। 'শ্রীকান্ত যেমন জীবনরসিক, নরেন ঠিক তাহা নয়। অবশ্য শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নরেন উজ্জ্বল বলিয়া এবং তাহার আকৃতি-প্রকৃতি বিজয়ার চিত্তাকর্ষক হওয়ায় রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত কথাবার্তায় বা আচারে-আচরণে যতটা গতি দিয়াছে, বিজয়াকে নরেন তাহা না দিয়াও বিজয়ার অন্তরলোকে ক্রমেই অধিকতর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিজয়া রাজলক্ষ্মীর মত অতটা সক্রিয় না হইলেও শরৎচন্দ্রের নায়িকা-চরিত্রের স্বাভাবিক চলমানতা তাহার মধ্যেও আছে।'

তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের শিল্প-চেতনা তাঁর প্রকৃতি-প্রীতির মধ্য দিয়ে যেমনভাবে ফুটে উঠেছে 'দত্তা' উপন্যাসের বহুস্থানেই তার পরিচয় আমরা পাই। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের চব্বিশতম পরিচ্ছদটি স্মর্তব্য। দয়ালের বাড়ি থেকে বিষাদপূর্ণ শূন্য মন নিয়ে বিজয়া বাড়ি ফিরছিল। নলিনীকে নরেন ভালবাসে, এই সন্দেহে তার মন ভারাক্রান্ত। বাইরের প্রকৃতি তখন মনোরম, কিন্তু বিজয়ার রিক্ত মনের কাছে তা যেন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। উপন্যাসের এই স্থানে আছে: 'বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সম্মুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ, প্রান্তর, গ্রামান্তরের বনরেখা, নদী, জল—সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিমঝিম করিতেছে।' মানবমন ও প্রকৃতির সম্পর্কে এখানে স্পষ্টতই লেখকের বিশেষ দৃষ্টিপাত ঘটেছে।

একটি নারীর মনে দুইটি পুরুষের আকর্ষণের দ্বৈরথ—ইহাই 'গৃহদাহ' উপন্যাস।

জটিল মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে 'গৃহদাহ' একটি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস শিল্পকলার দিক থেকেও এটি, অনেকের মতে, শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি। ব্রাহ্ম-হিন্দু সংঘর্ষের যুগের পটভূমিকায় বিরচিত হয়েছে এর কাহিনী। কিন্তু যে জীবন-সমস্যা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, যে ত্রিকোণ প্রেমের কথা বলা হয়েছে তাকে একালের সমাজের গুরুতর সমস্যা বলেও মনে করা যায়। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও চরিত্রের গভীরতা প্রকাশে 'গৃহদাহ', অন্যান্য উপন্যাসগুলির তুলনায়, শরৎ-প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

পুরুষের মধ্যে মহিম ও সুরেশ এবং নারী-চরিত্রের মধ্যে মৃণাল ও অচলাকে কেন্দ্র করেই 'গৃহদাহ' উপন্যাসের সমগ্র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত গুরুত্ব পেয়েছে তিনটি চরিত্র—অচলা, মহিম ও সুরেশ। মানুষ অন্যকে বিচার করে তার নিজস্ব মন দিয়ে অর্থাৎ তার বিকারগ্রস্ত চিত্তবৃত্তি দিয়ে। এই চিত্তবৃত্তির সঙ্গে তার নিজস্ব আশা, আকাঙ্ক্ষাও জড়িয়ে থাকে, অতএব এই ভুল বিচারই চলেছে সমস্ত জগৎময়। এই ভুল বোঝাবুঝি, নিজের মনের দৈন্যে অন্যের অপ্রাকৃত মূল্যায়নই মানবসমাজ ও পরিবারের একটি বৃহত্তর সমস্যা।

এই সমস্যাই 'গৃহদাহের' কেন্দ্রবিন্দু।

মৃণাল হিন্দু, অচলা ব্রাহ্ম। সমাজ ও ধর্মের নিরন্ধ্র প্রাচীরে মৃণালের মন অবরুদ্ধ তাই তার নারীজীবন একটা ধ্রুবলক্ষ্যের দ্বারা চালিত—সে পথ সত্যই হোক, আর মিথ্যাই হোক। সে পথ সংগ্রামহীন কিন্তু অচলা স্বাধীন সত্তা নিয়ে তার নিজস্ব পথ গ্রহণ করেছে তাই তার জীবনের ভুল-ভ্রান্তি সবকিছুই তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং তার পথ হয়ে উঠেছে সংগ্রামময়। এই দুই পথের পথিক দুটি নারী—মৃণাল ও অচলা; এবং একের অন্যের পরিপূরক ও ব্যাখ্যাকার। মৃণালের শান্ত জীবনের মূল তার নিরঙ্কুশ ধর্মবিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ,—অচলার দুঃখবেদনার সংগ্রাম-মথিত জীবন তার ব্যক্তি-সংগ্রামের চিত্র।

অচলা ও মহিমের জীবনে মহিমের পরমবন্ধু সুরেশ ছিল যেন

একটি মূর্তিমান অভিশাপ। যদিও সে তার বন্ধু-পত্নীর ভালবাসার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল তথাপি সুরেশের বিত্ত, উচ্ছ্বাস ও আবেগ-পূর্ণ প্রণয় অচলার দাম্পত্য-জীবনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। মহিমের গৃহ বাহ্যত ও কার্যত ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মতো সেইদিন যেদিন সুরেশের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের শান্ত পল্লীভবনে। হৃদয়বান অথচ অসংযত জৈবাবেগ চালিত হয়ে সুরেশই চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে মহিমের জীবন থেকে অচলাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এজন্য অবশ্য অচলাও কিছুটা দায়ী ছিল। সেই তো স্বামীর অসুখের সময় বায়ুপরিবর্তনে যাবার কালে তার সঙ্গী হওয়ার জন্য সুরেশকে গোপনে অনুরোধ করেছিল। সে সত্যিই অন্তরে দুর্বল ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ডিহিরীতে জীবনযাত্রার চিত্র, এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চিত্র। তখন অচলার মনে গভীর দ্বন্দ্ব গভীরতর হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। সুরেশ প্রতিনিয়ত তাকে আহ্বান করছে তার সমস্ত দেহমনে, অন্যদিকে স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্যের বাধা তাকে প্রতিনিয়ত বিমুখ করেছে। পরিপূর্ণ বিলাস-সম্ভোগের আয়োজনের মধ্যে সুরেশের উজ্জ্বল উন্মুখ প্রেম ও অচলার অন্তরের সংগ্রাম সমস্ত সমারোহকে পাণ্ডুর বিবর্ণ করে দিয়েছে। এই কয়েকদিনের অচলা-সুরেশের অন্তরের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টির বিস্ময়কর নিদর্শন—বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়কর কারু-কৃতি। একজন নারীর মনে যে একই সঙ্গে দুজন পুরুষ দাগ কেটে স্থান করে নিতে পারে, একজন স্বামী ও একজন পরপুরুষ (স্বামীর বন্ধু হলেও অচলার কাছে সুরেশ পরপুরুষ ভিন্ন আর কিছু নয়),—দুজনকেই একটি বাঙালী মেয়ে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থেকেও একই সঙ্গে যে অন্তরে প্রশ্রয় দিতে পারে, এই উপন্যাসে সেই বিচিত্র প্রেমের ছবি আঁকা হয়েছে।

স্বামী ও পরপুরুষ দুজনকে একই সঙ্গে ভালবাসা -- বাংলা সাহিত্যে আমরা যে এই প্রথম পেলাম তা নয়। স্বামী থাকতে স্ত্রীর কুলত্যাগ,

সাহিত্যে এমন ঘটনা বিরল নয়, কিন্তু বুকের মধ্যে স্বামীকে অতন্দ্র প্রেমে জাগিয়ে রেখে পরপুরুষের আকর্ষণকে স্বীকার করবার যে বলিষ্ঠ কাহিনী শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন তা অনেকাংশে নূতন জিনিস। এখানে আমরা দেখি যে, নায়িকার অন্তরে স্বামী ও পরপুরুষ দুজনেই একসঙ্গে বিরাজ করেছে। অন্তর-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নায়িকার জীবনে যে অসহায় ব্যর্থতা নেমে এসেছে, নায়কের জীবনে যে ধূসর রিক্ততা পুঞ্জীভূত হয়েছে, বেদনার যে বর্ণালী ফুটেছে, তা পাঠকের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে।

একদিকে মৃণাল ও অচলা, অন্যদিকে সুরেশ ও মহিমের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আদর্শবাদের সংঘাত—এরই পরিপূর্ণ আলেখ্য সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ ও গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। অচলা-চরিত্র ধর্মশৃঙ্খলহীন ব্যক্তিবাদের ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হওয়ার লাঞ্ছিত বেদনাময় সংগ্রামের প্রতীক। মৃণালের চরিত্র ধর্মানুশাসন-শৃঙ্খলিত, স্বাধীনতাহীন, ব্যক্তির সংগ্রামহীন সংযত শান্ত জীবনের প্রতীক। সুরেশ একটি অতি অকপট ও স্বাভাবিক চরিত্র। তার সমস্ত চারিত্রিক ক্রটি ও দৈন্যের মধ্যেও সুরেশের অকপট সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা ও পরহিতৈষণা পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে। দোষে-গুণে সুরেশের চরিত্র একটি সজীব বলিষ্ঠ চরিত্র যদিও শিশুকাল হইতে চিরদিন অধিক যত্ন ও আদরে লালিতপালিত হইয়া আবেগে ও প্রকৃতির বশেই সে চলিয়াছে। মহিমের চরিত্রটি রহস্যময় ; চরিত্রগত মাধুর্য অথবা হৃদয়ের কোমলতা—কোন্ গুণে যে সে অচলার হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল সে সম্বন্ধে লেখক নির্বাক। সে যেন পাথরে গড়া এক সংযম, সদ্বিবেচনা ও সহিষ্ণুতার মূর্তি—যার অন্তরে শতবেদনা লাঞ্ছনাও বাইরের ব্যবহারে কখনো প্রকাশ পায় নি—ঠিক যেন সুরেশের চরিত্রের একটি বিপরীত চরিত্র। সুরেশ-চরিত্রটি ভাল-মন্দের চরম সীমার মধ্যে দোদুল্যমান, মহিম স্থির নিশ্চিত আলোড়নহীন একটি সুসংযত ব্যক্তিত্ব।

অচলার কথা আরো একটু বলি।

কারণ তার সমস্যাটাই সবচেয়ে গুরুতর।

'তাহার প্রশ্ন হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে নয়; সে হিন্দুসমাজের মেয়েই নয়। সে ব্রাহ্ম—মৃণাল যে ধর্মনিষ্ঠার বড়াই করিতে পারিত সে তাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত নয়। সে যে প্রশ্ন তুলিয়াছে তাহা বিশেষ কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, তাহা গোল বাধাইয়া দেয় মানব-সভ্যতার গোড়ার কথা লইয়া।…সে যাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই, আর যাহাকে কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই অলক্ষিতে তাহারই প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। যে দুই বন্ধু তাহার জীবন-নাট্যে এতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহারা ছিল একেবারে বিপরীত প্রকৃতির; একজন ছিল পর্বতের মত নীরব, নিশ্চল ও আবেগহীন, আর একজনের প্রকৃতি ছিল জলোচ্ছ্বাসের মত দুর্বার। একজনের মনের কথা সে কখনও জানিতে পারিত না, আর একজন প্রতি কথায় নিজেকে নিঃশেষ করিয়া নিবেদন করিত। অচলার সচেতন বুদ্ধি যাহা বুঝাইয়াছে তাহার গুহাস্থিত আত্মা অজ্ঞাতসারে ঠিক তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি জাগাইয়াছে। সুরেশের নীচতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া মহিমকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া সে তাহার শ্বশুরবাড়ি স্বামীর ঘর করিতে গেল। সেখানে সে যখন মহিমের প্রতি ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিল তখন যে স্নেহ অলক্ষ্যিতে সুরেশের প্রতি তাহার মনে জমিয়া উঠিতেছিল তাহাই বাহির হইয়া পড়িল।'[১]

তারপর?

তারপর অচলার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হলো তার নিভৃত মনের কথা: 'সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে তার ঘর করার জন্যে আমাকে তোমরা রেখে যেয়ো না।' কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করেই অচলা বুঝল স্বামীর প্রতি টান তার কত গভীর। এর পর স্বামীকে সে ফিরে পেল সেবার মধ্য দিয়ে। পেল বটে, নিবিড় এবং গভীর করেই পেল—তবু তার প্রণয়ভিক্ষু সুরেশের প্রতিও তার মন

১ শরৎচন্দ্র: সেনগুপ্ত।

আকৃষ্ট হলো। সেই চিত্তস্পন্দী ঘটনাটি শরৎচন্দ্রের লেখনীমুখে এই-ভাবে ফুটে উঠেছে। শীতের রাত। সকলে নিদ্রিত। সুরেশ নিঃশব্দে অচলার ঘরে প্রবেশ করে তার নিজের গাত্রাবাসখানি দিয়ে তার ঘুমন্ত দেহ সস্নেহে আচ্ছাদিত করে নীরবে চলে গেল। তখন অচলা কি করল? 'সে চোখ বুজিয়া সেই আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।...এই কদাচারে তাহার লজ্জার পরিসীমা রহিল না এবং ইহাকে কুৎসিত বলিয়া গর্হিত বলিয়া সহস্র প্রকারে অবমানিত করিতে লাগিল এবং অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর এই চৌর্যবৃত্তিকে সে কোনদিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু তথাপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কিছুতেই সায় দিতেছে না ইহাও তাহার অগোচর রহিল না... ।'[১]

এই দ্বৈধতাই অচলার জীবনের ট্র্যাজেডি।

সুরেশের জন্য তার অন্তরে একটা মমতা না থাকলে অচলা কি অমন করে নিজেকে দগ্ধ করতে পারত? নারী-হৃদয়ের এই যে বিরোধ ও অসঙ্গতি বা ব্যর্থতা—এর বিশ্লেষণেই শরৎ-প্রতিভার বিশেষত্ব অচলার এই বিচিত্র চরিত্রই 'গৃহদাহ' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু এবং এই জটিল নারী-চরিত্রটিকে শিল্পী যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র শরৎচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জবানীতে জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র যখন এই উপন্যাসটির রচনাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁর বোতলের পর বোতল হুইস্কির প্রয়োজন হয়েছিল। এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় যুগপৎ শিল্পীর শক্তি এবং আধুনিকতা বিস্ময়করভাবে কার্যকরী হয়েছে। আমরা তাই দেখি, কঠিন দুঃখের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এবং জেনেশুনেও স্রোতের টানেই অচলাকে যেন ব্যর্থ জীবনের পথে চলতে হয়েছে। তার অন্তরের অন্তস্তলে একটা নিদারুণ ব্যর্থতাজনিত হাহাকার যে প্রতিনিয়ত গুমরে উঠত তা বোধ করি তার স্রষ্টার চেয়ে আর কেউ জানত না।

---

১. গৃহদাহ ঃ শরৎচন্দ্র।

এই উপন্যাসে মৃণাল-চরিত্রটিকে সহায়িকা চরিত্ররূপেই আঁকা হয়েছে। মৃণাল না থাকলে কাহিনীর পটভূমিকায় আমরা অচলার অমন উজ্জ্বল মূর্তি দেখতে পেতাম না। নারীর মনের আর একটি স্নিগ্ধ দিক শরৎ-সাহিত্যে সুন্দরভাবে ফুটেছে, তা হলো নারীর স্নেহের দিক। শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রে মমতাময়ী রূপটি প্রায় সর্বত্র পরিদৃশ্য-মান, অধিকাংশ মেয়ের মধ্যেই স্নেহভাব পরিলক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার আসল রহস্য তো এইখানেই। 'গৃহদাহে'র মৃণাল এই-রকম একটি স্নেহময়ী নারী-চরিত্র। এই মমতাময়ী চরিত্রটির প্রসঙ্গে একজন সমালোচক লিখেছেন : 'শরৎচন্দ্র আপন হিন্দু ঐতিহ্যবোধকে এমনভাবে মৃণাল-চরিত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, ইহার বাহুল্য রসিক পাঠকের চোখে না পড়িয়া পারে না। মৃণালের গ্রাম্যতা, হিন্দুয়ানী, ধর্মপরায়ণতা, আচারনিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা, সাধ্বীত্ব, সপ্রতিভ ভাব, বুদ্ধির দীপ্তি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি সব কিছুতেই যেন শরৎচন্দ্রের দক্ষিণ নয়নের আনুকূল্য রহিয়াছে। সহায়িকা চরিত্র হইলেও বিজয়িনী মৃণালের কাছে নায়িকা অচলা মাঝে মাঝে এমন নিষ্প্রভ হইয়াছে যে, শিল্পকলার দিক হইতে চরিত্রটির মূল্য বাড়িবার পরিবর্তে কমিয়াছে। গ্রন্থে মৃণালের গৌরব এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, অচলার পিতা অসহায় বৃদ্ধ কেদারবাবু মৃণালের সেবায় বাঁচিবার মত আশ্রয় পাইয়া পরম পরিতৃপ্তিভরে আপন ব্রাহ্ম-ধর্মের সর্ববিধ সংস্কার ভুলিয়া ব্রাহ্মদের নিন্দা করিয়াছেন এবং পট্টবস্ত্র-পরিহিতা মৃণালের পূজার ঘরে যাইবার দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া নিজেও পুনরায় পৈতা পরিয়া কোশাকুশি লইয়া পূজায় বসিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।...প্রকৃতপক্ষে মৃণাল-চরিত্রের সংগঠনে শিল্পকলার কৃতিত্ব কম হইলেও লেখকের সমাজবোধ ও ধর্মচেতনার প্রশ্রয় চরিত্রটির উপর অত্যধিক থাকায় অচলা মৃণালের কাছে করুণভাবে পরাজয়-বরণে বাধ্য হইয়াছে।'[১]

শরৎ চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃণাল ও অচলা দুজনেই বহু দুঃখ পেয়েছে ; কিন্তু একজনকে দুঃখ প্রদান করেছে মহৎ মর্যাদা, আর অন্যজনের উঁচু মাথা ধূলোয় নেমে এসেছে। মোটকথা, বিপরীতমুখী ভাব, ঘটনা বা ক্রিয়ার সংঘর্ষ সৃষ্টি করে চরিত্রের মানসিক আলোড়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটিয়ে কাহিনীকে গতিময় ও আখ্যানভাগকে আকর্ষণীয় করে তুলতে শরৎচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব চরিত্র সৃষ্টিতে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে এই কৃতিত্বের নূতন শিখর পরিলক্ষিত হয়। এখানে প্রত্যেকটি চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হয়েছে; ফলে চরিত্রের সংঘর্ষ-তরঙ্গিত রূপোজ্জ্বলতাই পাঠক-চিত্তকে আলোকিত করে তাকে এক অনাস্বাদিত রসলোকে পৌঁছে দিয়েছে। শরৎচন্দ্র তাই বলতেন, 'আমার উপন্যাসগুলির মধ্যে গৃহদাহই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

১৯২৩ সালে প্রকাশিত হলো 'দেনা-পাওনা'।

তখনো শরৎ-প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তি ম্লান হয় নি।

এই উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমিকায় বৈচিত্র্য আছে ; গল্পের গতি-প্রকৃতির মধ্যেও আছে নূতনত্ব। একশ' টাকার লোভে অলকাকে বিয়ে করে জীবানন্দ নব-পরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে বিয়ের রাতেই পালিয়ে গিয়েছিল। তারপরে বীজগাঁয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে সে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করল। প্রজার উৎপীড়ন, অবিরত মদ্যপান, রমণীর সতীত্ব নাশ—এই হলো তার কাজ। সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে তারই এলাকায় চণ্ডীগড় গ্রামের ৺চণ্ডীর ভৈরবী হলো সেই অলকা যাকে একদিন সে ত্যাগ করে গিয়েছিল। ভৈরবী হওয়ার পর অলকার নাম হয় ষোড়শী।

জীবানন্দ ষোড়শীর বাবাকে নির্যাতন করে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করছিল এবং তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য ষোড়শী গেল জীবানন্দের কাছে। সেইখানে—সেই শান্তিকুঞ্জে জীবানন্দ তার কাছে

প্রথমে চাইল টাকা, তারপর চাইল তার দেহের ওপর অধিকার। সেই রাতে জীবানন্দ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল; কাজেই ষোড়শীকে সে একটা নির্জন ঘরে আবদ্ধ করে রাখবার হুকুম দিল—পরদিন তার সতীপনার বোঝাপড়া হবে। পরদিন প্রাতঃকালে ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার। ষোড়শীর পিতার কথায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ষোড়শীকে জোর করে আটক করবার অভিযোগের তদন্ত করবার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। ইচ্ছা করলেই ষোড়শী জমিদারের উপরে প্রতিহিংসা নিতে পারত, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু বলল যে সে স্বেচ্ছায় তার গৃহে এসেছে এবং স্বেচ্ছায় রাত কাটিয়েছে।

কেন সে এমন অদ্ভুত আচরণ করল?

এর একটিমাত্র উত্তরই আছে। সেদিন ষোড়শীর মধ্যে বহুদিনের নিদ্রিত অলকা জেগে উঠেছিল। সে সন্ন্যাসিনী, দেবীর সেবিকা—ভৈরবী। কিন্তু সে নারী। 'তাহার নিপীড়িত জীবনের রুক্ষতা, তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শূন্যতা ও শুষ্কতার অন্তরালে এই রমণী-হৃদয় নিভৃতে আত্মরক্ষা করিতেছিল।...কাজেই সন্ন্যাসিনী হইলেও অলক্ষ্যিতে স্বামীর প্রতি তাহার একটা টান থাকিবেই এবং এই অর্ধলুপ্ত সম্পর্কের আহ্বানেই সেইদিন তাহার নিজের ক্ষতি করিয়া সে তাহার স্বামীকে রক্ষা করিল। সন্ন্যাসিনীর জীবনে প্রেমের অবকাশ না থাকিতে পারে, কিন্তু সধবা ভৈরবীর মন হইতে স্বামীর স্মৃতি বিদূরিত হইবে কি করিয়া?'[১]

জীবানন্দ ও ষোড়শীর হৃদয়-দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্ব সংগ্রামই এই কাহিনীর উপজীব্য কিন্তু লেখকের দৃষ্টিকোণ ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে একটা অভিনবত্ব দেখা যায়। জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী অত্যাচারী, লম্পট, নির্লজ্জ, পাপিষ্ঠ এবং একেবারেই বেপরোয়া। তার পাপানুরক্তির অকপটতা, তার নির্লজ্জ পাপের স্বীকৃতি, কুকার্যে উল্লাস ও তার নিষ্ঠুর অত্যাচারের অন্তরালেও একটা প্রসন্ন ও মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পাঠকের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। জীবানন্দের জীবনের অতীত

১. শরৎচন্দ্র: সেনগুপ্ত।

ইতিহাস কলঙ্কহীন ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে সে তার বিবাহিতা স্ত্রী অলকা তথা ষোড়শীর সংস্পর্শে এলো তখন সে ভোগের অতীত একটা প্রণয়-জীবনকে অকস্মাৎ যেন চিনতে পারল এবং সেই প্রেম-মধুর জীবন, একান্ত নির্ভরতা পাওয়ার ব্যাকুলতাই তার চরিত্রকে ধীরে ধীরে নূতন করে গড়ে তুললো। দেহের ভোগজাত জীবনের ঊর্ধ্বেও যে আর একটা জীবন আছে, যে জীবনের স্বাদ সুন্দরতর, সেই জীবনকে সে আজ যৌবনের প্রান্তে এসে চিনল। প্রেম-প্রীতির মধ্য দিয়ে নয়, বরং ঘোর শত্রুতার মধ্য দিয়েই জীবানন্দ এই জীবনের সন্ধান লাভ করেছিল ষোড়শীর কাছে। এই শত্রুতার মধ্যেই জীবানন্দের জয়ের মধ্যে রয়ে গেছে তার হৃদয়ের পরাজয়।

যে নারীর চিত্তলোকের আলোয় ও হৃদয়স্পর্শে পাপিষ্ঠ অত্যাচারী জীবানন্দ নূতন জীবন লাভ করেছিল—সেই নারীর হৃদয় যে কি অভিনব গুণের আশ্রয়, তা শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলিকাপাতে ফুটে উঠেছে ষোড়শী-চরিত্রে। ত্যাগ আর ভোগ, প্রকৃতিগত নারীত্ব ও ধর্মজীবনের সংস্কার—এই যে একটি দ্বিধা-বিদীর্ণ হৃদয়—ষোড়শী-চরিত্রে শরৎচন্দ্র সেই হৃদয়েরই অপরূপ ছবি এঁকেছেন। ষোড়শীর অন্তরে সুপ্ত চিরন্তনী নারীসত্তার জাগরণের জন্য প্রয়োজন হলো হৈম ও নির্মলের শান্ত, সুনির্মল জীবনযাত্রার দৃষ্টান্ত। সেই জীবনযাত্রার ছবি প্রাণভরে দেখল ষোড়শী। তারপর? তারপর যে নারী তার মধ্যে এতদিন গভীর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল আজ হঠাৎ সাড়া পেয়ে সে জেগে উঠল এবং তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগল সংসারের সুখ-দুঃখময় সাধারণ পথে। এই চিত্তস্পন্দী রূপান্তরের মর্মকথা শরৎচন্দ্রের লেখনীমুখে এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে:

এতদিন জীবনটাকে সে যেভাবে পাইয়াছে, সেইভাবেই গ্রহণ করিয়াছে—ভাগ্যনির্দিষ্ট সেই পরিচিত যাদের মধ্য দিয়াই ষোড়শীর জীবনের কুড়িটি বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহাকে ভৈরবীর জীবন বলিয়াই সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে, একটা দিনের তরেও আপনার জীবন বলিয়া ভাবে নাই। চণ্ডীর সেবাইত বলিয়া সে নিকটে ও

দূরের বহু গ্রাম ও জনপদের গণনাতীত নরনারীর সহিত সুপরিচিত। কত সংখ্যাতীত রমণী—কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহ বা সমবয়সী—তাহাদের কত প্রকারের সুখদুঃখ, কত প্রকারের আশা-ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশকুসুমের সে নির্বাক, নির্বিকার সাক্ষী হইয়া আছে—দেবীর অনুগ্রহ লাভের জন্য কতকাল ধরিয়া কত কথাই না ইহারা গোপনে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, দুঃখী জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি অকপটে তাহার চক্ষের উপর মেলিয়া ধরিয়া প্রসাদ ভিক্ষা চাহিয়াছে—এই সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণী-হৃদয়ের কোন্ অন্তস্তল ভেদিয়া এই সকল সকরুণ অভাব ও অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া তাহার কানে পশিয়াছে।… নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সেই মনের মাঝখানে গৃহিণীপনার সমস্ত দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও ইহার সকল কার্য তাহারই মত করিতে পারে, এই কথাই তাহার মনে হইল।'

নারীর এই বিশিষ্ট প্রেমরূপ শরৎচন্দ্রের অপরূপ সৃষ্টি।

জীবানন্দের সান্নিধ্যে এসেই ষোড়শীর মধ্যে ফিরে এলো সেই বিস্মৃতপ্রায় অলকা। নিজের মধ্যে নারীত্বের এই জাগরণকে ষোড়শী দুহাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইলো কিন্তু পুরোপুরি ধরতে পারল না। একদিকে তার অভ্যস্ত জীবনযাপন প্রণালী, দেবীর প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্য, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিবাহের স্মৃতি ও সংস্কার, অন্যায় ও পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ এবং 'সর্বোপরি তাহার ভালবাসার ধন ভদ্রসন্তান, ব্রাহ্মণ, জমিদার জীবানন্দের তাহার মত সাধারণ নারীর সহিত মিলনে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ও জীবানন্দের সম্ভ্রম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ষোড়শীর পুরোপুরি অলকায় ফিরিবার পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল।''

এইভাবে যে সমস্যার উদ্ভব হলো, এর টানা-পোড়েনই 'দেনা-

পাওনা' উপন্যাসের কাহিনী। এই উপন্যাসের জীবানন্দ ও ষোড়শী চরিত্র দুটিই শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠ সৃষ্টি। ষোড়শীর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই ? দেখি 'সংগ্রামী কর্মসত্তার সহিত স্নিগ্ধ নারীসত্তার শুদ্ধাচারিণী শুষ্ক ভৈরবীরূপের সহিত কোমল হৃদয়া প্রেমিকারূপের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।···প্রেম-কাহিনীর নায়িকা হিসাবে ষোড়শীর এই মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্র সৃষ্টি অনবদ্য।' সমগ্র উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার জীবন-বিবর্তনে একটা সুস্থ নৈতিকতার, একটা সূক্ষ্ম ধর্মবোধের আবেগ স্পন্দিত হয়েছে। প্রেমের জয়—ইহাই এই উপন্যাসের ফলশ্রুতি।

॥ পঁচিশ ॥

শরৎ-প্রতিভার নূতন দিগন্ত 'পথের দাবী'।

অগ্নিক্ষরা এই উপন্যাসকেই 'উত্তেজক' বলে মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইহা রাজনৈতিক বিপ্লবের উপন্যাস হলেও, এর দ্যোতনা খুব ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তাঁর এই বহুল পঠিত এবং বহু-বিতর্কিত উপন্যাসখানির বিচার এই দৃষ্টিকোণ থেকেই করতে হবে। এই প্রথম ঔপন্যাসিককে আমরা সমস্যার সন্ধানে বের হতে দেখলাম। ঘটনা নয়, মতের প্রচারই এই উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য। সমস্যাপ্রধান উপন্যাস খাঁটি সাহিত্য কিনা এ নিয়ে বর্তমান যুগে প্রশ্ন তুলবার কোন আবশ্যকতা নেই। সাহিত্য যে শুধুই রূপসৃষ্টি, কিংবা সাহিত্যের কারবার শুধু মানব-চরিত্র ও অনুভূতি নিয়ে, শরৎচন্দ্র এই যুক্তি মানতেন না। তাঁর একটি উক্তি আমাদের মনে পড়ছে। একবার এক সাহিত্য-সভায় বলেছিলেন : 'রামায়ণ-মহাভারত থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সকল চিরস্মরণীয় রচনায় মতের প্রচার কোন না কোন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে যা চিরস্মরণীয় হয়েছে, যা শুধু রূপসৃষ্টির জন্যই রচিত হয়েছে বলে মনে হয় তার অন্তরালেও মতবাদের আলোচনা প্রচ্ছন্ন থাকে।'

সামাজিক সমস্যার উল্লেখ থাকলেও 'পথের দাবী' রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের উপন্যাস ; এর বিচার সেইভাবেই করতে হবে। বিপ্লবের উপন্যাস সন্দেহ নেই, কিন্তু এর উপজীব্য বিপ্লব-প্রচার নয়। আসলে দুটি বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষের চিত্র আমরা পাই এই উপন্যাসে। এই সংঘর্ষ শুধু যে বিরোধী মতের অভিব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে তা নয়, উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের ভেতর দিয়েও এই ভাবটি জীবন্ত হয়েছে। বিভীষিকা-পন্থার ভাল-মন্দ দুইটি দিকই দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র। উপন্যাসের মূল সুরটা দেশাত্মবোধই।

পরিণত বয়সে যখন তিনি খ্যাতির শিখরে এসে দাঁড়িয়েছেন; যখন তিনি বাঙালীর জনপ্রিয় গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণে শরৎচন্দ্র প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং এর ফলে তাঁর শিল্পীসত্তা যে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তা বলা যায়। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন :

'But this spell was not to last. As often happens with popular authors, the public tempted him to the role of the preacher, and Saratchandra succumbed. He launched large-scale novels, going out of his way in search of subjects, getting lost in worlds where he did not know his way about. And the final phase was harrowing···So he took on himself the task of feeding his readers with **ideas**—ideas he imagined to be modern and hardly understood. **Pather Dabi, Shesh Prashna** were typical of this last ambitious phase.'[১]

আইডিয়া বা মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে শিল্পীর

১. **An Acre of Green Grass : Buddhadeva Bose.**

ধর্ম থেকে অনেকটা চ্যুত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই দেখি, 'পথের দাবী' পথের মাঝখানেই শেষ হয়েছে। গন্তব্যে কেবল পৌঁছায় নি তা নয়, গন্তব্যের সংকেত পর্যন্ত দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

'পথের দাবী' উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাঁর 'রাজনৈতিক চেতনা স্থূল ছিল বলা চলে। কেতাবী রাজনৈতিক জ্ঞান অথবা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চেতনা তাঁহার মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে এই রাজনৈতিক বোধকে কথা-সাহিত্যে রূপ দিবার ধৈর্যও যেন তাঁহার ছিল না। তাঁহার রাজনৈতিক চেতনার এই আপেক্ষিক স্থূলতা সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার বহুল প্রচারিত 'পথের দাবী' উপন্যাসে।...ইংরেজ-বিদ্বেষের গল্প যতটা হইয়াছে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ইহার ততটা দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।'[১] তথাপি এ-কথা অনস্বীকার্য যে, শরৎচন্দ্রের নিখাদ দেশ-প্রেমই ছিল এই উপন্যাস রচনার মূল উৎস।

শরৎচন্দ্র তাঁর একাধিক উপন্যাসে যে কয়েকটি বিচিত্র, সক্রিয় ও গতিশীল পুরুষ-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, 'পথের দাবী'র সব্যসাচী বা ডাক্তার তার মধ্যে একটি। সব্যসাচী এই উপন্যাসের নায়ক। চরিত্রটির পরিকল্পনা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও নিখুঁত। সর্বত্যাগী, অসমসাহসী, শক্তিধর নায়ক হিসেবেই শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটি এঁকেছেন। কঠিন কর্তব্য-পথে নিয়ত তার নির্ভীক পদচারণা। যেমন ইস্পাত-দৃঢ় সব্যসাচীর নৈতিক চরিত্র, তেমনি বহু-বিস্তৃত তার জ্ঞানের পরিধি। ব্রহ্মদেশ এই কাহিনীর পটভূমি, কিন্তু সব্যসাচীর কর্মক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। তার দেশপ্রেমও অপরিমেয়। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, পরাধীনতার মর্মজ্বালায় সব্যসাচীর অন্তর কি রকম ক্ষতবিক্ষত। অন্যায়, অসত্য ও হীনতার বিরুদ্ধে সে যেন এক মূর্তিমান প্রতিবাদ। অথচ অগ্নিগর্ভ এই মানুষটির ভিতরে একটা কোমল শুভ্র সুন্দর হৃদয় সবসময় জেগে আছে।

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসের মূলকাহিনী সব্যসাচীর কর্মকাণ্ড। 'পথের দাবী' নামক বৈপ্লবিক সমিতি বা সংস্থাটির নায়ক সব্যসাচী আর তার নেত্রী হলো সুমিত্রা। ভারতী সব্যসাচীর অধীনে একজন কর্মী, কিন্তু তার প্রধান পরিচয় সে ভারতীর প্রতি আকৃষ্ট। অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকাহিনী এই উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনী। এই কাহিনীটি ভিন্ন উপন্যাসের সমগ্র কাঠামোটি দাঁড়াত কিনা সন্দেহ। কারণ সব্যসাচীর চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপে দেশজননীর মুক্তির স্বপ্ন ও পরাধীনতার জ্বালা সুন্দরভাবে ফুটে উঠা সত্ত্বেও মুক্তি-সংগ্রামের যথার্থ বাস্তব চিত্র এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। শশীকবি-নবতারার প্রণয় এই উপন্যাসের তৃতীয় কাহিনী। স্বল্পপরিসর হলেও এই কাহিনীটির মাধ্যমে লেখক তাঁর নায়ক-চরিত্রের কোমল দিকটি ফুটিয়ে তুলবাব প্রয়াস পেয়েছেন।

বলেছি 'পথের দাবী' রাজনৈতিক উপন্যাস, কিন্তু এর দ্যোতনা খুব ব্যাপক। এই উপন্যাসে 'ক্ষমাহীন, প্রীতিহীন সমাজ ও ধর্মের দ্বারা যে নারী লাঞ্ছিত ও উপদ্রুত হইয়াছে তাহার ভালবাসিবার অপরাজেয় অধিকারকে শরৎচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। নারীর এই অধিকারকে পথের দাবী বলিয়া অভিনন্দিত করা যাইতে পারে এবং পথের দাবীই শরৎ-সাহিত্যের গোড়ার কথা। সমিতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে দেখি একটি রমণী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে চাহে; তাহার স্বামীর বন্ধু তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছে চিরাচরিত সতীত্বের দোহাই দিয়া। সমিতির সভানেত্রীর কাছে চিরাচরিত সতীত্বের কোন মূল্য নাই, সে নবতারার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে।'[১]

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সুরটি পথের দাবীর স্রষ্টা সব্যসাচীর কণ্ঠে এইভাবে ঝঙ্কৃত হয়েছে: 'জীবনযাত্রায় মানুষের পথ চলবার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র সেই সমস্ত সত্যটাই মানুষ যেন ভুলে গেছে।' ভারতীর কণ্ঠে এই সুর আরো উচ্চগ্রামে উঠেছে: 'আমরা

১. শরৎচন্দ্র : সেনগুপ্ত।

সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী স্বীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙে-চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে। তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ।'

'পথের দাবী' রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের উপন্যাস, কিন্তু এর তাৎপর্যটা রীতিমত সামাজিক। এই প্রসঙ্গে ডঃ সেনগুপ্ত বলেছেন: 'অপূর্ব শুদ্ধাচারী বাঙালী ব্রাহ্মণ, ইহা তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি যাহা পথের দাবীর সভ্যরা অত্যন্ত সম্মান করিয়া চলে। কিন্তু এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের অতি নিষ্ঠাবান পাচকের জীবন রক্ষা হইয়াছে খ্রীষ্টান-ভারতীর হাতের জল খাইয়া। তারপর ভারতী অপূর্বকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে এবং ভারতীর প্রতিও অপূর্বর হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে। এই যে উভয়ের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ—ইহার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে অপূর্বর ধর্মবিশ্বাস। যদি প্রণয়ের পথের দাবীকে শিরোধার্য করিতে হয় তাহা হইলে অপূর্বর ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে সম্মান করা যায় না। অপূর্ব ও ভারতীর সমস্যার শেষ সমাধানের কোন চিত্র আঁকা হয় নাই, সামাজিক আচার ব্যক্তির পথকে কেমন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ করে শুধু তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই গ্রন্থকার উপন্যাসের যবনিকা টানিয়াছেন।'[১]

সন্ত্রাসবাদের দুইটি দিক দুইটি চরিত্রের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। সব্যসাচী ভারতে ইংরেজ রাজত্ব তথা য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ প্রচার করেছে। আবার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেও জোরালো কথাও আছে। সেই বিরোধী মত অভিব্যক্ত হয়েছে ভারতীর কণ্ঠে। সে পথের দাবী সমিতির সম্পাদিকা, কিন্তু যে মুহূর্তে সে এর স্বরূপ বুঝতে পেরেছে সেই মুহূর্তে নির্দ্বিধায় সে এর সংস্রব থেকে দূরে সরে গিয়েছে। সব্যসাচীকে বলেছে: 'তোমার পথের দাবীর ষড়যন্ত্রের বাষ্পে নিশ্বাস আমার রুদ্ধ হয়ে আসছে।' আরো

১. শরৎচন্দ্র: সেনগুপ্ত।

বলেছে ঃ 'কিন্তু একথা আমি কিছুতেই মানবো না যে এ ছাড়া আর পথ নেই, মানুষের সমস্ত খোঁজাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজনের মঙ্গলের জন্য আর একজনের অমঙ্গল করতে হবে এ আমি কোন মতেই চরম সত্য বলে মেনে নেব না—তুমি বললেও না।' সব্যসাচী যখন বলেছে 'হিংসা ছাড়া বিপ্লবের দ্বিতীয় পথ নেই', তখন তার উত্তরে ভারতী বলেছে ঃ 'রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তাহলে তারও তো জবাব রক্তপাত এবং তারও জবাবে এই একই রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলে না।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'পরের দাবী' আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লবের উপন্যাস হলেও, এর বক্তব্য বিপ্লব-প্রচার নয়; দুটি বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষ চিত্র। এই সংঘর্ষ শুধু বিরোধীমতের অভিব্যক্তিকে আশ্রয় করে নি—দুট নরনারীর—সব্যসাচী ও ভারতীর জীবনের মধ্য দিয়ে সত্য ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার ঋত্বিক সব্যসাচী চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক অতিমানব হিসেবে চিত্রিত করেছেন। 'যে পরমাশ্চর্যময়ী রমণী পথের দাবীর সভানেত্রী সে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে। ডাক্তারের হৃদয়ে এই অপরিসীম ভালবাসা অপরূপ স্পন্দন জাগাইয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। ......তাই সুমিত্রাকে শ্রদ্ধা করিলেও তাহার প্রণয়ের প্রতিদান তিনি দিতে পারেন নাই। যখন কাজের আহ্বান আসিয়াছে সুমিত্রাকে অবহেলা করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন, মুহূর্তের জন্য কর্তব্যের পথ হইতে স্খলিত হয়েন নাই।[১]

সব্যসাচী বিস্ময়কর চরিত্র সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র তার ভাব ও চিন্তার চিত্র দক্ষতার সঙ্গেই এঁকেছেন। তথাপি পাঠকদের মনে হবে যে, এই অতিমানবের জীবনের রহস্য তিনি পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন নি। সব্যসাচী ও সুমিত্রার ভালবাসার চিত্রটি মাত্র কয়েকটি স্থূলরেখায় আঁকা হয়েছে; অন্যদিকে অপূর্ব-ভারতীর প্রেমচিত্র

১. শরৎচন্দ্র ঃ সেনগুপ্ত।

উপন্যাসের অনেকখানি স্থান জুরে আছে এবং এর ফলে কাহিনীর রাজনৈতিক উত্তাপ অনেকখানি কমে গিয়েছে। তাই একজন সমালোচক বলেছেন: 'বাস্তবিক 'পথের দাবী' উপন্যাসকে যদি রাজনৈতিক উপন্যাস বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ইহাতে অপূর্ব-ভারতীর প্রেম যেভাবে ব্যক্তি-প্রেমের প্রাধান্য লইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ইহার মূলসুরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা চলে না।... অপূর্ব-ভারতীর প্রেম-উপন্যাসের রাজনৈতিক পটভূমিকে পিছনে ফেলিয়া আপন মাধুর্যের পরিমণ্ডলেই আশ্রয় পাইয়াছে।' চমকপ্রদ কাহিনী সত্ত্বেও, 'পথের দাবী' আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের **For Whom the Bell Tolls** উপন্যাসখানির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। সন্দেহ নেই লেখক একটা স্বতন্ত্র মন নিয়ে এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন, তথাপি 'পথের দাবী'তে সেই শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই না যাঁর লেখনী থেকে আমরা পেয়েছি 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ'—এই উপন্যাস দুটিতে যে উচ্চাঙ্গের কলাসৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, তার বিন্দুমাত্র আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই না। কাহিনী রচনার ত্রুটি সত্ত্বেও 'পথের দাবী' একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ হিসেবে বাংলা সাহিত্যে গৌরবের স্থান নিয়ে আজো বিরাজ করছে। করবেও চিরদিন। কারণ এই অগ্নিক্ষরা উপন্যাসখানিই একদা এই দেশে সন্ত্রাসবাদীদের মনে তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছিল। তারও একটা মূল্য আছে।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটি নিয়ে বাদানুবাদ কম হয় নি। তথাপি এই উপন্যাসেই শরৎ-প্রতিভার একটা নূতন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এ পর্যন্ত যা তিনি লিখে এসেছেন তা সবই হৃদয়াবেগে সমৃদ্ধ; এইবার দেখা গেল তারই বিপরীত দিক—বুদ্ধি ও বিতর্কের খেলা। 'শেষ প্রশ্ন' তাই একান্তভাবেই বুদ্ধি-প্রাধান্য উপন্যাস। অনেকের মতে, এই উপন্যাস 'বুদ্ধির কচকচিতে ভারি, ইহার কাহিনীতে উপন্যাসের কাহিনীর জমজমাট ভাব নাই, আখ্যানের শিথিল গ্রন্থনও

সহজেই চোখে পড়ে।……সমগ্রভাবে তত্ত্বের অত্যধিক চাপে এ উপন্যাসে শিল্পকলা বিকশিত হইতে পারে নাই।' এ অভিযোগ নিরর্থক নয়। কারণ, 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে মতবাদের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। যেখানে মতবাদ সেখানে শিল্পকলার স্থান কোথায়? আরো লক্ষ্য করবার বিষয়, যে মতবাদ এখানে স্থান পেয়েছে তার সঙ্গে লেখকের জীবনদর্শনের কোন সাদৃশ্য অথবা যোগ নেই। এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই বিপুলায়তন এই উপন্যাস পাঠকদের নিরাশ করে—তাদের কাছে বৈচিত্র্যহীন ও শুষ্ক মনে হয়।

আবার কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র হৃদয়ের স্বধর্ম ত্যাগ করে অনেকটা মস্তিষ্কধর্মী হয়ে উঠেছেন। এই মস্তিষ্কধর্মী সৃষ্টির মাঝে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয় নি। সেটা যেন একটা কৃত্রিম পথ অবলম্বন করে পাঠককে চমকিত করতে চেষ্টা করেছে—এই চমকিত করার শক্তিকে সাহিত্য মূল্য হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন। আমরা কিন্তু এই অভিমত পুরোপুরি মানতে রাজী নই। শরৎচন্দ্র নিজেই 'শেষ প্রশ্ন' প্রসঙ্গে বলেছেন: 'আরো একটা কথা মনে ছিল। সে অতি আধুনিক সাহিত্য। ভেবেছিলাম এই দিকটার একটা ইশারা রেখে যাব। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগত প্রায়, তবুও ভাবীকালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়তো পাবে যে নোংরা না করেও অতি আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। 'কেবল কোমল পেলব সহানুভূতিই নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড় কাজ।'[১]

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকুর পর আমরা উপন্যাসটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। 'শেষ প্রশ্ন' যুগান্তরকারী রচনা। এখানে মানুষকে—সামাজিক ও নৈতিক মানুষকে—কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র দেখলেন, সেইটাই আমাদের বোঝা দরকার। বইটির নাম 'শেষ প্রশ্ন'। এর

[১] ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লেখা চিঠি; ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের বর্তমান কালের এবং চিরন্তন কালের ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সত্তা এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্নে আকীর্ণ। শরৎচন্দ্র কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রশ্ন যখনই উত্থাপন করেছেন, তখনই বুঝতে হবে প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিতটাও তাঁর মধ্যে ছিল, সচেতনতার মাত্রা তার যা-ই হোক না কেন। উত্তরের ইঙ্গিত যার বোধের মধ্যে আসে নি, প্রশ্নও তার মনে জাগতে পারে না। তাঁর চারদিকের জগৎ ও জীবনকে দেখে দেখে শরৎচন্দ্রের বোধের মধ্যে কতকগুলি জিনিস বিশেষ সচেতনভাবে না হলেও ধরা পড়েছে।

উপন্যাসের মূল কাহিনীতে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে প্রশ্নগুলি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানব-জীবনের শেষ প্রশ্ন বলতে শরৎচন্দ্র কি অনুমান করেছেন সেটি বিচার করে দেখা যাক। জীবনে মানুষের কাম্য কি? আনন্দ, পরিতৃপ্তি। কিন্তু এই চাওয়ার শেষ কোথায়? জীবনের একমুহূর্তে যা পেলে সুখী হয় পরমুহূর্তে তাকেই মূল্যহীন বলে ত্যাগ করে। এই তো মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যা—এই শেষ প্রশ্নের জবাব কি? আশুবাবু বলেছিলেন: 'কোন দেশেই মানুষের পূর্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তাহলে সৃষ্টি থেমে যেত। এর চলার আর কোন অর্থ থাকত না।' চিরন্তন গতিশীল মানবজীবনে তার চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, জীবন-প্রত্যয়েরও পরিবর্তন চলেছে—নব নব প্রশ্ন আসছে, নব নব উত্তর চাইছে সে। অতএব এই শেষ প্রশ্নের শেষ জবাব নেই। ব্যক্তিকে ঘিরে এই চিরন্তন সমস্যাটি পৃথিবীর অগ্রগতির মূলধন।

মানুষের জীবন হওয়া এবং মুছে যাওয়ার অন্তহীন প্রকাশের একটি ধারা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আসলে জীবনটা কোন বস্তু কিংবা কোন বস্তুর অবস্থা বিশেষ নয়—একটি অবিচ্ছিন্ন গতি বা পরিবর্তন মাত্র। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কমল। শেষ প্রশ্নের প্রাণধর্মের উপাসিক সে। সংস্কার এবং বাধাহীন স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন-চিত্ততার প্রতীক সে। তার জন্ম ইতিহাস ও শিক্ষা তাকে এটা

দিয়েছিল। সে সমাজ-সংস্কারের আঁধারে একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। সে একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধিকেই মূল্য দিতে প্রস্তুত, জ্ঞানের দ্বারা যাকে বোঝা যায়, জানা যায় তাকেই সে সমর্থনযোগ্য মনে করেছে। তাই কমল চরিত্রটিকে শিল্পীর একটি সৃষ্টি বলে গ্রহণ করতে বাধা নেই। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর **The Soul Enchanted** উপন্যাসে **Annette**-কে যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন, শরৎচন্দ্রও কমলকে ঠিক সেইরকম একটি চরিত্র হিসেবেই দাঁড় করিয়েছেন।

কমলের কাছে জীবনের অর্থ, জীবনের মূল্য কি রকম? আশুবাবু বলেছেন: 'জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র, আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখের পথ রোধ করে না। ওর অনাগত তা-ই, যা আজও এসে পৌঁছয় নি। তাই ওর আসাও যেমন দুর্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়।' উপন্যাসে দেখি, সমাজ, সম্মান, সহানুভূতি, সম্পদ—কিছুই তো কমলের ছিল না, তবু শিবনাথ যখন চলে গেল ভরা নদীর মাঝখানে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে, তখনও অত বড় নিঃসহায়তাও এই আশ্চর্য মেয়েটিকে কাবু করতে পারে নি। এ সম্ভব হলো কি করে? তার ক্ষণমাধুর্যময় সুষ্ঠু স্বচ্ছন্দ সাবলীল জীবন-প্রবাহের জন্য। এই প্রাণের সহজ চলন কত জায়গাতেই তার জীবনে রূপলাভ করেছে! কমল সহজ প্রাণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে অব্যাহত ও সমুজ্জ্বল সে রাখতে পারে নি। কেন ও কোথায় তা উপন্যাসে সুন্দরভাবেই দেখান হয়েছে।

কমল বলেছে: 'এ জীবনে সুখ দুঃখের কোনটাই সত্যি নয়; সত্যি শুধু তাব চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু।' সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের বিচিত্র ঘটনাবলী নিয়ে কমলের প্রাণপ্রবাহের যে ছন্দের পরিচয় আমরা পেলাম তার মধ্যে সংযমহীনতার ছন্দপতন তো কোথাও নেই। কমলের জীবন-কাহিনী লেখক যেভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাতে এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক

যে, বাইরের শাসনকে মানতে কুণ্ঠিত বলেই সে অতি সংযমের বিরোধী। 'মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি নিরন্তর অভিব্যক্তির পথ খুঁজিয়া বেড়ায় পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়া। সামাজিক অনুশাসন অভিব্যক্তির উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে সংহত করে, নিয়মিত করে। কমল এই অনুশাসনকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে নাই এবং ইহা কখনই তাহার আদর্শের অঙ্গ হইতে পারে না, তাঁহার আদর্শ আনন্দানুভূতি। তাই যেখানে সে দেখিয়াছে যে আনন্দের সুধাপাত্র আত্মোৎসর্গের শোষণে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই তাহার চিত্ত দুঃখে ও বিরক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে।'[1] এই মানসিকতার বলেই কমল তার জীবনের সব রকম ফাঁকিকে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মেনে নিতে পেরেছিল। এই তো তার মতবাদ। একেই সে তার জীবনে সত্য করে তুলতে চেষ্টা করেছে।

শিবনাথের সঙ্গে কমলের বিচ্ছেদ উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। এর ভেতর দিয়েই কমলের মতবাদ বা ফিলজফি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সতীত্বের ভার থেকে মুক্ত, আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত এই চরিত্রটির নির্মাণে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রেমহীন, প্রয়োজনহীন জীবনকে যে নারী টেনে নিয়ে যেতে চাইল না, সে নারী নিঃসন্দেহে অসাধারণ। এমনি নারী কিরণময়ী, এমনি নারী কমল। এরাই তো পারে সমাজের মুখের উপর নিজেদের অস্তিত্বের পতাকা তুলে ধরবার জন্য সাহস করে এগিয়ে আসতে। কমল দুঃখকে অনেকটা দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে দেখেছে, এই তত্ত্বের ছাপ মেরে নিজের হৃদয়কে স্বাভাবিক অতীত চিন্তা থেকে জোর করে সরিয়ে এনে বর্তমানমুখী করে তুলেছে। কমনীয় নারীমনে দুঃখের সর্বাত্মক প্রভাবের বিচারে কমল শরৎচন্দ্রের একক সৃষ্টি। টুর্গেনিভের 'রুদিন' (**Rudin**) উপন্যাসের রুদিন-চরিত্রটির সঙ্গে কমলের কিছুটা মিল আছে। তর্ক-প্রতিভা ও বাগ-বৈদগ্ধ্যে দুটি চরিত্রই উজ্জ্বল। কমলের বিদ্রোহী প্রকৃতির মধ্যে নারীর স্বরূপের চিরকালের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এমন কথা কোন কোন সমালোচক বলেছেন, কিন্তু আসল কথা হলো এই যে দুইটি হৃদয়-

১. শরৎচন্দ্র : সেনগুপ্ত।

বৃত্তির—প্রেমের উগ্রতা ও মমতা—মিলিত রূপ কমলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং যাঁরা বলেন, যুক্তিবাদের ফুলঝুরির আলোকে কমলকে যতটুকু দেখা যায়, তাতে তাকে জৈবাবেগপূর্ণ একটি স্বাধীন-চিত্ত নারী বলেই মনে হয়, তাঁরা এই চরিত্রটির অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন নি।

'শেষ প্রশ্ন' সমস্যা কণ্টকিত উপন্যাস। এই জাতীয় উপন্যাসে গল্পাংশের বিরলতা থাকবেই এবং কথার তুবড়ী এই জাতীয় উপন্যাসেই বেশি করে জ্বলে ওঠে। কমলের মতবাদের মধ্যে দুটি দিক আছে—একটি অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চায় আর একটির লক্ষ্য বর্তমানের সুখভোগের প্রতি। একটা যাচাই করা হয়েছে শিবনাথের প্রতি ব্যবহারে আর একটির পরিচয় মেলে অজিতের সঙ্গে প্রণয়ের আদান-প্রদানে।' তবে এই প্রণয়ের আদান-প্রদানের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যের অভাব। আর একটি কথা। এই উপন্যাসের যে পটভূমি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখকের ছিল কিনা সন্দেহ। এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে সমস্যা তার জটিলতা হয়তো শরৎচন্দ্রের পক্ষে কিছুটা অনায়ত্ত ছিল। এই মন্তব্য দ্বারা শরৎ-প্রতিভাকে আমরা খর্ব করছি না। সমস্যা নিয়ে লিখবার প্রয়োজন তিনি শুধু হৃদয় দিয়ে নয়, সাহিত্যকর্মে স্বীকার করতে চেয়েছিলেন বলেই এই বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য উপন্যাসের সৃষ্টি।

সবশেষে একটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করব। তিনি আশুবাবু। 'উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, অথচ তাঁহার প্রশান্ত হাস্যে উপন্যাসখানি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে নানা প্রকারের চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে—গুণী অথচ চরিত্রহীন শিবনাথ, ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র, বিপ্লবী রাজেন, ভাবপ্রবণ অজিত, শুদ্ধাচারিণী হিন্দুবিধবা নীলিমা ও বিদ্রোহী কমল। ইহারা বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। কিন্তু আশুবাবু সকলের মনের কথা বুঝিয়াছেন, সকলকেই ভালবাসিয়াছেন, সকলের শ্রদ্ধা সমানভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মনের প্রশস্ততা অসাধারণ, তাই

সকলের অন্তরে তিনি সমানভাবে প্রবেশ করতে পারেন, কোন লোকের প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা নাই।…তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততার সঙ্গে আর একটি জিনিস জড়িত ছিল। তাহা হইতেছে বৈরাগ্য।'[১] এমন একটি উদার পবিত্র ও সদাপ্রফুল্ল চরিত্রের পরিকল্পনা শরৎ-সাহিত্যে এই প্রথম ও শেষ। বোধ করি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেও এইরকম একটি মহৎ চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলবে না। একমাত্র শরৎচন্দ্রের পক্ষেই এই চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব।

শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের সার্থক সৃষ্টি 'বিপ্রদাস'।

আজ বিংশ শতকের প্রায় ক্রান্তিলগ্নে এসে এই উপন্যাসখানির যথার্থ সমালোচনা করা খুবই কঠিন। এটি রচনার সময় থেকে জগতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কাজেই এখনকার মন নিয়ে এর বিচার করা অসমীচীন। এই উপন্যাসটিকে অনেকেই শরৎচন্দ্রের পরিণত শিল্পী-মানসের সার্থক সৃষ্টি বলতে কুণ্ঠিত হয়েছেন; এমন কি কেউ কেউ এটিকে 'শরৎচন্দ্রের নিকৃষ্টতম রচনা' বলে কঠোর মন্তব্য করেছেন।

আসল কথা, নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে শিল্পী দুর্বল ছিলেন। এ-কথা মিথ্যা নয় যে, 'শেষ প্রশ্নের' শিল্পকলাগত একটা মূল্য ছিল এবং লেখক স্বয়ং এ বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন (এ উপন্যাস সম্পর্কে নানাজনকে লেখা একাধিক পত্রে তার নিদর্শন মিলবে)। কিন্তু যেই মাত্র তিনি বুঝলেন চারদিকের আবহাওয়া তেমন অনুকূল নয় অমনি তিনি তাঁর কলমের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন—'শেষ প্রশ্নের' পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। 'বিপ্রদাস' এই পশ্চাদপসরণের দৃষ্টান্ত। 'শেষ প্রশ্ন' ও 'বিপ্রদাস' উপন্যাস দুটির প্রকাশ-কালের মধ্যে মাত্র চার বছরের ব্যবধান। একটিতে হিন্দুবিবাহ প্রথার মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়েছে, অপরটিতে সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যের বিজয়-নিশান উড়েছে। আধুনিকতা থেকে শরৎচন্দ্র এবার পশ্চাৎদিকে

১. শরৎ-চেতনা : বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ ফেরালেন—হয়ে উঠলেন একজন পুরোদস্তুর ঐতিহ্যবাদী। একেই বোধ হয় শিল্পীর মৃত্যু বলা হয়।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বন্দনা। কঠোর আচারনিষ্ঠ মুখুজ্যে পরিবার ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতীক, অন্যদিকে বন্দনা পাশ্চাত্ত্য-চিত্তের প্রতীক। সে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় শিক্ষিত, বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে সে জীবনকে পেতে চায়, বুদ্ধি দিয়েই সে নিজের পাওনাকে পেতে চায়, কিন্তু বিপ্রদাস-সতীর কঠোর ধর্মজীবন ও ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যে যে চারিত্রিক শক্তি ও স্বস্তিকে সে দেখতে পায় তা-ই তার শিক্ষা ও সংস্কারের মূলে আঘাত করে। ব্যক্তিগত চাওয়া ও বুদ্ধিবৃত্তির মূল্য যে জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয় বন্দনা সে কথা বুঝেছিল এই পরিবারের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের পর।

বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ ও পরিবারের সামগ্রিক রূপের যে বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব তারই সুন্দর চিত্র আমরা পাই 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে। বন্দনার প্রেমজীবনে এসেছিল সুধীর, অশোক, বিপ্রদাস ও দ্বিজদাস। কিন্তু বিপ্রদাসের সংস্পর্শে এসেই বন্দনার মনে হলো—পূর্বরাগের পালা আসলে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। 'নিজেকে চিনতে না পেরে একদিন আপনার কাছে অপরাধ করেছিলুম। ভুল ভেঙেছে, আজ তার মার্জনা চাই।' বিপ্রদাসের কাছে বন্দনার এই অকপট স্বীকৃতির মধ্যেই সে প্রেমকে প্রথম সত্যি করে চিনল। বন্দনা তার নারীজীবনে এই প্রেমকে চিনেছিল বলেই না সে দ্বিজদাসকে স্বামী-রূপে গ্রহণ করতে পেরেছিল এবং সুধীর, অশোকের প্রেম তুচ্ছ প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। একদিকে সতীর সংগ্রামহীন নিরুত্তাপ জীবন, অন্যদিকে বন্দনার সংগ্রাম শ্রান্ত জীবন—'বিপ্রদাস'-এর কাহিনী এই দুই চিত্তলোকের প্রতিচ্ছবি।

বিপ্রদাসের চরিত্র রহস্যময়, ঠিক বাস্তব নয়, বরং সে যেন অপ্রকাশ্য একটা আদর্শের প্রতীক। তার চরিত্রে অতিমানবসুলভ বেদনাময় একাকীত্ব, কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অপূর্ব সংযম্ ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক গুণের পরিচয় নেই। অকপট, প্রগল্ভ দ্বিজদাসের

চরিত্রটি সরল সজীব ও সুন্দর। পৃথিবীর একটি মানুষ; পৃথিবীর মানুষের মতই সুখ-দুঃখ আনন্দ, বেদনা প্রেম-বিরহে তার অন্তর দোলায়িত হয়েছে। মুখুজ্যে পরিবারের ছকবাঁধা জীবনের প্রতি তার স্বাধীন চিত্ত বিরূপ হয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহ করে নি। আগ্রহের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা তার স্বাধীনচিত্ততাকে খর্ব করে শান্ত করেছে।

শরৎচন্দ্র সংরক্ষণশীল এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন। এ অভিযোগ বিচার্য। সামাজিক কতকগুলি যুক্তিহীন প্রথা অনুশাসনের প্রতি একটা বিদ্রোহভাব সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ত্যাগভিত্তিক হৃদয়ধর্মী আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। অন্ততঃ 'বিপ্রদাস' পড়তে পড়তে মনে হয়, এই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার যে বৃহত্তর কল্যাণ ও সামগ্রিক ঐক্য রয়েছে একথা তিনি ভুলতে পারেন নি, যদিও তিনি ব্যক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতেও কার্পণ্য করেন নি এই উপন্যাসের মধ্যে 'পথের দাবীর' মত একটা রাজনৈতিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু উহা তাঁর হৃদয়বোধের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই উপন্যাসে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাবিক্ষোভ শ্রেণীসংগ্রামের চিত্র ফুটাবার যে সম্ভাবনা ছিল, উপন্যাসটি শেষের দিকে সম্পূর্ণ হৃদয়প্রধান উপন্যাস হয়ে দাঁড়াবার ফলে সেই ইঙ্গিতও সম্ভাব্য পরিণতি লাভ করতে পারে নি।

গ্রন্থের প্রথম দৃশ্যে বলরামপুরের জমিদারবাড়ির ছোট ছেলে দ্বিজদাস জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেছে, কিন্তু জমিদারবাড়ির সম্মুখে এসে মিছিল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, কারণ দ্বিজদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমিদার বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় স্বগৃহের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিছিলের দিকে তাকাবার পর আনুষঙ্গিক ধ্বনিসহ মিছিল চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহস মিছিলকারীদের হয় নি। এই দৃশ্য থেকে স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে, জমিদার-প্রজার সংঘর্ষে 'বিপ্রদাস' শ্রেণীসংগ্রামমূলক বলিষ্ঠ উপন্যাসের রূপ পাবে এবং বিপ্রদাস ও দ্বিজদাস দুই ভাই সমস্যার বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করে উপন্যাসখানির গতি ও শক্তিবৃদ্ধি করবে। কিন্তু

পাঠকের এই প্রত্যাশা ঔপন্যাসিক পূর্ণ করেন নি। উপন্যাসটি আরম্ভ হওয়ার কয়েক পৃষ্ঠার পর থেকেই এর রাজনৈতিক জৌলুষ বা সম্ভাবনা মিলিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত 'বিপ্রদাস' সম্পূর্ণ হৃদয়সমস্যামূলক উপন্যাসে দাঁড়িয়েছে। দুই ভাই কাহিনীর প্রথম অংশের পর নিজ নিজ অন্তরের কোমল তরল ভাবতরঙ্গে ভেসে গিয়েছে, রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে তারা সরে গিয়েছে দূরে। তাইতো আমাদের মনে হয়েছে, বিশাল শরৎ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার স্থান খুবই সংকীর্ণ, যদিও তাঁর জীবনেতিহাসে আমরা দেখেছি যে, স্বদেশের পরাধীনতা এবং সেই পরাধীনতার আনুষঙ্গিক সব সমস্যার জন্য তিনি সত্যিই উদ্বিগ্ন ছিলেন।

নারীর অপত্যস্নেহ—তা আপন সন্তানের ক্ষেত্রেই হোক আর পরের ছেলের প্রতি হোক—শরৎপ্রতিভার একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে দয়াময়ী চরিত্রটি এই অপত্যস্নেহের একটি সুন্দর চিত্র। দয়াময়ী বিপ্রদাসের বিমাতা। তিনি পারিবারিক কলহের সময় কন্যার মুখ চেয়ে বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে জামাতা শশধরের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে পুত্রস্নেহ বর্ষণের ক্ষেত্রে তিনি আপন পুত্র দ্বিজদাসের তুলনায় সপত্নীপুত্র বিপ্রদাসকেই অধিকতর স্বীকার করেছেন। সতীর শ্রাদ্ধের পর পুত্র দ্বিজদাসের কাছে সর্বক্ষমতাময়ী জমিদার-গৃহকর্ত্রীরূপে না থেকে দয়াময়ী বিপ্রদাসের সঙ্গে অজানা তীর্থের দুঃখ-কঠিন পথে পাড়ি দিয়াছেন।

শরৎ-সাহিত্যে জমিদার অনেক। সেখানে কোন জমিদার ভাল, কোন জমিদার মন্দ। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের জমিদার বিপ্রদাস। গ্রন্থের প্রথম দিকে লেখক বিপ্রদাসকে কড়া জমিদার হিসেবে দেখিয়েছেন, তাকে 'অত্যাচারী জমিদার' বলা হয়েছে। কলকাতায় তার মস্ত বাড়ি, সেখানে বিরাট তেজারতি কারবার চলে। বিপ্রদাস প্রথম দিকে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে বাধা দেয়, বিদ্রূপ করে। উপন্যাসের গোড়ায় বিপ্রদাস প্রশংসাভাজন তো নয়ই, বরং প্রতিক্রিয়াশীলরূপে পাঠকদের অশ্রদ্ধাভাজন। এর পরে ঘটে তার

অবস্থার পরিবর্তন। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিতে এক থাকলেও স্নেহশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতৃবৎসল পুত্র, দায়িত্বশীল গৃহকর্তা, দৃঢ় চরিত্রবান পুরুষ, সহৃদয় ভদ্রলোক ও নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ হিসেবে বিপ্রদাস যতই ফুটে উঠেছে, তার প্রতি লেখকের তথা পাঠকের অনুরাগ ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। উপন্যাসে বিপ্রদাসের মধ্যে শরৎমানস অনেকটা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাঙালীর যৌথ পরিবার প্রথার প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। সত্যিকারের অনুরাগ ছিল এবং যখনই সুযোগ পেয়েছেন সেই অনুরাগ বা পক্ষপাতিত্ব তিনি প্রদর্শন করেছেন। 'বিপ্রদাস' ঔপন্যাসে তাই দেখি, দ্বিজদাস অনমনীয় মনোবলে বিপ্রদাসের সঙ্গে মুখুজ্যেবাড়ির ভাঙন প্রতিরোধ করেছে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, শরৎচন্দ্র সামাজিক কাঠামোর পুরাতন মহৎ ও সুন্দর দিকগুলি বাঁচিয়ে রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার এটাও একটা হেতু ছিল।

একজন সমালোচক বলেছেন: 'শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনা বলিষ্ঠ হলে 'বিপ্রদাস' অন্য দিক হইতে মূল্যবান উপন্যাস হইতে পারিত। গ্রন্থের প্রথমে যে সম্ভাবনা ছিল, হৃদয়-প্রধান উপন্যাস সৃষ্টির আবেগে তাহা যেন ইচ্ছা করিয়াই সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে মনোরম গল্প, চমৎকার চরিত্র, হৃদয়ের নরম ভাবগুলির লীলাখেলায় 'বিপ্রদাস' সুখপাঠ্য উপন্যাস হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উপন্যাসের গ্রন্থনে যে চিন্তা বা মননশক্তি প্রকাশের সুযোগ ছিল, যে অর্থনৈতিক চেতনার সম্ভাবনাময় স্পর্শ গ্রন্থারম্ভে দেখা গিয়াছিল, তাহার সার্থক বিকাশ ঘটিলে 'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানি নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস এক বিশিষ্ট সংযোজন হইতে পারিত।' আমরা এই অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত।

কিন্তু এই উপন্যাসের আরো একটা বড় ত্রুটি আছে। শরৎচন্দ্র আধুনিক সমাজের বা সেই সমাজের মানুষদের যেটুকু ছবি এঁকেছেন, ানবিক ঔদার্য-সমন্বিত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায়ই সেখানে

লেখকের কেমন যেন একটা বিরূপভাব লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, সেই সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সেই সমাজের খুঁটিনাটি তিনি দেখিয়েছেন, সেই সমাজের মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন এবং তাদের কথাই তিনি প্রধানতঃ এঁকেছেন। আধুনিক অভিজাত নাগরিক জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা না থাকাই সম্ভব, কিন্তু প্রাচীনপন্থী সামাজিক জীবনের প্রতি কিছুটা আবেগসম্পন্ন ছিলেন বলেই বোধ হয় তিনি এই আধুনিক নাগরিক ভাবকে বহুলাংশে এড়িয়ে গিয়ে যেটুকু এঁকেছেন তার মধ্যেই সেই বিষয়ে তাঁর কেমন যেন অশ্রদ্ধার ভাবই ফুটেছে।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিপ্রদাসের বাড়ির আবহাওয়ায় প্রাচীনপন্থী ভাব সুস্পষ্ট। বন্দনা আধুনিকা প্রবাসিনী, এ বাড়ির পরিবেশ তার পক্ষে প্রীতিপ্রদ মনে হওয়ার কথা নয়। এর বিপরীতে বালিগঞ্জে তার মাসীমার বাড়ির আধুনিকতামণ্ডিত পরিবেশ তার প্রীতিপ্রদ মনে হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। অথচ সেখান থেকে ফিরে এসে বন্দনা বিপ্রদাসের কাছে সেই পরিবেশের নিন্দা যেভাবে ও যে ভাষায় করেছে তার মধ্যে অশ্রদ্ধার ভাবটাই ফুটে উঠেছে। এটা বলা যায়, লেখকের ইচ্ছাকৃত এবং শিল্পের দিক থেকে এটি একটি বড় রকমের ত্রুটি। আসল কথা, চরিত্রের পরিস্ফুটনে ও পটভূমিকা রচনায় শরৎচন্দ্র তাঁর পরিচিত গণ্ডির বাইরে যেতে চাইতেন না। পল্লীগ্রামের মানুষ তিনি, সেখানকার রূপ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর যে সুবিপুল অভিজ্ঞতা ছিল, সে অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর প্রধান অবলম্বন মধ্যবিত্ত সংসারের পরিচিত পটভূমি। তাই দেখা যায় আধুনিক উচ্চবিত্ত নাগরিক জীবনের কাহিনীর রূপায়ণে তিনি খুব কম প্রয়াস পেয়েছেন—মধ্যবিত্ত আচার-আচরণের মধ্যে শরৎ-প্রতিভার সমধিক স্ফুরণ ঘটেছে। পরিচিত জগৎ ও জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকবার এই চেষ্টা শরৎ-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে স্নিগ্ধ রসসঞ্চার করেছে। আজো তিনি যে আমাদের প্রিয়তম গল্পকার, সে তো এইজন্যই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
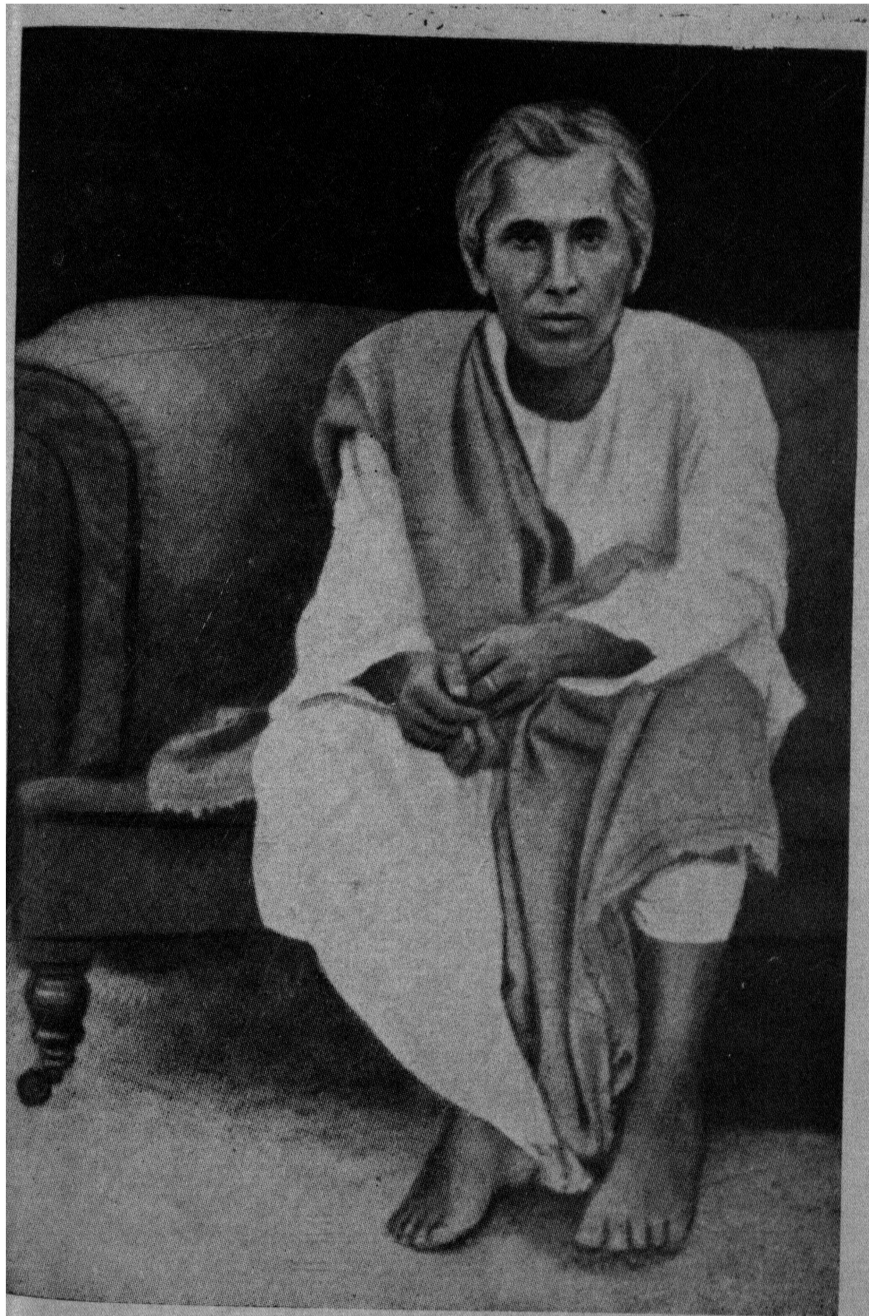
পরিশিষ্ট

(ক) শরৎ-সাহিত্যের মণিমুক্তা

(খ) পত্রাবলী

(গ) শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র

(ঘ) জীবনপঞ্জী

পরিশিষ্ট

(ক)

শরৎ-সাহিত্যের মণিমুক্তা

১। সব মেয়ের মত আমিও আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবু কেন তাতে আমার মন উঠল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্যও তা একদিনের জন্যে কামনা করি নি। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হত। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায়-ক্রান্তিতে আদায় করে যখন আমাকে পথে বের করে দিলেন, লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না, তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্বনাশী, এ তুই করেচিস কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক, আগামী জন্মে হোক, কোটি জন্ম পরে হোক, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

—স্বামী

২। অসম্ভব বলিয়া শেখর ললিতার আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। প্রথম ক'টা দিন মনে মনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে হঠাৎ সে আসিয়া উপস্থিত হয়, পাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, পাছে এইসব লইয়া লোকের কাছে জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু কেহই তাহার কৈফিয়ত চাহিল না, কোন কথা প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিংবা সে-বাড়ি হইতে এ-বাড়িতে কেহ আসা-যাওয়া পর্যন্ত করিল না। শেখরের ঘরের সুমুখে যে খোলা ছাদটা ছিল, তাহার উপরে দাঁড়াইলে ললিতাদের ছাদের সবটুকু দেখা যাইত; পাছে দেখা হয়, এই ভয়ে সে এই ছাদটায় পর্যন্ত দাঁড়াইত না। কিন্তু যখন নির্বিঘ্নে এক মাস কাটিয়া গেল, তখন সে নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, হাজার হোক মেয়েমানুষের লজ্জা-সরম আছে, এসকল ব্যাপার সে প্রকাশ করিতেই পারে না। সে

শুনিয়াছিল, ইহাদের বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিতে চাহে না, এ-কথা সে বিশ্বাস করিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাহাদের দেহে এই দুর্বলতা দিয়াছেন বলিয়া সে মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিল। অথচ শান্তি পাওয়া যায় না কেন? যখন হইতে সে বুঝিল আর ভয় নাই, তখন হইতেই এক অভূতপূর্ব ব্যথায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রহিয়া রহিয়া হৃদয়ের অন্তরতমস্তল পর্যন্ত এমন করিয়া নিরাশায়, বেদনায়, আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে কেন? তবে তো ললিতা কোন কথাই বলিবে না? আর একজনের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় পর্যন্ত মৌন হইয়া থাকিবে। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরে-বাহিরে তাহার এমন করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে কেন?

—পরিণীতা

৩। সেই নির্বাক স্বামীর আনত মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া, ইন্দু আর কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে নিঃশব্দে গেল বটে—এমন অনেক দিন গিয়াছে; কিন্তু আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রের মনে হইল, তাহার বুকে বড় বেদনার স্থানটা ইন্দু যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়া মাড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। একবার ঈষৎ ঘাড় তুলিয়া স্ত্রীর নিষ্ঠুর পদক্ষেপ চাহিয়া দেখিল; যখন আর দেখা গেল না, তখন গভীর—অতি গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নির্জীবের মত সেইখানেই এলাইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা আজ প্রথমে মনে উদয় হইল, সমস্ত মিথ্যা—সব ফাঁকি। এই সংসার স্ত্রী-কন্যা, স্নেহ-প্রেম—সমস্তই আজ তাহার কাছে এক নিমিষে মরুভূমির মরীচিকার মত উবিয়া গেল।

—দর্পচূর্ণ

৪। কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে। রাজশয্যায় শয়ন করিয়া ইন্দ্রত্বের মুখ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছিলাম, টানিয়া কে যেন সুখের স্বপ্নটুকু ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অর্ধরাত্রে উঠিয়া বসিয়াছি, ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমার আজীবন সহচর সেই অর্ধছিন্ন খট্টায় শুইয়া আছি—আমি কাঁদিব, না হাসিব? সুখের স্রোতে অনন্তে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ যেন একটা অজানা দলের পাশে

আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আর বুঝি কখনও ভাসিয়া যাইতে পাইব না। সব যেন উল্টাইয়া গিয়াছে। জীবনের কেন্দ্র পর্যন্ত কে টানিয়া পরিধির বাহিরে লইয়া গিয়াছে! কিছুই যেন তার ঠাহর হয় না। একি হইল? নিশীথে সত্যেন্দ্রনাথ জানালায় বসিয়া সাগরপুরের অন্ধকার দেখিতেছিল। গাছপালা কি একটা নিস্তব্ধভাবে সত্যেন্দ্রের সহিত বিনিময় করিতেছিল।

সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস বহিয়া গেল। কিছু বলিয়া গেল কি? বলিল বৈকি! সেই এক কথা। সব জিনিসেই সেই এক কথা বলিয়া বেড়ায়। হইয়াছে? পাপিয়া আর চোখ গেল বলে না, ঠিক যেন বলে মরে গেল। বৌ-কথা-কও পাখিও আর আপনার বোল বলে না। সেও বলে, বৌ মরে গেছে। সব জিনিস সেই একই কথা বার বার কহিয়া বেড়ায় কেন? সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস যেন ঐ কথাই কহে—নেই, নেই, সে নেই!

—বোঝা

৫। এতদিন জীবনটাকে সে যে ভাবে পাইয়াছে সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে চণ্ডীর ভৈরবী—ইহার যে দায়িত্ব আছে, কর্তৃত্ব আছে, সম্পদ আছে, বিপদ আছে—স্মরণাতীত কাল হইতে ইহার অধিকারিণীগণের পায়ে পায়ে যে পথ পড়িয়াছে, তাহা কোথাও সংকীর্ণ কোথাও প্রশস্ত, পথ চলিতে কেহ-বা সোজা হাঁটিয়াছেন, কাহারও বা বাঁকা পদচিহ্ন পরম্পরাগত ইতিহাসের অঙ্কে বিদ্যমান। ইহার অলিখিত পাতাগুলো লোকের মুখে মুখে কোথাও বা সদাগরের পুণ্য-কাহিনীতে উদ্ভাসিত, কোথাও বা ব্যভিচারের গ্লানিতে কালো হইয়া আছে, তথাপি ভৈরব-জীবনের সুনির্দিষ্ট ধারা কোথাও এতটুকু বিলুপ্ত হয় নাই। যাত্রা করিয়া সহজ ও দুর্গম, দুর্জ্ঞেয় ও জটিল অনেক গলি-ঘুঁজি অনেককেই পার হইতে হইয়াছে, তাহার সুখ ও দুঃখভোগ কম নয়; কিন্তু কেন, কিসের জন্য, এ প্রশ্নও বোধ করি কেহ কখনো করে নাই, কিংবা ইহাকে অস্বীকার করিয়া আর কোন একটা পথ খুঁজিতেও কাহারো প্রবৃত্তি হয় নাই। ভাগ্য-নির্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্যে দিয়েই ষোড়শীর জীবনের এই কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহাকে ভৈরবীর জীবন বলিয়াই সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে। একটা দিনের তরেও আপনার জীবন নারীর জীবন বলিয়া ভাবে নাই। চণ্ডীর সেবায়েত বলিয়া সে নিকটে ও দূরের বহু গ্রাম ও জনপদের গণনাতীত নর-নারীর সহিত সুপরিচিত। কত সংখ্যাতীত রমণী—

কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহ বা সমবয়সী—তাহাদের কত প্রকারের সুখ-দুঃখ, কত আশা-ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশকুসুমের নির্বাক ও নির্বিকার সাক্ষী হইয়া আছে ; দেবীর অনুগ্রহ লাভের জন্য কতকাল ধরিয়া কত কথাই না ইহারা গোপনে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, দুঃখী জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি অকপটে তাহার চোখের উপর মেলিয়া ধরিয়া প্রসাদ-ভিক্ষা চাহিয়াছে ; এ সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণী-হৃদয়ের কোন অন্তস্তল ভেদিয়া এই সকল সকরুণ অভাব ও অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া এতকাল ধরিয়া তাহার কানে আসিয়া পশিয়াছে। ইহাদের গঠন ও প্রবৃত্তি এমনি কোন এক বিভিন্ন জগতের বস্তু, যাহাকে জানিবার ও চিনিবার কোন হেতু, কোন প্রয়োজন তাহার হয় নাই ; সেই প্রয়োজনের প্রথম আঘাত এইখানে পরিত্যক্ত অন্ধকার আলয়ে এই প্রথম তাহার গায়ে লাগিল।

—দেনা-পাওনা

৬। ষোড়শীর প্রশ্নের উত্তরে জীবানন্দ যখন বলিয়াছিল তাহার ভাবনার আদি-অন্ত নাই, তখন সে মিথ্যা বলে নাই, বোধ করি বাড়াইয়াও বলে নাই। এ-জীবনে নিজের জীবনকে সে কখনও আলোচনার বিষয় করে নাই, এবং কোনদিন কোন প্রয়োজনই তাহার মুহূর্তের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পায় নাই। তাই তাহার ক্ষণকালের রুমালের প্রয়োজন, ক্ষণপরে ঢাকাই চাদরের ঢের বড়, তাই আস্তরণের অভাবে শয্যায় তাহার বহুমূল্য শাল পাতা, এইজন্যই সে হাতের কাছে এ্যাশট্রে না পাইলে সোনার ঘড়ির ডালার উপর জ্বলন্ত চুরুট রাখিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করে না। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে সত্য বস্তু নয়। যে আসে নাই, সেই অনাগতের প্রতি সে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র করে না। নারীর যে দেহটা সে চোখে দেখিতে পায়, তাহারই প্রতি তাহার আসক্তি, কিন্তু চোখ মেলিয়া যাহাকে দেখা যায় না, সে তাহার দেহের অতিরিক্ত যে নারীত্ব—তাহার প্রতি তাহার কোন লোভই ছিল না। কিন্তু গ্রহবশে যৌবনের একান্তে আসিয়া আজ যে গহনে সে পথ ভুলিয়াছে, ইহার কোন সন্ধানই সে জানিত না। কিসের জন্য যে অলকার আশেপাশে মন তাহার অহর্নিশি ঘুরিয়া মরিতেছে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধনায় যৌবন তাহার ক্ষুব্ধ নিপীড়িত, রূপ যাহার কঠিন ও কান্তিহীন, তাহাকে অনুক্ষণ কামনা করিয়া

সংসার যখন তাহার এমন বিস্বাদ হইয়া গেল, তখন কারণাতীত এই মোহের কৈফিয়ত সে যে নিজের কাছেই খুঁজিয়া পাইত না। কোন্ অবিদ্যমানে এই রমণী যে তাহার কোন অপূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবে, কি তাহার প্রয়োজন, এই অপরিচিত চিন্তার সে কূল পাইত না।

—দেনা-পাওনা

৭। বিশ্বচরাচরের যেদিকে খুশি চেয়ে দেখ, ওই এক কথা ঠাকুরপো। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার জন্যই থাক, কিন্তু এর কাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ। দেখতে পাবে, এর প্রতি অণু-পরমাণু নিরন্তর আপনাকে নূতন করে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন করে সে নিজেকে বিকাশ করবে, কোথায় গেলে, কার সঙ্গে মিশলে, কি করলে সে আরও সবল আরও উন্নত হবে, এই তার অক্লান্ত উদ্যম। দৃশ্যে-অদৃশ্যে, অন্তরে-বাহিরে প্রকৃতির তাই এই নিত্য পরিবর্তন, এবং এইজন্যই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখতে পায়—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর আরও সার্থক করে তুলতে পারবে, সে লোভ সে কোনমতেই থামাতে পারে না।

—চরিত্রহীন

৮। দিবাকর হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়াছিল, সে কি বৌদি, অবৈধ-প্রণয় যদি অন্যায় নয়, তবে সংসারে আর অন্যায় আছে কোথায়?

কিরণময়ী বলিয়াছিল, অবৈধ কোথায়? যাকে অবৈধ বলে মনে করচ, সে তোমার সংস্কার—যুক্তি নয়। ভাল, তোমার অবৈধ জিনিসটি কি শুনি?

দিবাকর উদ্দীপ্ত হইয়া জবাব দিয়াছিল, যাহা বিবাহের দ্বারা সুপবিত্র নয়—যাকে সমাজ স্বীকার করবে না—যাকে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব ঘৃণার চক্ষে দেখবে, তাই অবৈধ। এ সোজা কথা।

কিরণময়ী হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল, কৈ সোজা? একটু ভেবে দেখলে সোজা কথাও এমনি বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় যে, দুনিয়ার অনেক বাঁকা জিনিসই হার মেনে যায়। তোমাকে তো অনেকবার বলেছি ঠাকুরপো, তোমার ঐ সুপবিত্র-অপবিত্র জ্ঞানটা সংস্কার—যুক্তি নয়। এই সংসারেই স্ত্রী-পুরুষের এমন অনেক মিলন হয়ে গেছে, যাকে কোনমতেই পবিত্র বলা যায় না।

আমি নজির তুলে আর কথা বাড়াতে চাইনে ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছে হয়, ইতিহাস-পুরাণ পড়ে দেখো। অথচ সে-সব মিলনকেও সমাজ স্বীকার করেছিল এবং অবশেষে বিয়ের মন্ত্র দিয়েও সুপবিত্র করে নেওয়া হয়েছিল।

—চরিত্রহীন

৯। অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ-সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা শুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে নব নব রূপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বপ্নদেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল; কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা-দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া? কেমন করিয়া শোকার্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন তো আগুন নয় কাঙালী, সেই তো হরি! তার আকাশ-জোড়া ধুঁয়ো তো ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই তো স্বর্গের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার! তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

১০। অন্ধকার গভীর নিশীথে গফুর মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার কেহ ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই।

আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লাহ্! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন মাপ করো না।

—মহেশ

১১। রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা তো ততই অন্ধকার! অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্বলোকাশ্রয় আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো,……এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে তো কোনদিন জানি নাই!

—শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব

১২। আজ সারা দিনটাই কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়া ছিল। অপরাহ্ণ-সূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠেও ইহারই একান্তবর্তী একঝাড় বাঁশ ও গোটা দুই তেঁতুল গাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না, কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাঙিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায় নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিচিত হাসি মুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব মনে হইল। হয়তো এ কেবল আকাশের রঙ নয়; হয়তো যে আলো আর এক রমণীর কাছ হইতে একমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়ে নি কেন বল তো? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডানদিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে।

—শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্ব

১৩। দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় ভরা ধূলা-বালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহু কোটি অকৃতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর কোনদিন তোমার সেবায় তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কিনা জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ-জীবনে কখনো ভুলিব না।

—শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্ব

১৪। বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সম্মুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে

লাগিল, পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ, প্রান্তর, গ্রামান্তরের বনরেখা, নদী, জল—সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিমঝিম করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই—পরিচয় নাই—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গিয়াছে—এখন তন্দ্রা ভাঙিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক হইয়া তাকাইয়া আছে। চলিতে চলিতে তাহার চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল, এবং মুছিতে মুছিতে বার বার বলিতে লাগিল, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না।

—দত্তা

১৫। গলির সুমুখে হাজরাদের তেতলা বাড়ির আড়ালে সূর্য্য অদৃশ্য হইল। এই লইয়া তাহার পিতার সঙ্গে বিজয়ার কত কথা হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে পড়িল কত সন্ধ্যায় তিনি ওই চেয়ারের উপর বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, বিজয়া আমার দেশের বাড়িতে কখনও এ দুঃখ পাই নি। সেখানে কোন হাজরার তেতলা ছাদই আমার শেষ সূর্য্যাস্তটুকুকে এমন করে কোনদিন আড়াল করে দাঁড়ায় নি। তুই তো জানিস নে মা, কিন্তু আমার যে চোখ দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে আছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমাদের ফুলবাগানের ধারে ছোট নদীটি এতক্ষণ সোনার জলে টলটল করে উঠেছে। আর তার পরপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, মাঠের পর মাঠের শেষে এখনও সূর্যঠাকুর যাই যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন নি।

—দত্তা

১৬। বিপ্রদাস যখন তাহার বাড়ির সম্মুখ দিয়া যাওয়া দ্বিজদাসের পরিচালিত কৃষক শোভাযাত্রাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল: তোমাদের রকমারি নিশান আর বড় বড় বক্তৃতাকে আমি ভয় করি নে। বেশ বুঝি ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত দিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচানোই যায় তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।

দ্বিজদাস মৃদুকণ্ঠে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করিয়া জবাব দিল: দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশি যে হয় না এ আমি জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সংসারে সত্যকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে, কামড়াবার দিন এলে তাদের অভাব হয় না।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বটে!

—**বিপ্রদাস**

১৭। বলিতে বলিতে সেই পাষাণ দেবতার কণ্ঠস্বর যেন একটু কাঁপিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, বড়দা আমাকে ভালবাসতেন। কাঁদতে দেখে একটিবার মাত্র চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—মেয়েদের মত এইসব গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আর কাঁদিসনে শৈল। কিন্তু রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখে নি তাদের তুই জীবনে ক্ষমা করিস নে। এই ক'টা কথা, এর বেশি আর একটা কথাও তিনি বলেন নি। ঘৃণায় একটা উঃ আঃ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বের হল না, এই অভিশপ্ত পরাধীন দেশ চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল আমিই জানি ভারতী, কত মস্ত বড় প্রাণ সেদিন বের হয়ে গেল।..... এই কথাটা আমার তুমি মনে রেখ ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই, একদিন মুসলমানদের হাতেও এদেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এত বড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার! এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন।

—**পথের দাবী**

১৮। কারখানার মালিকেরা কিছুতেই চায় না যে কেউ তোমাদের দুঃখদুর্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার জানোয়ার। তোমরা যে তাদেরি মত মানুষ, তেমনি পেটভরে খাবার, তেমনি প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েচ এই সত্যটাই এরা সকল শক্তি সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের

কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়। এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্ম-রক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, হিন্দু নেই, মুসলমান নেই—জৈন, শিখ, কোনো কিছুই নেই—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।

—পথের দাবী

১৯। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যে বিপ্লব বাঁধানো যায় না। একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হলো আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই তো আমার মূলধন, ভারতী। সেই তো আমার অবলম্বন।......তোমার নমস্য নেতাদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে তাঁরা যে কি চান, কতটুকু আসল, কতটুকু মেকী, কি পেলে নমস্যদের কান্না থামে তার কিছুই আমি জানি নে। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তারা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি, আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে—হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দে মাতরমের দিব্যি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবো। দেখি কার সাধ্য বাধা দেয়। এ যে কী প্রার্থনা এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত ভারতী।......চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এদেশের আইন। সুতরাং আইনের বাইরে এইসব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা তো কোনদিন কিছুই দাবী করেন না।

—পথের দাবী

২০। অপূর্বর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং যাহাকে সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাইতো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়ে তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে

করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,—সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, এ তো কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই তো ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার।

—পথের দাবী

২১। ঝড়ের পূর্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজন সত্ত্বেও সমস্ত বাড়িটা সেইরূপ অশুভ ভাব ধরিয়া রহিল। বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও, চাকর-দাসীরা যেন কেমন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া আরও দুইদিন কাটিল। যাঁহারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে বিদায় লইলেন। পিসিমা তাঁহার ছেলেমেয়ে লইয়া বর্ধমানে চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়াই সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কাহারো সহিত বাক্যালাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্বাক হইয়া গিয়াছেন। গোকুল পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়—ভিতরে বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চার দিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্রকন্যা ছাড়া এ-বাড়িতে আর যেন কোন মানুষ নাই।

—বৈকুণ্ঠের উইল

২২। রাখাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।……তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন? বক্ষের নিগূঢ় অন্তস্তলে এ কে কথা কয়? কি বলে? স্বর অস্ফুটে কানে আসে, ভাষা বুঝা যায় না কেন! কত শত মেয়েকে সে চেনে, কতদিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্যে গল্পে-গানে হাসিতে কৌতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই— মনের কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে, কিন্তু সারদার—এই একটিমাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে বিস্ময় আজ মূর্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল, এ-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায় তাহার তুলনা? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ? তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে

সে অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল ? এরই কি জয়গানের অন্ত নাই ? এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেল না ?

—শেষের পরিচয়

২৩। সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা ? ও ঘটে আচম্‌কা হঠাৎ সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো তেরো বছরে কত মেয়েকেই তো দেখলুম, আজ হয়তো সর্বনাশের পাঁকের তলায় কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু তারা আমার একটা কথাও জবাব দিতে পারে নি, আমার পানে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দু'চোখ জলে ভেসে গেছে—ভেবেই পাই নি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভিশাপ দেবে। দেখে তিরস্কার করবো কি, নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি, নিষ্ঠুর দেবতা ! তোমার রহস্যময় সংসারে বিনা দোষে দুঃখের পালা গাইবার ভার দিলে কি শেষে এইসব হতভাগীদের পরে ! কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এমনিই হয়।

—শেষের পরিচয়

২৪। এখন এই কথাটিই মহিম মনে মনে বলিতে লাগিল, অচলার অপরাধের বিচার না হয় পরে চিন্তা করিবে, কিন্তু এই আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের (রামবাবু) এই ধর্ম কোন সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল ? যে ধর্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম এবং মানবজীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোন্‌খানে ? যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্তনারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এত বড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম ? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করিতেছে ?

—গৃহদাহ

২৫। বাহিরে মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারা রাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-জল তেমনভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিল।

—গৃহদাহ

২৬। এত বড় জমিদারীর দৈবাৎ আজ তুমি মালিক, তাই তোমার বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে আর একজনকে অনাহারে আত্মহত্যা করতে হবে, এতো হতেই পারে না; এবং যে সমাজ-বিধানে এত বড় অন্যায় করাও আজ তোমার পক্ষে সহজ হতে পারল এ বিধান যতদিনের প্রাচীন হোক, কিন্তু এটা সমাজের চূড়ান্ত এবং শেষ বিধান হতে পারে না। আমি বুড়ো হয়েছি, সেদিন চোখে দেখে যাবার আমার সময় হবে না, কিন্তু একথা তুমি নিশ্চয় জেনো দিদি, অক্ষম অকর্মণ্য বলে আজ যাদের তোমরা বিচারের ভান করছ, তাদেরই ছেলেপুলের কাছে আর একদিন তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন মনুষ্যত্বের আদালতে কেবল জমিদারির মালিক বলেই আরজি পেশ করা চলবে না।

—জাগরণ

২৭। বিজলী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী! আজীবনের সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবু যে এটা নারীদেহ। ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে।... হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু'পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।...বলিল, আর না, বাইজী মরেচে— যে রোগে আলো জ্বললে আঁধার মরে, সূয্যি উঠলে রাত্রি মরে, আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু!

—আঁধারে আলো

২৮। তখন ঘরে সন্ধ্যার আলো জ্বালা হয় নাই। সেই অন্ধকারে লুটাইয়া জ্ঞানদা তাহার লাঞ্ছিত সাজসজ্জা খুলিয়া ফেলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। দুর্গা মড়ার মত পড়িয়া রহিলেন। খানিক পরে মেয়েটা কঠিন অপরাধীর মত নীরবে মায়ের পদপ্রান্তে আসিয়া যখন বসিল, জননী জানিতে পারিয়াও সাড়া দিলেন না। তবে পরে তেমনি নিঃশব্দে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অভুক্ত পীড়িত কন্যা শ্রান্তির ভারে সেইখানেই ঘুমাইয়া ঢলিয়া পড়িল। সমস্ত অনুভব করিয়াও মায়ের প্রাণে আজ লেশমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না।

দুর্গার এমন অবস্থা যে কখন কি ঘটে বলা যায় না। তাহার উপর যখন তিনি পাড়ার সর্বশাস্ত্রদর্শী প্রবীণাদের মুখে শুনিলেন তাঁহার প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা শুধু যে পিতৃপুরুষদিগেরই দিন দিন অধোগতি করিতেছে তাহা নহে—তাহার নিজেরও মরণকালে সে কোন কাজেই আসিবে না—তাহার হাতের জল ও আগুন দুই-ই অস্পৃশ্য তখন শাস্ত্র শুনিয়া এই আসন্ন পরলোকযাত্রীর পাংশুমুখ কিছুক্ষণের জন্য একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া রহিল। বহুদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত ঘা খাইয়া তাঁহার স্নেহের স্থানটা কি একপ্রকার যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। যে মেয়ের প্রতি তাঁহার ভালবাসার অবধি ছিল না, সেই মেয়েকেই দেখিলে জ্বলিয়া উঠিতেছিলেন। আজ এই সংবাদ শোনার পর তাহার পরলোকের কাঁটা মেয়েটার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত চিত্ত একেবারে পাষাণের মত কঠিন হইয়া গেল। মায়া-মমতার আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

—অরক্ষণীয়া

২৯। দিনের পর দিন যায়—এ দুটি বালক-বালিকার আমোদের সীমা নাই—সমস্ত দিন রোদে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া মারধোর খায়, আবার সকালবেলায় ছুটিয়া পালাইয়া যায়, আবার তিরস্কার প্রহার ভোগ করে। রাত্রে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায়; আবার সকাল হয়, আবার পলাইয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। অন্য সঙ্গী-সাথী বড় কেহ নাই, প্রয়োজনও হয় না। পাড়াময় অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে দুইজনেই যথেষ্ট। সেদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরেই দুইজন বাঁধে গিয়া নামিয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহরে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, সমস্ত জল ঘোলা করিয়া, পনেরটা পুঁটিমাছ ধরিয়া

যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। পার্বতীর জননী কন্যাকে রীতিমত প্রহার করিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দেবদাসের কথা ঠিক জানি না; কেননা এসব কাহিনী সে কিছুতেই প্রকাশ করে না। তবে পার্বতী যখন ঘরে বসিয়া খুব কাঁদিতেছিল, তখন বেলা দুইটা-আড়াইটার সময় একবার জানালার নীচে আসিয়া অতি মৃদু কণ্ঠে ডাকিয়াছিল, পারু, ও পারু।

—দেবদাস

৩০। দেবদাস হাত তুলিতে চাহিল, কিন্তু হাত উঠিল না, শুধু তাহার চোখের কোণ বাহিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। গাড়োয়ান তখন বুদ্ধি খাটাইয়া অশ্বত্থতলায় বাঁধানো বেদিটার উপর খড় পাতিয়া শয্যা রচনা করিল। তাহার পর দেবদাসকে তুলিয়া আনিয়া তাহার উপর শয়ন করাইয়া দিল। বাহিরে আর কেহ নাই, জমিদারবাটী নিস্তব্ধ নিদ্রিত। দেবদাস বহু কষ্টে পকেট হইতে একশ' টাকার নোটটা বাহির করিয়া দিল। লণ্ঠনের আলোকে গাড়োয়ান দেখিল, বাবু তাহার পানে চাহিয়া আছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। সে অবস্থাটা অনুমান করিয়া নোট লইয়া চাদরে বাঁধিয়া রাখিল। শাল দিয়া দেবদাসের মুখ পর্যন্ত আবৃত; সম্মুখে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, নূতন বন্ধু পায়ের তলায় বসিয়া ভাবিতেছে।

ভোর হইল। সকালবেলা জমিদারবাটী হইতে লোক বাহির হইল,—এক আশ্চর্য দৃশ্য! গাছতলায় একজন লোক মরিতেছে। ভদ্রলোক। গায়ে শাল, পায়ে চক্‌চকে জুতো, হাতে আংটি। একে একে অনেক লোক জমা হইল। দেবদাস সকলের পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল—একটা কথাও বলিতে পারিল না, শুধু চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া কহিল, শ্বাস উঠছে, এখনি মরবে।

—দেবদাস

৩১। পত্নীশোকে প্রিয়বাবুর বড় বাজিল। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনিও বুঝিলেন, তাঁহাকেও অনেকদিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না। এইবার কমলার অনেক কাজ পড়িল; নিজের সুখ-চিন্তা ব্যতীতও পৃথিবীতে অনেক

কিছু করিতে হয়। বৃদ্ধ পিতা ক্রমশঃ অপটু হইয়া আসিতেছেন, কমলা সর্বদাই পিতার নিকট থাকিতে লাগিল। আর কাশীনাথ? সে সৃষ্টিছাড়া লোক। এইবার যেন সময় বুঝিয়া পুস্তকের রাশি লইয়া গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া বসিল। যখন পুস্তকে মন লাগে না, তখন বাহির হইয়া যায়। কখনও হয়ত একাদিক্রমে দুইদিন ধরিয়া বাটীতেই আসে না। কোথায় আহার করে, কোথায় নিদ্রা যায়, কেহই জানিতে পারে না। এসব দেখিয়া শুনিয়া কমলা একরকম হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে যুবতী হইলেও এখনও বালিকা মাত্র। স্বামী-প্রীতি, স্বামী-ভক্তি এখনও তাহার শিক্ষা হয় নাই। শিখিতেছিল—বাধা পড়িয়াছে; আবার স্বামী কর্তৃকই বাধা পড়িয়াছে। তাহার দোষ কি? সে যাহা শিখিয়াছিল ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিল। যেসব সোনার দাগ বুকের মাঝে ঈষৎ পড়িয়াছিল, তাহা এখনও উজ্জ্বল হয় নাই, বাহিরের সৌন্দর্য এখনও ভিতরে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে নাই—অযত্নে অসাবধানতায় তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যখন একেবারে মিলাইয়া গেল—কমলা তখন জানিতেও পারিল না। একখানা ভগ্ন অট্টালিকার দুই-একখানা ইট, দুই-এক টুকরা কাঠ পাথর বুকের মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে—কখনও কখনও দেখিতে পাইত, কিন্তু সে সকল একত্র করিয়া আবার জোড়া দিয়া অট্টালিকা গাঁথিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। এখানে এক সময়ে একটা রাজপ্রাসাদ ছিল, প্রমোদ-কানন ছিল—স্বপ্নের ঘোরে আসিয়াছিল, স্বপ্নশেষে চলিয়া গিয়াছে। সে স্বপ্ন ফিরিয়া দেখিবারও তাহার আর সাধ নাই। যাহা গিয়াছে—তাহা গিয়াছে।

—কাশীনাথ

৩২। কমল কহিল, ইংরাজীতে emancipation বলে একটা কথা আছে। আপনি তো জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়াও তার একটা বড় অর্থ ছিল। সেদিনের ছেলে-মেয়েরা মিলে কিন্তু শব্দটা তৈরী করে নি; করেছিল আপনাদের মত যাঁরা মস্ত বড় পিতা, নিজেদের বাঁধন দড়ি আলগা করে যাঁরা আপন কন্যা-সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যানসিপেশনের জন্য যত কোঁদলই মেয়েরা করি না কেন, দেবার আসল মালিক যে পুরুষেরা, আমরা মেয়েরা নই, জগৎ-

ব্যবস্থায় এ সত্যটা আমি একটি দিনও ভুলি নে আশুবাবু। আমারও নিজের বাবা প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীর ক্রীতদাসের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল সে'দিন মনিবের জাতেরাই, নইলে' দাসের দল কোঁদল করে, যুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জন করে নি। এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই নিয়ম; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব তো তাদেরই। মনোরমাকে মুক্তি দেবার ভার আপনার হাতে। মণি বিদ্রোহ করতে পারে. কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে তো সন্তানের মুক্তি থাকে না, থাকে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদের মধ্যে।

—শেষ প্রশ্ন

৩৩। জগদ্ধাত্রী অনেকটা যেন টলিতে টলিতে বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরঘরের বারান্দার উপর জলপূর্ণ কলসীটাকে ধপ করিয়া রাখিয়া দিয়া সিক্তবস্ত্রে সেইখানেই বসিয়া পড়িতে তাঁহার দুই চক্ষু তপ্ত অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

তাঁহার ওই একমাত্র সন্তান। তাঁহার বড় আদরের সন্ধ্যা রূপে ও গুণে যথার্থই লক্ষ্মীর প্রতিমা, সেই প্রতিমার বিসর্জনের আহ্বান আসিল গোলোক চাটুয্যের নরককুণ্ডে। যে গোলোক কন্যার মাতামহের অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহারই হাতে সমর্পণ করার চেয়ে যে তাহার মৃত্যু ভাল, এ তাঁহার বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু মুখ দিয়া 'না' কথাটাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেও নাকি ব্রাহ্মণ কুলীনেরই মেয়ে—সমাজে এবং পরিবারে ইহা যে কিছুই বিচিত্র নয়—ইহার চেয়েও বৃহত্তর দুর্গতি নাকি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—তাই নিজের মেয়ের কথা স্মরণ করিয়া অন্তরটা ধুধু করিয়া জ্বলিতে থাকিলেও, ইহাকে অসম্ভব বলিয়া নিবাইয়া ফেলিবার একবিন্দু জল কোনদিকে চাহিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। একাকী বসিয়া নিঃশব্দে কেবলই অশ্রু মুছিতে লাগিলেন, এবং কেবলই মনে হইতে লাগিল, অচির ভবিষ্যতে হয়তো ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবে—হয়তো এই মানুষটার দুর্জয় বাসনাকে বাধা দিবার কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইবেন না। উহার সেদিনের সকৌতুক রহস্যালাপের কথাগুলাই তাঁহার ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই

স্মরণ হইতে লাগিল—তাহার মধ্যে যে এতখানি গরল গোপন ছিল, তাহা কে সন্দেহ করিতে পারিত!

—বামুনের মেয়ে

৩৪। গোটা-দুই প্রকাণ্ড খাট জুড়িয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এত বড় শয্যাতেও কিন্তু তাঁহাকে স্থানাভাবে সংকুচিত হইয়া সারা রাত্রি কষ্টে কাটাইতে হইত। এ লইয়া তিনি রাগারাগি করিতেও ছাড়িতেন না, আবার বাড়ির কোন ছেলেকে একটা রাত্রিও তিনি কাছ-ছাড়া করিতে পারিতেন না। সমস্ত রাত্রি তাঁহার সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, অনেকবার উঠিতে হইত; কোনদিনই সুস্থ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিতেন না, অথচ শৈল কিংবা আর কেহ যে এইসকল উৎপাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে এ অধিকারও কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার এত বড় অসুখের সময়ও জ্যাঠাইমার বিছানা ছাড়া কোন ছেলেরই কোথাও ঘুমাইবার স্থান ছিল না। কানাইয়ের শোয়া খারাপ, তাহার জন্য এতটা স্থান চাই; ক্ষুদে প্রায়ই একটা অপরাধ করিয়া ফেলিত, তাহার জন্য অয়েল-ক্লথের ব্যবস্থা; বিপিন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহার আর একপ্রকার বন্দোবস্ত; পটলের আড়াই প্রহরের সময় ক্ষুধা বোধ হইত, শিয়রের কাছে সে আয়োজন রাখিতে হইত; খেঁদীর বুকের উপর কানাই পা তুলিয়া দিয়াছে কিনা, পটলের নাকটা বিপিনের হাঁটুর তলায় পড়িয়াছে কিনা, এইসব দেখিতে দেখিতে আর বকিতেই সিদ্ধেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত।

আজ শোবার সময় বিছানার এতখানি জায়গা যে খালি পড়িয়া থাকিবে, শৈলর যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরীর সে হুঁশ ছিল না।…শয্যার প্রতি সিদ্ধেশ্বরী চাহিয়া দেখিলেন, অল্প একটু স্থানের মধ্যে বিপিন এবং ক্ষুদে ঘুমাইতেছে—বাকী বিছানাটা তপ্ত মরুর মত শূন্য খাঁখাঁ করিতেছে।

—নিষ্কৃতি

৩৫। বুড়া বৃন্দাবন সামন্তের মৃত্যুর পরে দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া ও লড়াই করিয়া মাস ছয়েক একান্নে এক বাটীতে কাটাইল, তাহার পরে একদিন পৃথক হইয়া গেল। সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পারিল না। সুতরাং সম্পত্তিটা রহিল দুই

সরিকের। তাহার ফল হইল এই যে, শম্ভু একটা কঞ্চিতে হাত দিতে আসিলেই শিবু দা লইয়া তাড়িয়া আসে এবং শিবুর স্ত্রী বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া হাঁটিলেও শম্ভু লাঠি লইয়া মারিতে দৌড়ায়।

সেদিন সকালে এই বাঁশঝাড় উপলক্ষ করিয়াই উভয় পরিবারে তুমুল দাঙ্গা হইয়া গেল। ষষ্ঠীপূজা কিংবা এমনি কি একটা দৈবকার্যে বড়বৌ গঙ্গামণির কিছু বাঁশপাতা আবশ্যক ছিল। পল্লীগ্রামে এ বস্তুটি দুর্লভ নয়, অনায়াসে অন্যত্র সংগ্রহ করিতে পারিত; কিন্তু নিজের থাকিতে পরের কাছে হাত পাতিতে তাহার সরম বোধ হইল। বিশেষতঃ তাহার মনে ভরসা ছিল, দেবর এতক্ষণ নিশ্চয়ই মাঠে গিয়াছে—ছোট বৌ একা আর করিবে কি।

কিন্তু কি কারণে শম্ভুর সেদিন মাঠে বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে মাত্র পান্তা-ভাত শেষ করিয়া হাত ধুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমনি সময়ে ছোটবৌ পুকুর-ঘাট হইতে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল। শম্ভুর কোথায় রহিল জলের ঘটি—কোথায় রহিল হাতমুখ ধোয়া, সে রৈরৈ শব্দে সমস্ত পাড়াটা তোলপাড় করিয়া তিন লাফে আসিয়া এঁটো হাতেই পাতা কয়টি কাড়িয়া লইয়া টান মাড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাজের প্রতি যে-সকল বাক্য প্রয়োগ করিল, সে-সকল আর যেখানেই শিখিয়া থাকুক, রামায়ণে লক্ষ্মণ-চরিত্র হইতে যে শিক্ষা করে নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

—মামলার ফল

৩৬। সবাই জানিত, একাদশী সদ্‌গোপের ছেলে—জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে কিন্তু এই সমাচারে কালীদহ গ্রামের লোক বিস্মিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্রেয় ছোট বোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল; আবার অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে দাদার ঘরেই সে আদর-যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে এই ভগিনীর এত বড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ

করিয়া গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা একান্ত অনুতপ্তা দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া বারুইপুরে পলাইয়া আসিল।

—একাদশী বৈরাগী

৩৭। এবার বা-থিন বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা একমুহূর্তেই একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই। আছে শুধু বিরাট স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা। এই মুখ তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোওয়াইয়া দিয়া মা শোয়ে কাছে বসিল, দুটি সজল দৃপ্ত চক্ষু তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিয়াই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল? মান্দালয়ের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এই ঘরের বাহিরে গেলেও আমি ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতেই সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বলিয়া দিলাম।

বা-থিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

—ছবি

৩৮। কিন্তু স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নামমাত্রই ত নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই তো একে ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না—এর মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কোথায় মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের

রক্তের মধ্যে সঞ্চিত। সে অর্গল যতদিন না মুক্ত হবে, কোথাও এর সন্ধান মিলবে না। সেই অর্গল মুক্ত করার দিন এসেছে। কোনক্রমেই আর বিলম্ব করা চলে না। কি মানুষের জীবনে, কি দেশের জীবনে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ যখন শূন্য দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে, তখন কিছু না জেনেও যেন জানা যায়, সর্বনাশ অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র পল্লীর অতি ক্ষুদ্র নর-নারীর মুখের 'পরেও আমি তার আভাস দেখতে পাই। চারিদিকে দুর্বিসহ অভাবের মধ্যে কেমন করে যেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়েছে--এদেশে এ থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। দুর্নিবার মরণ তাদের গ্রাস করল বলে।

এদের বাঁচাবার ভার তোমাদের। এ ভার কি তোমরা নেবে না? জগতের দিকে চেয়ে দেখ—এ বোঝা কে বয়েছে। তোমরাই ত! শুধু এ দেশেই কি তার ব্যতিক্রম হবে? শান্তি-স্বস্তিহীন সম্মানবর্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এত বড় লোভের বস্তু? দেশকে কি বাঁচায় বুড়োরা? ইতিহাস পড়ে দেখ। তরুণশক্তি নিজের মৃত্যু দিয়ে, দেশে দেশে কালে কালে জন্মভূমিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে গেছে। এ সত্ত্বেও যদি তোমরা ভোলো, তবে এ সমিতি গঠনের তোমাদের লেশমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়—সে বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা কথা, তোমরা ভুলো না যে, কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফল লাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্য তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না।

—তরুণের বিদ্রোহ

৩৯। মাণ-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেননা তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশি নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্যা নহেন। জল জিনিসটি

নিত্য-প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুন, যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন সেইদিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।

... ...

সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই। সব দেশের পুরুষই একথা বোঝে, কেননা, এটা পুরুষের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় সামগ্রী। এই সতীত্ব যে নারীর কত বড় ধর্ম হওয়া উচিত, রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদিতে সে কথার পুনঃ-পুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এ-দেশে এ তর্ক এত অধিক হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই। কিন্তু সমস্ত তর্কই একতরফা একা নারীরই জন্য। পুরুষের এ-সম্বন্ধে যে বিশেষ কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল, তাহা কোথাও খুঁজিয়া মেলে না, এবং এত বড় একটা প্রাচীন দেশে পুরুষের সম্বন্ধে একটা শব্দ পর্যন্ত যে নাই এ-কথা খুলিয়া বলিলে হাতাহাতি বাধিবে, না হইলে বলিতাম।

সুসভ্য মানুষের সুস্থ সংযত শুভবুদ্ধি যে অধিকার রমণীজাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই মানবের সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়। কোন একটা জাতির ধর্মপুস্তকে কি আছে না আছে, তাহাতেও হয় না। নারীর মূল্য বলিতে আমি এই নীতি ও অধিকারের কথাই এতদূর পর্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ, সহানুভূতি ও ন্যায়-ধর্মের উপরে। ভগবান তাহাকে দুর্বল করিয়াই গড়িয়াছেন, বলের সেই অভাবটুকু পুরুষ এই সমস্ত বৃত্তির মুখের দিকে চাহিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, ধর্মপুস্তকের খুঁটিনাটি ও অবোধ্য অর্থের সাহায্যে পারে না। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জাপান। সে কেবল তাহার নারীর স্থান উন্নত করিতে পারিয়াছে সেইদিন হইতে যেদিন হইতে সে তাহার সামাজিক রীতিনীতির ভালো-মন্দ বিচারধর্মের ও ধর্ম-ব্যবসায়ীর আঁচড় কামড়ের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে।

—নারীর মূল্য

৪০। এ-কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মনু পরাশরের হাত দিয়াই যদি হিন্দুর অবনতি পৌঁছিয়া থাকে তো উন্নতিও তাঁদের হাত দিয়াই পাইতে হইবে—অন্য কোন জাতির সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, তাহা সে যত উন্নতই হউক, হিন্দুকে কিছুই দিতে পারিবে না। কিন্তু, যে কোন বিধি-ব্যবস্থা হউক, যাহা মানুষকে শাসন করে তাহার দোষগুণ কি দিয়া বিচার করা যায়?… মনু পরাশরের বিধি-ব্যবস্থা আমাদের কি সম্পদ দান করিয়াছে, সে তর্ক তুলিয়া নয়, কি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, শুধু সেই আলোচনা করিয়া সমাজের দোষগুণ বিচার করা উচিত। অতএব আজও যদি আমাদের ঐ মনু পরাশরের সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে ঐ ধারা ধরিয়াই করা চাই। স্বর্গই হউক আর মোক্ষই হউক, সে কি দিতেছে, সে বিচার করিয়া নয়, বরঞ্চ সব বিপদ হইতে সে আজ আর আমাদের রক্ষা করিতে পারিতেছে না, শুধু এই বিচার করিয়া।

মানবের মনের গতি বিচিত্র। তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য। তাহার সুখ-দুঃখের ধারণা বহু প্রকার। কালের পরিবর্তন ও উন্নতি অবনতির তালে তালে সমাজের মধ্যে সে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। চিরদিন করিয়াছে এবং চিরদিনই করিবে। ইহার মধ্যে সমাজ যদি নিজেকে অদম্য অপরিবর্তনীয় কল্পনা করিয়া, ঋষিদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির উপর বরাত দিয়া, নির্ভয়ে পাথরের মত কঠিন হইয়া থাকিবার সঙ্কল্প করে তো মরিতেই হইবে। এই নির্বুদ্ধিতার দোষে অনেক বিশিষ্ট সমাজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা বিরল নয়; কিন্তু আমাদের এই সমাজ, মুখে যে যাই বলুক, কিন্তু কাজে যে সত্যই মুনিঋষির ভবিষ্যৎ দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তাহার শাস্ত্র জিনিসটিকে লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই, তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, এ সমাজ এখনও টিকিয়া আছে। বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তো বাঁচিয়া থাকা। সুতরাং সে যখন বাঁচিয়া আছে, তখন যে কোন উপায়ে, যে কোন কলা-কৌশলের দ্বারা সে যে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহাও স্বতঃসিদ্ধ।

—সমাজধর্মের মূল্য

৪১। জীবানন্দ। (হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না) সে দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আর যত দিকেই করে থাকি প্রফুল্ল, আমাকে চিনতে না দেওয়ার অপরাধ করি নি। কিন্তু আশ্চর্য এই পৃথিবী এবং তার চেয়েও আশ্চর্য এর মানুষের মন। এ যে কি থেকে কি স্থির করে নেয় কিছুই বলবার যো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে একদিন মরফিয়া চেয়ে নিয়ে চোখ বুজে খেয়েছিলাম, সেই হলো তার সকল তর্কের বড় তর্ক—সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু সে-রাত্রে যে আর কোন উপায় ছিল না—সে ছাড়া যে আর কারও পানে চাইবার কোথাও কেউ ছিল না—এসব ষোড়শী একেবারে ভুলে গেছে। কেবল একটি কথা তার মনে জেগে আছে—যে নিজের প্রাণটা অসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল—তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি করে! ব্যস্, যা-কিছু ছিল চোখ বুজে দিলে আমার হাতে তুলে। প্রফুল্ল, তুনিয়ায় ভয়ানক চালাক লোকেও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসারটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যেত, কোথাও রসের বাষ্পটুকু জমবার ঠাঁই পেত না।

—**ষোড়শী** (নাটক)

৪২। (রাধাপুরের ডাকাতির পর পুলিশ খানাতল্লাশী করিতে রমেশের বাড়ি আসিয়াছে। রমা সেইখানে উপস্থিত ছিল এবং পুলিশের কাছে রমেশকে ফেলিয়া যাইতে আপত্তি করিয়াছিল। রমার চোখে-মুখে ত্রাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে তাহার অনুশোচনা ও আশঙ্কা।)

রমেশ। যতীন ঘুমিয়ে পড়েছে সে যাক। কিন্তু তুমি আর এক মুহূর্ত থেকো না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও। পুলিশ খানাতল্লাসী করতে ছাড়বে না।

রমা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতকণ্ঠে) তোমার নিজের তো কোন ভয় নেই ?

রমেশ। বলতে পারিনে রমা, কতদূর কি দাঁড়িয়েছে সে তো এখনো জানিনে।

রমা। তোমাকেও তো গ্রেপ্তার করতে পারে ?

রমেশ। তা' পারে।

রমা। পীড়ন করতেও তো পারে ?

রমেশ। অসম্ভব নয়।—

রমা। (সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি যাবো না রমেশদা।

রমেশ। (সভয়ে) যাবে না কি রকম ?

রমা। তোমাকে অপমান করবে, তোমাকে পীড়ন করবে, আমি কিছুতেই যাবো না রমেশদা।

রমেশ। ছি ছি, এখানে থাকতে নেই। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে রাণী ?

—**রমা** (নাটক)

৪৩। এবার নারায়ণীর আর সহ্য হইল না। তিনিও কঠিন হইয়া বলিলেন, তুমি কি জানবে মা, কার কাছে কখন আমি হুকুম পেয়েছি ? মা, যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু—বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বুকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বুকে করে এতটুকুকে বড় করে তুলতে হয়, সে-ই জানে, হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে। তোমাকে ভাবতে হবে না মা ; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। ও আমার তিন দিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দিগম্বরী কাঠ হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রাম বুকের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বলিল, না বৌদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হয়েচি, আমার সুমতি হয়েছে—আর একটিবার তুমি দেখ।

নারায়ণী আর একবার তাহার মুখ ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই এখন ভাত খা।

—**রামের সুমতি**

৪৪। মাধব এবার মুখ তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল, তারপর সহজ শান্তকণ্ঠে বলিল, কেন দেব না ? সংসারে যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে, তেমনি ভোগ করে, তার জীবন্ত সাক্ষী আমি নিজে। কবে বাপ-মা মরেছেন জানিও নে ; বড় বৌঠানের মুখে শুনি আমরা বড় গরীব, কিন্তু কোনদিন দুঃখকষ্টের বাষ্পও

টের পেলাম না। কোথা থেকে চিরকাল পরিষ্কার ধবধবে কাপড়-জামা এসেচে, কোথা থেকে স্কুল-কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম, বাসা খরচ এসেচে, তা আজও বলতে পারিনে। তারপরে উকিল হয়ে মন্দ টাকা পাইনে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একরাশ টাকা ঘরে নিয়ে এলে—এমন অট্টালিকাও তৈরী হল অথচ দাদাকে দেখ, চিরকালটা নিঃশব্দে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছেন, ছেঁড়া সেলাই-করা কাপড় পরেচেন—শীতের দিনে তাঁর গায়ে কখনো জামা দেখি নি—একবেলা একমুঠো খেয়ে কেবল আমাদের জন্যে—সব কথা আমার মনেও পড়ে না, পড়বার দরকারও দেখিনে—শুধু দিনকতক আরাম করছিলেন, তা ভগবান সুদসুদ্ধ আদায় করে নিচ্চেন। বলিয়া সহসা সে মুখ ফিরাইয়া একটা দরকারী কাগজ খুঁজিতে লাগিল।

বিন্দু নির্বাক, স্তব্ধ। স্বামীর কত বড় তিরস্কার যে এই অতীত দিনের সহজ কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে-কথা বিন্দুর প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত অনুভব করিতে লাগিল। সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

—বিন্দুর ছেলে

৪৫। বাড়ির সুমুখ দিয়া ইস্কুলে যাইবার পথ। প্রথম কয়েকদিন অমূল্য ছাতি আড়াল দিয়া এই পথেই গিয়াছিল, আজ দু'দিন ধরিয়া সেই লাল রঙের ছাতাটি আর পথের একবার বহিয়া গেল না। চাহিয়া চাহিয়া বিন্দুর চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, তবুও সে চিলে ছাদের আড়ালে বসিয়া তেমনি একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সকাল ন'টা-দশটার সময় কতরকমের ছাতি মাথায় দিয়া কত ছেলে হাঁটিয়া গেল; ইস্কুলে ছুটির পর কত ছেলে সেই পথে আবার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সেই চলন, সেই ছাতি বিন্দুর চোখে পড়িল না! সে সন্ধ্যার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া আসিয়া নরেনকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ নরেন, এই তো ইস্কুলে যাবার সোজা পথ; তবে সে এদিক দিয়ে-আর যায় না?

নরেন চুপ করিয়া রহিল।

—বিন্দুর ছেলে

৪৬। তোমাদের এই বিদ্যামন্দিরে এসে আমার নিজের অধ্যয়ন-জীবনের কথাই আজ বার বার করে মনে পড়ছে। আমারও একদিন তোমাদের মতই

উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে এমনি করে ছাত্রজীবন শুরু হয়েছিল, সেদিন মনে মনে ভাবীকালকে স্মরণ করে কত আশার মুকুলই না রচনা করেছিলাম। কিন্তু স্বপ্ন যত বড় ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য থেকেও ঠিক ততখানিই বঞ্চিত হলাম। বিধাতা যে এমন বঞ্চনা আমার জন্য রেখেছিলেন, ভাবতে পারি নি। বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশ্যে দূর থেকে নমস্কার জানিয়েই একদিন ভবঘুরে হলাম। এমনি করেই আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এসে পৌঁছেচি। এ-জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ ঝলসাতে গেলে সে ফাঁকি এক সময় নিজেকে এসেই বেঁধে। তোমাদের তাই বলবো—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে, তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও, সত্যাশ্রয়ী হও। চোখে দেখে যা পরখ করবে না, জীবনে তাকে কখনো সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়।

—রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্র-সভায় বক্তৃতা

৪৭। মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন ছলেই স্বীকার করো না; সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ—যদি পরম দুঃখের পথও হয়, তা'হলে দুঃখ বরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করো। দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করচে, সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না; তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে।

—কলকাতার ছাত্রছাত্রী সমাজের প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তর

৪৮। গর্ব করবার জিনিস আমাদের একমাত্র আছে—এই ভাষা। এইটা যাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে—সহানুভূতির দিক দিয়েই হউক বা অন্য যে-কোন দিক দিয়েই হউক—যেন তা না হয়। আমি অনেক জায়গায় বলি, এটা যেন না হয়। একটু ধৈর্যের সঙ্গে যা নীতি-বন্ধন আছে তার মধ্য দিয়েই সাহিত্য প্রচার হোক। কোন কাজে কোন অবহেলায় এই জিনিস যেন ছোট না হয়ে যায়—আপনারা এই জিনিসটা মনে করে রাখবেন। কোন একটা জাতির জাগরণ ভাষার মধ্য দিয়েই করতে হয়। যার ভাষা দুর্বল তার উঠবার আশা

নেই। যখনি দেখা যায় কোন জাতি উঠেচে, তখনি দেখা যায় তার সাহিত্যও বড় হয়েছে।

—লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর

৪৯। কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তোমার সপ্ততিতম বর্ষ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজ গগনস্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত সেবক না ইহার নির্মাণ-কল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য, তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়েছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারংবার নমস্কার করি।

—রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত মানপত্র

৫০। এই ৩১-এ ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু একদিন আমি আর থাকব না। সেদিন এ-কথা কারো বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো বা নানা কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না। এই-ই হয়, এমনি করেই জগৎ চলে।

পরিশিষ্ট

(খ)

পত্রাবলী

১

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসেবে সেটা দোষের না হতে পারে—কারণ লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ-রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলাম—একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেণ্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু এই পরের সহিষ্ণুতার জোরে যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ-রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর। তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর। অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ-রাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়; তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না।

আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহ দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে বিরোধ ঘটেছে সেখানে এমনই ঘটবে—রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এ-কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধেরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ-রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানি আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য ও উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমান নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা' আছে সে সম্বন্ধে আমার দু'একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরেজ-রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা

করতাম লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করি নি। করলে Politician-দের propaganda হত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিলনা। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দু'দিন আগে-পিছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক। এ আমার কিন্তু বাংলাদেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না দিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় - হয়ত করতেই হবে, তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এইজন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবি নি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করি নি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যেও হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয় তখন দু'বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ-ছানা-মাখন পায় না বলে কিংবা মুসলমান কয়েদীরা মহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জাবোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল কর্তৃপক্ষ ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়তো তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য-সেবাটাই এই ধরনের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তি কারও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এই বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justification-ও তেমনি আছে।

আমার মতে আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈচৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশী। আপনি যদি আমাকে শুধু এইটুকু আদেশ দিতেন যে এই বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হতো। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখি নি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়েছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময় যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়, দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছা হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন. সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে। ইতি—২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, তোমার ষোড়শী পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম, কেননা নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইটি যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এইরূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেননা তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সংকীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশী করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে-বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ-পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এ কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলিত সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার 'পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি

উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুশি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি—৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৪।

তোমার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু-একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়। সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্রসৃষ্টির জন্যে যতপ্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি, এতে তা পারি নি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সংকীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারংবার অনুভব করেছি—এ *ঠিক* হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কিভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ হয় উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে এটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ-জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস—আপনি যাকে বলেছেন, এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি

একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিব্রত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই, বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে। সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাকেই নিষ্ফল করে দিলে।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকুই বুঝেচি যে, এ ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায় নি। ইতি—২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৪

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

(গ)

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র

ভারতবর্ষের উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের যে আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, দীর্ঘকাল তাহা শূন্য থাকিবে। বাংলায় এমন কোন পরিবার নাই যেখানকার আবালবৃদ্ধ নর নারীর নিকট তিনি পরিচিত ও সমাদৃত নহেন।

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল সেই সুবাদেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে তিনি এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দেশ-মাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহাতে আমরণ বিদ্যমান ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশ-প্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকার তরুণেরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চির-সবুজ—তরুণ বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল— তিনি যে কারারুদ্ধ হন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। কারাবাসজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইতে পারিত। সমাজে যাহারা বর্জিত ও উপদ্রুত, তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শরৎ-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা। নিজের জীবন তিনি দুঃখ-দৈন্য ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়াই এই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির যুবসমাজের নিকটে এই বিদ্রোহের বাণীই তিনি ছড়াইয়াছেন। সত্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠা তাঁহার সাহিত্যে সত্য-প্রচারের প্রেরণাই যোগাইয়াছে। একাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশ-প্রেমিক ও সর্বোপরি আদর্শ মানব।

পরিশিষ্ট

(ঘ)

জীবনপঞ্জী

১৮৭৫, ১৫ সেপ্টেম্বর (৩১ ভাদ্র, ১২৮৩)	হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম।
১৮৮৭	ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৮৯১	হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়াশুনা।
১৮৯৪	ভাগলপুর টি. এন. জুবিলী স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৮৯৫	ভাগলপুর জুবিলি কলেজে এফ. এ. ক্লাশে ভর্তি। মায়ের মৃত্যু।
১৮৯৪-১৯০১	ভাগলপুরে সাহিত্য-চর্চা।
১৯০৩	পিতার মৃত্যু। জীবিকা অর্জনের আশায় রেঙ্গুন যাত্রা। বেনামীতে প্রেরিত 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ।
১৯০৫-১৯১৬	রেঙ্গুনে চাকরি ও সাহিত্যচর্চা।
১৯০৭	ভারতী পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত। ইহাই শরৎচন্দ্রের মাসিক পত্রিকায় স্বনামে প্রথম মুদ্রিত রচনা।
১৯১২	যমুনা মাসিক পত্রিকার সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ডি.এল. রায়ের সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্ম ও এই পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ।
১৯১৩	ডি. এল. রায়ের মৃত্যু।

১৯১৬	চিরকালের জন্য রেঙ্গুন হইতে বাংলা-দেশে প্রত্যাবর্তন। হাওড়ায় বাজে-শিবপুরে অবস্থান।
১৯১৭	'চরিত্রহীন' উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত। দেশবন্ধু ও তাঁহার 'নারায়ণ' পত্রিকার সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।
১৯২১	অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও ও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। বি. পি. সি. সি. ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য।
১৯২৩	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ।
১৯২৫	সামতাবেড়ে গৃহনির্মাণ ও অবস্থান। দেশবন্ধুর মৃত্যু।
১৯২৬	'পথের দাবী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সহিত সংযোগ।
১৯২৭	শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির মঞ্চে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' মঞ্চস্থ।
১৯২৯	'রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব : অভিভাষণ 'তরুণের বিদ্রোহ।'
১৯৩১	'শেষ প্রশ্ন' প্রকাশিত। কুমিল্লা যুব-সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব।
১৯৩২	'শরৎ-জয়ন্তী' উৎসব উদ্‌যাপিত। কবিগুরু কর্তৃক 'কালের যাত্রা' নাটিকা উৎসর্গীকৃত।

১৯৩৪	ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি। কলিকাতায় গৃহ নির্মাণ।
১৯৩৬	৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট, উপাধি লাভ।
১৯৩৮, ১৬ জানুয়ারী	কলিকাতায় পার্ক নার্সিং হোমে অস্ত্রোপচারের পর মৃত্যু।